সঞ্চয়িতা

নবম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ নবম খণ্ড

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী
এবং তাঁহার পুত্র কন্যা জামাতা ভ্রাতা ও দৌহিত্রকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭১
পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

পরিবর্ধিত সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০৪
কানাই সামন্ত ও সনৎকুমার বাগচী -কর্তৃক
সংকলিত ও সম্পাদিত

ISBN-81-7522-065-1 (V.9)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন। কলকাতা ৬

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী ও তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, ও দৌহিত্রকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন ও অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১। অনিন্দিতা দেবী ও অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত। যন্ত্রস্থ

চিঠিপত্র ১৫। যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৬। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত।

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ

পারস্য। তেহেরান। ১৯৩২

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট ১

পরিশিষ্ট ২

গ্রন্থপরিচয়

চিত্রসূচী

প্রতিকৃতি

রবীন্দ্র-লেখাঙ্কন

শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীকে লিখিত

পত্রসংখ্যা ২৬৪

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়া "জোনাকি"

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১২ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমাকে অনেকে ভুল বুঝে থাকেন, তুমিও বোধ হয় ভুল বুঝেচ। প্রথম কথা, আমি মস্ত কেউ একজন নই। তাতে কিছু আসে যায় না। তোমরা যে কেউ আমাকে যা মনে কর তার সঙ্গেই আমার কিছু না কিছু মিশ খেয়ে যায়। তার কারণ, কিশোর বয়স থেকে আমার মনকে নানাখানা করে আমি নানা কথাই বলেচি— এ ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। আমার উপর যদি কেবল এক-সুরের ফরমাস থাকত তাহলে সহজে দিন কেটে যেত। যেই কোনো সমজদার আমাকে চিনে নিয়েচে বলে হাঁফ ছাড়ে অমনি উল্‌টো তরফের কথাটা বলে বসি, লোকে সহ্য করতে পারে না।

আমি নির্‌গুণ নিরঞ্জন নির্ব্বিশেষের সাধক এমন একটা আভাস তোমার চিঠিতে পাওয়া গেল। কোনো একদিক থেকে সেটা হয় তো সত্য হতেও পারে— যেখানে সমস্তই শূন্য সেখানেও সমস্তই পূর্ণ-যিনি তিনি আছেন এটাও উপলব্ধি না করব কেন ? আবার এর উল্টো কথাটাও আমারি মনের কথা। যেখানে সব-কিছু আছে সেখানেই সবার অতীত সব হয়ে বিরাজ করেন এটাও যদি না জানি তাহলে সেও বিষম ফাঁকি।

আজ এই প্রৌঢ় বসন্তের হাওয়ায় বেলফুলের গন্ধসিঞ্চিত প্রভাতের আকাশে একটা রামকেলী রাগিণীর গান থাকে

ব্যাপ্ত হয়ে— স্তব্ধ হয়ে একা একা বেড়াই যখন, তখন সেই অনাহত বীণার আলাপে মন ওঠে ভরে। এই হোলো গানের অন্তর্লীন গভীরতা। তার পরে হয় তো ঘরে এসে দেখি গান শোনবার লোক বসে আছে— তখন গান ধরি, "প্যালা ভর ভর লায়ীরি।" সেই ধ্বনিলোকে দেহমন সুরে সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে, যা-কিছুকে সেই সুর স্পর্শ করে তাই হয় অপূর্ব্ব। এও তো ছাড়বার জো নেই। সুরের গান, না-সুরের গান, কাকে ছেড়ে কাকে বাছব? আমি দুইকেই সমান স্বীকার করে নিয়েছি।

এক জায়গায় কেবল আমার বাধে। খেলনা নিয়ে নিজেকে ভোলাতে আমি কিছুতেই পারি নে। এটা পারে নিতান্তই শিশু বধূ। সাথী আছেন কাছে বসে তাঁর দিকে পিছন ফিরে খেলনার বাক্স খুলে বসা একেবারেই সময় নষ্ট করা। এতে করে সত্য অনুভূতির রস যায় ফিকে হয়ে। ফুল দিতে চাও দাও না, এমন কাউকে দাও যে-মানুষ ফুল হাতে নিয়ে বল্‌বে বাঃ— তার সেই সত্য খুসি সত্য আনন্দে গিয়ে পৌঁছয়। শিলাইদহের বোষ্টমী আমার হাতে আম দিয়ে বল্‌লে, তাঁকে দিলুম। এই তো সত্যকার দেওয়া— আমারই ভোগের মধ্যে তিনি আমটিকে পান। পূজারী ব্রাহ্মণ সকালবেলায় গোলক চাঁপার গাছে বাড়ি মেরে ফুল সংগ্রহ করে ঠাকুরঘরে যেত— তার নামে পুলিশে নালিষ করতে ইচ্ছা করত— ঠাকুরকে ফাঁকি দিচ্চে বলে। সেই ফুল আমার মধ্যে দিয়েই ঠাকুর গ্রহণ করবেন বলেই গাছে ফুল ফুটিয়েছেন আর আমার মধ্যে ফুলে আনন্দ

আছে। ঠাকুরঘরে যে মূর্ত্তি প্রতিদিন এই চোরাই মাল গ্রহণ করে সে তো সমস্ত বিশ্বকে ফাঁকি দিলে— মূঢ়তার ঝুলির মধ্যে ঢেকে তার চুরি। কত মানুষকেই বঞ্চিত করে তবে আমরা এই দেবতার খেলা খেলি। ঠাকুরঘরের নৈবেদ্যের মধ্যে আমরা ঠাকুরের সত্যকার প্রাপ্যকে প্রত্যহ নষ্ট করি।

এর থেকে একটা কথা বুঝতে পারবে, আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্ব্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্চে বলে' আমি ঠাকুরঘর থেকে দূরে থাকি এ কথা সত্য নয়— মানুষ বঞ্চিত হচ্চে বলেই আমার নালিষ। যে সেবা যে প্রীতি মানুষের মধ্যে সত্য করে তোলবার সাধনাই হচ্চে ধর্ম্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপব্যয় ঘটাচ্চি। এই জন্যেই আমাদের দেশে ধার্ম্মিকতার দ্বারা মানুষ এত অত্যন্ত অবজ্ঞাত। মানুষের রোগ তাপ উপবাস মিট্‌তে চায় না, কেননা এই চিরশিশুর দেশে খেলার রাস্তা দিয়ে সেটা মেটাবার ভার নিয়েচি। মাতুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হোলো তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐ সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। খেলার দেবতা এই সব সোনা জহরাৎকে ব্যর্থ করে বসে থাকুন— এ দিকে সত্যকার দেবতা সত্যকার মানুষের কঙ্কালশীর্ণ হাতের মুষ্টি প্রসারিত করে ঐ মন্দিরের বাহিরে পথে পথে ফিরচেন। তবু আমাকে বলবে আমি নিরঞ্জনের পূজারি? ঐ ঠাকুরঘরের মধ্যে যে পূজা পড়চে সমস্ত ক্ষুধিতের ক্ষুধাকে অবজ্ঞা

করে সে আজ কোন্ শূন্যে গিয়ে জমা হচ্চে?

হয় তো বল্‌বে এই খেলার পূজাটা সহজ। কিন্তু সত্যের সাধনাকে সহজ কোরো না। আমরা মানুষ, আমাদের এতে গৌরব নষ্ট হয়। দেবতার পূজা কঠিন দুঃখেরই সাধনা— মানুষের দুঃখভার পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেচে সেইখানেই দেবতার আহ্বান শোনো— সেই দুঃসাধ্য তপস্যাকে ফাঁকি দেবার জন্যে মোহের গহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না। আমি মানুষকে ভালোবাসি বলেই এই খেলার দেবতার সঙ্গে আমার ঝগড়া। দরকার নেই এই খেলার, কেননা প্রেম দাবী করচেন সত্যকার ত্যাগের, সত্যকার পাত্রে।

তোমাকে বোধ হয় কিছু কষ্ট দিলুম। কিন্তু সেও ভালো। যদি তোমাকে অবজ্ঞা করতুম তাহলে এ কষ্টটুকু দিতুম না।

রিলিজন্ অফ্ ম্যান্ বলে একটা ইংরেজি বই লিখেছি সেটা পড়লে বুঝতে পারবে আমার মতে

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

ইতি ২৯ চৈত্র ১৩৩৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১৭ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

প্রথমেই বলে রাখি আমার সব কথা বলবার অধিকার নেই। যেখানে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব সেখানে যুক্তিদ্বারা তর্ক করে বোঝা ছাড়া উপায় নেই। তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারি তুমি একটা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছ সেটাকে আমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যখন চেষ্টা করি তখন মনে সংশয় থেকে যায়। তবুও আমার দিক থেকে যেটা বলবার আছে সেটা বলা চাই।

বাংলা দেশে আমরা শাক্ত কিম্বা বৈষ্ণব ধর্ম্মে মুখ্যত রস সম্ভোগ করতে চাই। হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার সার্থকতা মনে করি। এ'কে আধ্যাত্মিক বিলাস বলা যেতে পারে। সব রকম বিলাসের মধ্যেই বিকারের সম্ভাবনা আছে।

গ্রামে যখন বাস করতুম একজন বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে আমার প্রায় আলাপ হোত। আমি তাঁকে একদিন বল্লুম ব্রাহ্মণপাড়ায় দুর্নীতি দুর্গতি ও দুঃখের অন্ত নেই। আপনি কেন তাদের মাঝখানে থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন না। শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন— এ সব লোকদের সহবাস দূরে পরিহার করাই তিনি সাধনার পন্থা বলে জানেন, এতে রস ভোগ চর্চ্চায় ব্যাঘাত করে। দেবতা যদি নিতান্তই

অতিমানুষ হন তাহলে তাঁকে নিয়ে কেবল হৃদয়াবেগের খেলা খেল্‌লেই চলে, আমাদের কর্ম্মে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই— বুদ্ধি চাই নে, শক্তি চাই নে, চরিত্র চাই নে, কেবল নিরন্তর ভাবে ডুবুডুবু হয়ে থাকলেই হোলো। অর্থাৎ তাঁকে দিয়ে হৃদয়ের সখ মেটাবার ব্যাপার। যেহেতু খেলার পুতুল সত্যকার মানুষ নয় এই জন্যে তাকে নিয়ে বালিকা আপন হৃদয়বৃত্তিকে দৌড় করায়— আর কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু সন্তানের মার দায় আছে, শুধু কেবল হৃদয় নয়— তাকে বুদ্ধি খাটাতে হয়, শক্তি খাটাতে হয়, সন্তানের সেবা পরিপূর্ণ মাত্রায় সত্য করে না তুললে চলে না। মানুষের মধ্যে যে দেবতার আবির্ভাব তাঁকে পুতুল সাজিয়ে ফাঁকির নৈবেদ্য দিয়ে ভোলাবে কে? সেখানে তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে পূর্ণ মানুষ হতে হবে। খেলার দেবতা মানুষের দেবতাকে বঞ্চিত করে— মাতুরার দেবতা মানুষেরই গায়ের অলঙ্কার হরণ করে নিয়ে। ঠাকুরকে এই রকম অলঙ্কার দিতে হৃদয়ের তৃপ্তি হয় মানি, কিন্তু ঠাকুরকে কেবলমাত্র হৃদয়তৃপ্তির উপলক্ষ্য করলে তাঁকে ছোট করা হয়, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধকে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ করা হয়। তুমি মনে করো ঠাকুরের ভাণ্ডারে এই যে প্রভূত ধন অলঙ্কার নিষ্ফলভাবে সঞ্চিত হচ্চে এ কোনো এক সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনে কাজে লাগ্‌বে না? কখনো না, এ পর্য্যন্ত তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিষয়ী লোকের ধনসঞ্চয়ের যে দুর্নিবার লালসা সেই লালসার তৃপ্তিই দেবতার নামে আমরা করি— নিজেদের বৈষয়িকতাকেই আমরা মঠে মন্দিরে পুঞ্জীভূত করে তুলি— এর আর সীমা থাকে না— তার প্রধান কারণ

দেবতার প্রতি আমাদের মানবদায়িত্ব নেই। জগন্নাথকে পুরোহিত স্নান করায়, কাপড় পরায়, পাখার হাওয়া করে, ওষুধ খাওয়ায়— যদি তার অর্থ এই হয়, যে, মানুষের মধ্যে জগন্নাথেরই স্নানের, কাপড় পরার ওষুধ খাওয়ার সত্যই প্রয়োজন আছে তাহলে কি এমনতরো খেলা করে নিজের দায় সেরে নিতে প্রবৃত্তি হয়? তাহলে সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি নিয়ে মানব-ভগবানের অন্নবস্ত্র পানীয় পথ্যের আয়োজন করতে হয়। যুগে যুগে আমরা তাতে অবহেলা করেছি বলেই মন্দিরের ভগবান পাণ্ডা পুরুতের মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌চেন লোকালয়ে তাঁর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়ল, তাঁর পরনে ট্যানা জোটে না।

দুঃখবেদনার অনুভূতি থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েচ। ভক্তি বা হৃদয়াবেগের নেশা দিয়ে ফল পাবে না। তোমার ভালোবাসা যেখানে জ্ঞানে কর্ম্মে ত্যাগে তপস্যায় ষোলো আনা পূর্ণ সেইখানেই তোমার পরিত্রাণ। যে সেবা সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সত্য এবং যে সেবায় তোমার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে সেইখানেই আনন্দ— সে আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে, তাকে এড়িয়ে নয়। মানুষের দেবতার কাছে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করে দাও— তিনি যদি তোমাকে দুঃখের মালা পরিয়ে দেন তবে সেই মালা দিয়েই তিনি তোমাকে বরণ করে আপন করে নেবেন —তার চেয়ে আর কি চাই?

তোমার চিঠিতে তোমার কবিতার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি বিস্মিত হয়েচি। অত্যন্ত খাঁটি কবিতা, বানানো নয়, পরিণত লেখনীর সৃষ্টি। তুমি বাংলাদেশে অনেককে আবিষ্কার করেচ লিখেচ

—বোধ হয় নিজেকেও আবিষ্কার করেচ কিন্তু প্রকাশ করেচ কি না জানি নে। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি প্রতীকের কথা লিখেচ, সত্য আছেন দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে, দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করচেন, যদি থাকি দ্বার বন্ধ করে প্রতীককে নিয়ে তার চেয়ে বিড়ম্বনা নেই। সব চেয়ে বিপদ হচ্চে প্রতীক অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সত্যই হয় পর। সত্যের দাবী কঠিন, প্রতীকের দাবী যৎসামান্য— সত্য বলে অকল্যাণকে অন্তরে ঠেকাতে হবে প্রাণপণ শক্তিতে, প্রতীক বলে পাঁচশিকের পূজো দিয়েই ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ সত্য মানুষকে মানুষ হতে বলে আর প্রতীক তাকে চিরদিন ছেলে-মানুষ হতে বলে। প্রতীক মিথ্যা চোখরাঙানীতে ভারতের কোটি কোটি দুর্ব্বল চিত্তকে কাপুরুষ করে তুল্‌চে, সত্য তাকে যতরকম মিথ্যা ভয়ের মোহ থেকে উদ্বোধিত করতে চায়। প্রতীক দুশ্চরিত্র পাণ্ডার পায়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায় সত্য যথার্থ ভক্তির আলোয় মানুষের ললাটকে মহিমান্বিত করে। তার্কিক বলে এই প্রতীক কেবল একটা ক্ষণিক অবস্থার জন্যে, তার পরে কেটে যায়। কোনোদিন কাটে না— মূঢ়তা মানুষকে দুর্ব্বল করে, তার চিত্তকে মোহেই দীক্ষিত করে। ফোটোগ্রাফের সঙ্গে প্রতীকের তুলনা কোরো না। যে-বন্ধুকে তুমি সত্য করে জানো তারই ফোটোগ্রাফ তোমার কাছে সত্য— যাকে অন্তরে সত্যরূপে জানো না তার ফোটোগ্রাফকেই সত্যরূপে জানা বিষম

বিপদ। তা ছাড়া যে সত্য সকল জীবের মধ্যে তাকে অজীবের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করা আর শাখার ফুলকে শিকড়ে খুঁজে বেড়ানো একই কথা। তুমি তোমার যে-গুরুর মধ্যে পূর্ণ মানুষকে উপলব্ধি করেচ তিনি তো ফাঁকি নন, তাঁকে পেতে হলে তোমার সমস্ত মানবধর্ম্ম দিয়ে পেতে হবে, ছেলেখেলা করে হবে না। বিরাট মানুষকে আমরা কোনো মানুষের মধ্যে দেখেচি তার সত্য প্রমাণ দেওয়া চাই যে— কী নৈবেদ্য তাঁকে দিলে? কেবল হৃদয়াবেগ? তাকে উদ্দেশ করে তুমি মানুষের জন্যে কি করেচ— আপনাকে কতখানি বিশুদ্ধ করে তুলতে পেরেচ? তুমি যে মানুষকে সমস্ত মন দিয়ে উপলব্ধি করেচ তিনি কি প্রতীক? মন্তর পড়ে সারবে? বিরাট যে তাঁর মধ্যেই দেখা দিয়েচেন —কিন্তু সেই বিরাটের সেবা কোথায়? তুমি তৃপ্তি পাচ্চ না আজ, তার মানে তুমি তাঁকে ব্যবহার করতে চাচ্চ আপনার তৃপ্তির জন্যে— তাঁর তৃপ্তির জন্যে যখন আপনাকে সত্যভাবে ত্যাগ করবে, মানুষের দ্বারে, স্মৃতিমন্দিরের প্রাঙ্গণে নয়, তখনই জীবনে তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন সার্থক হবে।

আমার সময় বড়ো কম। আমাকে অনেকে বাজে চিঠি লেখে —তার উত্তর দিতে গেলে আমার সময়ের অপব্যয় হয়। তুমি তোমার সত্য প্রয়োজনেই আমাকে লিখেচ বলেই আমি তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে লিখ্‌তে কৃপণতা করি নে। তা ছাড়া তুমি লিখ্‌তে জানো তাই লেখা আদায় করা তোমার পক্ষে সহজ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২১ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পড়ে আমি বিরক্ত হচ্চি এমন কল্পনা কোরো না। যে গভীর উপলব্ধির ভিতর দিয়ে তুমি গিয়েচ সেটা আমার জানতে ভালোই লাগচে। আমার মনে পড়চে আমিও এক সময়ে স্বভাবতই যে সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান— সংসার থেকে হৃদয়ের যে তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায় নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মথন করে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম। বৈষ্ণব কবিরা আমার এই আত্মভোগের নৈবেদ্য ভরে তোলবার সহায়তা করেছিলেন। কিছুদিন এই রসস্রোতে গা-ঢালান দিয়েছি। কিন্তু সত্য তো কেবলি রসো বৈ সঃ নন তাই একসময় আমার ধিক্কার এলো— সেই নিমজ্জনদশা থেকে তীরে ওঠাকেই মুক্তি বলে বুঝলুম। ভাবের মধ্যে সম্ভোগ, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে তপস্যা। এই তপস্যায় সেই মহাপুরুষের আহ্বান যাঁকে ঋষি বলেচেন "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা।" কেবল তিনি বিশ্বরস এবং বিশ্বরূপ নন কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মে যোগ দিতে গেলেই বিশুদ্ধ হতে হয়, বীর্য্যবান হতে হয় জ্ঞানী হতে হয়। বিশুদ্ধ কর্ম্মে সত্য সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হন— জ্ঞানে, রসে, তেজে— পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সত্যকর্ম্মে, বিশ্বকর্ম্মে। একদা ছেলেবেলায় যখন দুধে বিতৃষ্ণা ছিল তখন ভৃত্যকে বলে দিয়েছিলুম ফেনায়

পাত্র ভরিয়ে আনতে যাতে পিতা ফাঁকি না ধরতে পারেন। একদিন অন্তরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলুম, রসের সাধনার অনেকটাই সেই ফেনা, বাষ্পোচ্ছ্বাস— যাঁর সামনে ধরি তাঁকেও ফাঁকি দিই, নিজেকেও। কর্ম্মের সাধনাতেও যথেষ্ট প্রবঞ্চনা চলে— অর্থাৎ দুধে ফেনা না মিশিয়ে জল মেশাবার পদ্ধতিও আছে— এমন ব্যবসায়ে অনেকেই পসার জমিয়ে থাকেন। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভোলাবার প্রলোভন এসে পড়ে— ষোলো আনা খাঁটি হওয়া সহজ নয়— কিন্তু তবু মনে জানি ভেজাল বাদ দিয়েও যেটুকু বাকি থাকে সেটা উবে যাবার জিনিষ নয়। অন্তত আজ এটুকু বুঝেছি কর্ম্মের মধ্যে যে উপলব্ধি তাতে মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করা হয়— তাতে বাইরে ব্যর্থতা ঘটলেও অন্তরে গৌরবহানি ঘটে না।

ইতি ৮ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২৩ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে খুবই ভুল বুঝেছ তাই আমাকে লিখতে হোলো। আমি কখনো কাউকে আদেশ করিনে, তার কারণ আমি গুরু নই আমি কবি। তোমার সঙ্গে আমি কয়েকটা

বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, কদাচ সেটাকে অনুশাসন বলে গ্রহণ কোরো না।— সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমাদের নিজেদের স্বভাবের পথে। তোমার স্বভাবের অনুগত হয়ে তুমি যে উপলব্ধি সংগ্রহ করেচ আমার কাছে সে জিনিষটি নেই সুতরাং তোমাকে কখনোই বলতে পারব না যে আমি যে সাধনায় যে অনুভূতিতে এসেচি সেইটি তুমি যদি গ্রহণ না করো তবে আমি রাগ করব। এরকম অদ্ভুত জবরদস্তি একেবারেই আমার স্বভাববিরুদ্ধ। অবশ্য যেখানে ধর্ম্মের নামে স্পষ্টতই অন্যায় অত্যাচার এবং অধর্ম্ম চল্‌চে সেখানে তাকে আমি কোনো কারণেই স্বীকার করে নিতে পারি নে। কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক রসসম্ভোগে কোন ক্ষতি নেই সেখানে জোর করে প্রতিবাদ করা গোঁয়ারের কাজ।

আমি কেবল নিজের কথাই বল্‌তে পারি— আমার মন কোনো প্রতীককে আশ্রয় করতে স্বভাবতই অক্ষম। সহসা মনে হতে পারে এটা কবিজনোচিত নয়। ভাবকে রূপ দেওয়া আমার কাজ— আমার সেই সৃষ্টিতে আমার আনন্দ। সেখানে রূপ আগে নয়, ভাব আগে, রূপের সঙ্গে ভাব নিজেকে বাইরে থেকে মেলায় না— নিজের রূপ-দেহ সে নিজেই সৃষ্টি করে— আবার তাকে অনায়াসে ত্যাগ করে' নতুন রূপের মধ্যে প্রকাশ খোঁজে। কোনো ধর্ম্মগত প্রথা যে সব রূপকে বাহির থেকে বদ্ধ করে রেখেচে, আমার চিত্তের ধ্যান তার মধ্যে বাধা পায়। শুধু তো মূর্ত্তি নয়, তার সঙ্গে আছে কাহিনী— তাকে রূপক জোর করে বলি— অভ্যস্তভাবে তাকে গ্রহণ করি, ভাবকে যেখানে

প্রতিবাদ করে সেখানেও। আমার বুদ্ধি আমার কল্পনা আমার রসবোধ সবই আঘাত পায়। যদি বলো ভগবান যখন অসীম তখন সকল রূপেই সকল কাহিনীতেই তাঁকে খাপ খাওয়ায়। এক হিসাবে এ কথা সত্য— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভালো মন্দ সুশ্রী কুশ্রী সবই আছে অতএব কেবল ভালো কেবল সুন্দরের গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে দেখলে তাঁর অসীমতার উপর দোষারোপ করা হয়। ঠগীরা মানুষ খুন করাকে ধর্ম্মসাধনা বলে গ্রহণ করেছিল— ভগবান তো নানারকম করেই মানুষকে মারেন— সেই খুনী ভগবানকেই বা পূজা করতে দোষ কি?

কিন্তু আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন। মানুষের নরকও আছে— সেইখানে মূঢ়তা সেইখানে অত্যাচার সেইখানে অসত্য। সেই নরকও আছে কিন্তু সেই থাকাটা না-এর দিকে, হাঁ-এর দিকে নয়। সে কেবলি হাঁ-কে অস্বীকার করে কিন্তু কিছুতে তাকে বিলুপ্ত করতে পারে না। অস্বীকার করার দ্বারাই সে সেই চিরন্তন ওঁ-কে প্রমাণ করতে থাকে। এই জন্যেই, ভগবান অসীম বলেই তাঁকে সব কিছুতেই আরোপ করলে চলে এ কথা আমি মানতে রাজি নই। যেখানে জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই তাঁকে উপলব্ধি না করলে ঠকতে হবে।

কিন্তু তুমি যে করচ না একথা বলিনে— তোমার অভিজ্ঞতা আমার অভিজ্ঞতা নয় অতএব আমার পক্ষে কোনো উপদেশকে বেদবাক্য করে তোলবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। এই কথাটুকু বোধ হয় বলা যায়, দুই রকম চিত্তবৃত্তি আছে— এক রকম মন

প্রতীককে আশ্রয় করে আর-একরকম মন করে না। অনেক মহাপুরুষ প্রতীককে অবলম্বন করে' মনে মনে তাকে ছাড়িয়ে গেছেন আবার অনেকে— যেমন কবীর দাদূ নানক— প্রতীকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও নিজের ধ্যানের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিতে আত্মানন্দের রসেই পরম সত্যকে পূর্ণ করে ভোগ করেন— অন্য পথ তাঁদের পক্ষে অসাধ্য।

গুরুকে আমি প্রতীক শ্রেণীতে ফেলি নে। মানবের মধ্যে যেখানে পূর্ণতা মানবের দেবতার সেখানে প্রত্যক্ষ আবির্ভাব একথা আমি মানি।

রচনা করবার অসামান্য শক্তি তোমার আছে এই জন্যেই তোমার চিঠি পড়ার আনন্দ আমাকে চিঠি লেখায় প্রবৃত্ত করে।

ইতি ১০ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২৮ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির উত্তরে যা আমার বলবার ছিল তা বোধ হয় বলে শেষ করেছি। একটা কথা পূর্ব্বেও বলেচি পুনরায় বলা দরকার, আমাকে কোনো অংশেই গুরু বলে গণ্য করলে ভুল করা হবে। তোমার অন্তরতম প্রয়োজন যে কি তা নিশ্চিত

নির্ণয় করে দেবার অধিকার আমার নেই। আমি আমার নিজের পথে চলি— সে পথে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও পৌঁছব কি না তাও জানি নে। আমার চিত্তের স্বভাবই হচ্চে নদীর মতো চলা, চল্‌তে চল্‌তে বলা— সে ধারা একটানা চলে না— নানা বাঁকে বাঁকে চলে। আমি জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে বাণী জোগাব এই ফরমাস নিয়ে সংসারে এসেচি— কোথাও এসে স্তব্ধ হলেই আমার কাজ ফুরোবে। যাঁরা গুরু তাঁরা সমুদ্রের মতো আপনার মধ্যে আপনি এসে থেমেচেন, তাঁদের বাণী তরঙ্গিত হয় তাঁদের গভীরতা থেকে। আমার ধ্বনি ওঠে জীবনের বিচিত্র সংঘাত হতে, তাঁদের বাণী জাগে অন্তরাত্মার স্বকীয় আন্দোলনে। তুমি তোমার গুরুর কাছ থেকে এমন কিছু যদি পেয়ে থাকো যা কেবলমাত্র আলাপ নয় যা আদেশ যা নির্দ্দেশ, যা তোমার আত্মাকে গতি দিয়েচে তাহলে তার উপরে আর কথা চলে না। কেননা আমি তো কেবলমাত্র কথাই দিতে পারি, গতি জোগাতে পারিনে তো। আজ পর্য্যন্ত কাউকে তো আমি কোনো ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিই নি। সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে চল্‌তে অনেককে খুসি করেচি এই পর্য্যন্ত। আবার অনেকে আমাকে পছন্দই করে না— কেননা তারা আন্দাজ করতে পারে যে, আমার নগদ তহবিল নেই— যদি বা কোনোমতে ভোজের আয়োজন করতে পারি দক্ষিণা পর্য্যন্ত পৌঁছয় না।

তুমি একটি রসলোকে প্রবেশ করেচ— সেখানে তুমি নানা উপকরণে আনন্দমন্দিরের ভিৎ গাঁথচ। বিশ্ববিধাতা যেমন, মানুষও তেমনি, আপন স্বকীয় সৃষ্টিতেই তার যথার্থ বাস— অন্য

জীবেরা থাকে বাসাবাড়িতে, কেবল ভাড়া দেয়। ভাড়াটে বাসার মানুষও অনেক আছে কিন্তু মানুষের আনন্দ হচ্চে স্বকীয় ধামে— সত্যকে সে নিজের জীবনে নিজের চিত্তে মূর্ত্ত করে তোলে— তখন সে স্থায়ী আশ্রয় পায়। কিন্তু যখন সে এমন কিছু গড়তে থাকে যার মধ্যে উপকরণ অনেক আছে কিন্তু সত্য যথেষ্ট নেই তখন সে পীড়িত হয়, তখন তার আশ্রয় হয় তার বোঝা। এই দুর্ম্মূল্য ব্যর্থতার সঙ্গে অনেক লড়তে হয়েচে— উপকরণ জমাতে লেগেচি সদর দরজা দিয়ে, খিড়কি দরজা দিয়ে সত্য দিয়েচেন দৌড়।

তুমি থেকে থেকে আশঙ্কা করেচ আমার মতের সঙ্গে তোমার মিল হচ্চে না বলে আমি রাগ করচি। লেশমাত্র না। মত নিয়ে যারা অন্যের পরে জবরদস্তি করে আমি সে জাতের মানুষ নই। তোমার উপলব্ধির পরে আমার মনে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই। জীবনে তুমি একদা যে আনন্দধারায় আত্মনিবেদন করেচ সেই আনন্দ শেষ পর্য্যন্ত পরম সার্থকতায় নিয়ে যাক এই আমি একান্তমনে কামনা করি। ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

৩০ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি নিজেকে অকারণ পরিতাপে কেন পীড়িত করচ আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে। তোমার প্রতি বিরক্তির লেশমাত্র কারণ আমার ঘটে নি, তোমার চিঠি পড়তে আমার বিশেষ ভালো লাগে। তোমার জীবনের যা গভীরতম উপলব্ধি তার সৌন্দর্য্য ও সত্যতা আমি মনে বেশ বুঝতে পারি। আমার নিজের পথ তোমার থেকে পৃথক বলেই তোমার অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনতে আমি এত ঔৎসুক্য অনুভব করি। আমি চিন্তা করি, তর্ক করি আলাপ করি বলেই নিজেকে তোমার চেয়ে সাধনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি নে— কেননা সাধনার চেয়ে আমার ভাবনা ও কল্পনাই বেশি। আমি অনুভব করব, প্রকাশ করব এই কাজের জন্যেই আমাকে গড়া হয়েচে। আমি বলে যাব, গেয়ে যাব, তোমাদের ভালো লাগবে এইটুকু হলেই আমার কাজ সারা হোলো। আমার কাছে কোন্‌টা ভালো কোনটা মন্দ বোধ হয়, তা নিয়ে তর্কও করব— কিন্তু সেটা উপরের বেদীতে চড়ে বসে নয়। তোমাদের ভাবিয়ে দিতে পারলেই আমার আর কিছু দরকার নেই। আমার কাছে আদেশ উপদেশের দাবী করলেই বুঝতে পারি আমাকে ভুল বুঝেচ। যখন মনে করো আমার কথা না শুনলে রাগ করি তখনো জানি আমাকে চেনো নি। চিরদিন আমি গুরুমশায়কে এড়িয়ে

এসেচি, ইস্কুল পালানো আমার অভ্যাস— অবশেষে আমি নিজেই গুরুমশায় সেজে বসব এর চেয়ে প্রহসন কিছু হতে পারে না। বলা বাহুল্য গুরুমশায় আর গুরু এক জাতের নয়। গুরু যাঁরা তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ গুরু— আর গুরুমশায় সেই, যে চোখ রাঙিয়ে টঙে চড়ে' গুরুগিরি করে। আমি উক্ত দুই জাতেরি বার।

যাই হোক্ তুমি মনে নিশ্চিত জেনো তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলেচ বলে আমি তিলার্দ্ধ ক্ষুব্ধ হই নি। আমি কথার যাচনদার, কথা যেখানে অকৃত্রিম ও সুন্দর সেখানে আমি মত বিচার করি নে— সেখানে আমি প্রকাশের রূপটিকে রসটিকে সম্ভোগ করতে জানি। তুমি অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার সাধনায় প্রবৃত্ত থাকো— তাতেই তুমি চরিতার্থতা লাভ করবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

২ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমাকে তুমি মনে মনে অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়ে নিজের পছন্দসই করবার চেষ্টা করচ। কিন্তু আমি তো রচনার উপাদান মাত্র নই আমি যে রচিত। তুমি লিখেচ এখন থেকে আমার বই

খুব করে পড়বে— এমন কাজ কোরো না— অত্যন্ত বেশি করে পড়তে গেলে কম করে পাবে। হঠাৎ মাঝে মাঝে একখানা বই তুলে নিয়ে সাতের পাতা কি সতেরোর পাতা কি সাতাশের পাতা থেকে যদি পড়তে সুরু করে দাও হয় তো তোমার মন বলে উঠ্‌বে বাঃ বেশ লিখেচে তো। রীতিমত পড়া অভ্যাস করো যদি তাহলে স্বাদ নষ্ট হতে থাকবে— কিছুদিন বাদে মনে হবে এমনিই কি। আমাদের সৃষ্টির একটা সীমানা আছে সেইখানে বারে বারে যদি তোমার মনোরথ এসে ঠেকে যায় তবে মন বিগ্‌ড়ে যাবে। মানুষের একটা রোগ আছে যা পায় তার চেয়ে বেশি পেতে চায়— সেটা যখন সম্ভব হয় না তখন চেক বইয়ে নিজের হাতে বড়ো অঙ্ক লেখে তার পরে যখন ভাঙানো চলে না তখন ব্যাঙ্কের উপর রাগ করে। তোমার প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি দিতে পারে আমার রচনা থেকে এমন প্রত্যাশা কোরো না। কিছু তোমার ভালো লাগ্‌বে কিছু অন্যের ভালো লাগ্‌বে — কিছু তোমার মনের সঙ্গে মিলবে না কিন্তু আর একজন ভাববে সেটা তারি মনের কথা। নানা ভাবে নানা সুরে নানা কথাই বলেছি— যেটুকু তোমার পছন্দ হয় বাছাই করে নিয়ো। পাঠকেরো রসগ্রহণ করবার একটা সীমা আছে; তোমার মন অনুভূতির একটা বিশেষ অভ্যাসে প্রবলভাবে অভ্যস্ত, সেই অভ্যাস সব কিছু থেকে নিজের জোগান খোঁজে। কিন্তু কবিতায় কোনো একটা বিশেষ ভাব বড়ো জিনিষ নয়, এমন কি খুব বড়ো অঙ্গের ভাব। কবিতার মুখ্য জিনিষ হচ্চে সৃষ্টি— অর্থাৎ রূপ-ভাবন। বিশ্বকাব্যেও যেমন, কবির কাব্যেও তেমনি,— রূপ

বিচিত্র— কোনোটা তোমার চোখে পড়ে কোনোটা আর কারো। তুমি খুঁজচ তোমার মনের একটি বিশেষ ভাবকে তৃপ্তি দিতে পারে এমন কোনো একটি রূপ— অন্যগুলোও রূপের মূল্যে মূল্যবান হলেও হয় তো তুমি গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু কাব্যের যারা যথার্থ রসজ্ঞ, তারা নিজের ভাবকে কাব্যে খোঁজে না— তারা যে কোনো ভাব রূপবান হয়ে উঠেচে তাতেই আনন্দ পায়। তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েচে একটা বিশেষ খাদে তোমার চিত্তধারা প্রবাহিত— সেইটেই তোমার সাধনা। আমরা কবিরা কেবল সাধকদের জন্যে লিখি নে, বিশেষ রসের রসিকদের জন্যেও না। আমরা লিখি রূপদ্রষ্টার জন্যে— তিনি বিচার করেন সৃষ্টির দিক থেকে— যাচাই করে দেখেন রূপের আবির্ভাব হোলো কিনা। আমার রূপকার বিধাতা সেই জন্যে আমাকে নানা রসের নানা ভাবের নানা উপলব্ধির মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান— নিজের মনকে নানান্‌খানা করে নানা চেহারাই গড়তে হয়। যে-ই একটা কিছু চেহারা জাগে ওস্তাদজি তখন আমাকে চেলা বলে মানেন। আমি যে সব কর্ম্ম হাতে নিয়েচি তার মধ্যেও সেই চেহারা গড়ে তোলবার ব্যবসায়। উপদেশ দেওয়া উপকার করা গৌণ, রচনা করাই মুখ্য। সেই জন্যেই আমি সবাইকে বারবার করে বলি, দোহাই তোমাদের, হঠাৎ আমাকে গুরু বলে ভুল কোরো না। আমি কর্ম্মীও বটে— কিন্তু যার অন্তর্‌দৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে আমি কারুকর্ম্মের কর্ম্মী। আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি, নাচি নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি, হাসাই, একান্তে

কোনো একটামাত্র আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় রাখি নে। যারা আমাকে ভক্তি করতে চায় তাদের পদে পদে খট্‌কা লাগে। আমার এই চঞ্চলতা যদি না থাক্‌ত তবে কোন্‌-দিন হয় তো হাল আমলের একজন অবতার হয়ে উঠে ভক্তব্যূহের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়তুম। অবতার শিকারে যাদের সখ তারা কাছাকাছি এসে নাক শিট্‌কে চলে যায়। তুমি আমার লেখা পড়তে চেয়েচ পোড়ো— কিন্তু কবির লেখা বলেই পোড়ো। অর্থাৎ আমি সকলেরই বন্ধু, সকলেরই সমবয়সী, সকলেরই সহযাত্রী। আমি কিন্তু পণ্ডিত নই। পথ চল্‌তে চলতে আমার যা কিছু সংগ্রহ। যা কিছু জানি তার অনেকখানি আন্দাজ। যতখানি পড়ি তার চেয়ে গড়ি অনেক বেশি।

এইমাত্র তোমার একটা চিঠিতে দেখলুম আমার চিঠি পাও নি বলে আক্ষেপ করেচ। বোধ করি তোমার পত্রের বাহন তোমাকে চিঠি পাঠাতে দেরি করেচে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমার চিঠি না পেলে মনে করে বোসোনা যে আমি রাগ করেচি। চিঠি লেখা আজকাল আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। হয় তো দীর্ঘকাল চিঠি পাবে না। তোমার মনে আমার ভুল পরিচয় ছিল তাই [এত]গুলো চিঠি এত করে লিখেচি। তাও লেখবার দরকার ছিল না— কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে খুসি হয়েছিলুম বলেই লিখেচি। তুমি কে তা আমি জানি নে— কিন্তু তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তুমি লিখিয়ে, অর্থাৎ আমাদেরি দলের লোক তাই তোমার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব হোলো না। কিন্তু নিয়মিত চিঠি আমার কাছ থেকে চেয়ো না।

আমি শ্রান্ত অথচ ব্যস্ত। ইতি ১৯ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

৫ মে ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার চিঠি না পেলে আর কোনো দুর্য্যোগ কল্পনা কোরো না কেবল এইটে মনে কোরো আমার সময়ও কম, বয়সও বেশি, শক্তিও পূর্ব্বের মতো নেই। এখন মনিবের কাছে আমার ছুটির দরবার চল্‌চে। মঞ্জুর হয় নি— তাই ভাঙাশরীরে কাজ চালাতে হচ্চে— এই জন্যে সব কাজেই কৃপণতা করতে হোলো। মনে নিশ্চয় জেনো আমি একান্ত মনে কামনা করি তোমার অন্তরে যে আনন্দের সঞ্চয় আছে তা অক্ষয় হোক এবং রচনাসম্পদের যে প্রাচুর্য্য তোমার লেখনীতে তাও অক্ষুণ্ণ থাক্।

তোমার খাতা পেয়েছি। আমার টেবিলের উপর নানা বস্তুর সমাবেশে যে বিরাট অব্যবস্থার বিস্তার হয়েচে তার মাঝখানে কোনো রক্ষণীয় জিনিষকে রক্ষা করতে ভয় করি। একবার ইতস্তত এ পাতে ও পাতে চোখ বুলিয়েছি— এর মধ্যে কাঁচা পাকা অনেক রকমের জিনিষ দেখা গেল। কিন্তু আমার জিম্মা করে

দিয়ো না— জিনিষ হারানো সম্বন্ধে আমার অসাধারণতা আছে —সেটা নিজের জিনিষে মার্জ্জনীয় কিন্তু ন্যস্ত ধনে অপরাধ। ইতি

২২ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

৯ মে ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

জন্মদিনের কাণ্ড নিয়ে নিরতিশয় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আজ ছাব্বিশে, তবু পরিশিষ্ট ভাগ যথেষ্ট ব্যাপক। তাই নিয়ে প্রত্যূষ থেকে নিরন্তর লোকসমাগম আলাপ অভ্যর্থনা চল্‌চে। তার উপরে পত্রের উত্তর দেওয়া আছে তারও পরিমাণ একটুও সংক্ষিপ্ত নয়।

যখন সুস্থ হয়ে বসতে পারব তোমাকে চিঠি লিখব। ইতি-মধ্যে সংক্ষেপে এইটুকু বলে রাখি তোমার উপহৃত গরদের জোড় পেয়ে খুব খুসি হয়েচি। কাজে লাগ্‌বে। যদি কখনো দেখা হয় তবে মোকাবিলায় আনন্দ জ্ঞাপন করব। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

১৩ মে ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রঙীন ভাবরসবাষ্পের মেঘমণ্ডলে নিবিড় করে ঘেরা একটি জগতে তুমি বাস করো— তোমার চিন্তা চেষ্টা আকাঙ্ক্ষা অভিরুচি সেইখানকারই রঙে রঙানো রসে রসানো, সেইখানকারই উপাদানে তৈরি। তোমার চিঠিগুলি থেকে সেইখানকার বার্ত্তা পাই; সেইখানকার ভাষারও পরিচয় পেতে থাকি। বুঝতে পারি নে তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বুঝি আমি ও জায়গার মানুষ নই। তোমাদের জীবনের লক্ষ্যকে একটি বিশেষ রূপে মূর্ত্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেচ, একটি সুনির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে বিবিধ উপচারসহ তাকে প্রদক্ষিণ করচ। ওখানে বাসা বাঁধবার মতো প্রকৃতিই আমার নয়। তুমি মনে করতে পারো যে, তার কারণ আমার মন ব্রাহ্মসংস্কারে চালিত— একেবারেই নয়, নূতন বা পুরাতন কোনো প্রচলিত সংস্কারে আমাকে কোনোদিন বাঁধে নি। মাঝে মাঝে ধরা দিতে গিয়ে ছিন্ন করে বেরিয়ে চলে এসেচি— আমার জায়গা হয় নি। কোনো সনাতন বা অধুনাতন ছাঁচে-ঢালা উপজগতের মধ্যে নিজেকে ধরাতে পারলুম না। আমি কেবলি চল্‌তে চল্‌তে পাই এবং পেতে পেতে চলি, এমনি করেই এতদিন কেটেচে। তুমি যে পাকা ইঁটের প্রাচীর-তোলা রসলোকে বাস করচ আমার পথের এক অংশে একদা আমি তার মধ্যেও প্রবেশ করেছিলুম— চৈতন্য-

ভাগবতে আমিও একদিন ডুব মেরেছি— কিন্তু আমার যে-পথ আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়েছিল সেই পথই আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়েও এল— যদি ওখানে আমাকে কোনো কারণে থাকতেই হোত বাসিন্দা হয়ে থাকতে পারতুম না বন্দী হয়ে থাকতুম। আমি যাঁকে পাই বা পেতে চাই কেবলি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পেতে হয়, আড্ডা গেড়ে বস্‌লেই গ্রন্থিটাকে পাই সোনাটাকে ফেলে দিয়ে। নানা রকম চিহ্ন দিয়ে চেহারা দিয়ে কাহিনী দিয়ে সদরের গেট ও খিড়কির প্রাচীর দিয়ে তোমাদের পাওয়াটাকে খুব পাকা করে নিয়ে তোমরা ভোগ করতে চাও— আমি দেখি আমার যিনি পাওয়ার ধন ঐ সমস্ত পাকা প্রাচীরই তাঁর পালাবার বড়ো রাস্তা। মন্দির থেকে দৌড় মারবার জন্যেই তাঁর রথযাত্রা। আমার সম্পদকে সুনির্দ্দিষ্ট সুরক্ষিত করবার জন্যে আমি আমার পিতামহদের লোহার সিন্ধুকটাকে কাজে লাগাতে চাইনে, ওজনদরে সে সিন্ধুক যতই ভারী ও কারিগরিতে যতই দামী হোক্ না। আমার সম্পদ রয়ে গেল আকাশে আলোতে বাতাসে আর আমার অন্তরা-কাশে। আর তাঁর পরিচয় রইল পৃথিবীর সকল কবির কাব্যে, কলারসিকের চিত্রে নৃত্যে গানে, মনীষীর মননে, কর্ম্মীর কর্ম্মে, পৃথিবীর সকল বীরের বীর্য্যে, ত্যাগীর ত্যাগে। এরা যে চলেচে তাঁরই সঙ্গে যুগে যুগে তাঁরই পথে পথে। কোনো বাঁধা বাক্যে তারা ধরা দেয় না, বাঁধা মতে আটক পড়ে না, বাঁধা রূপের শিকল পরে না। একজন যদি বা পথ রোধ করে' হাঁকতে থাকে চরমে এসেচি, আর একজন অট্টহাস্যে সে বাধা চূরমার করে

দেয়। এটা অত্যুক্তি হবে যদি বলি কোনো বাঁধা মতে আমাকে পেয়ে বসে না— কিন্তু সে সব বাঁধনের গ্রন্থি আলগা— যখন টান পড়ে তখন আপনিই খোলে, গলায় ফাঁস লাগায় না।

এত করে তোমাকে এ সব কথা বলচি তার কারণ এই, যে, তুমি মনে করেচ আমি তোমার চিত্তকে আশ্রয় দিতেও পারি। কিন্তু আমার মনে হয়, যে অন্নে তোমার অভ্যাস সে অন্ন আমার ঘরে নেই— তুমি আমাকে যে ভাবে কল্পনা করচ আমি হয় তো সে ভাবের মানুষ নই— আমাকে কাছে দেখ্‌লে সে কথাটা ধরা পড়ে হয় তো তুমি কষ্ট পাবে।

তুমি লিখেচ আমার সম্বন্ধে এক সময়ে তোমার এবং তোমাদের অনেকের একটা বিরুদ্ধতা ছিল। এই বিরুদ্ধতা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে আমার দেশের ভিতরেই আছে। আমার স্বভাব দেশের প্রচলিত ধারার সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারে নি। যাদের আমি বন্ধুভাবে গণ্য করেছি, হঠাৎ দেখি আমার সম্বন্ধে তাদের প্রতিকূলতা নিদারুণভাবে তীব্র হয়ে উঠেচে। বুঝতে পারি আমি যেখানকার লোক সেখানকার সঙ্গে আমি বেখাপ। এক জায়গায় এরা আমার কাছাকাছি এসে হুঁচট খেয়ে পড়ে— সেটা আমার স্বভাবের দোষে না তাদের চলনের ত্রুটিতে সে তর্ক করে কোনো লাভ নেই— এবং তর্কে জিতলেও কোনো সান্ত্বনা নেই।

বাল্যকাল থেকে তুমি যে সব বাংলা বই পড়েচ তোমার চিত্ত এবং রুচি যে সাহিত্যরসে সাড়া দিতে অভ্যস্ত তোমার চিঠিতে তারও বিবরণ দেখলুম। তুমি নিশ্চয় এটা দেখেচ

আমাদের সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকার সমালোচনার আমি লক্ষ্য— কিন্তু আমি নিজে পারতপক্ষে সমালোচনার আসরে কলম হাতে নিয়ে নামি নে। আমার দেশের প্রচলিত সাহিত্যের সীমানার মধ্যে আমার চিত্ত পদে পদে বাধা পায়। তার প্রাদেশিকতা, অগভীরতা, অপটুতা আমার আদর্শের সঙ্গে মেলে না। এই সব নানা কারণে আমি খুব কোণে এসে বসেচি। নিজেকে একঘরে' করে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে আরামের ও নিরাপদ। নিশ্চয়ই দেখবে সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার সঙ্গে আমার সুরের মিল হবে না। তার কারণ, আমার দেশে আমি বেগানা— আমাকে যখন তোমাদের ভালোও লাগে সেও হয়ত একটা কোনো আকস্মিক কারণে। অথচ এ কথা নিশ্চয় জেনো, সাহিত্যের দিক থেকে তোমার লেখায় বারে বারে আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেচে। কিন্তু সাহিত্যবিচারবুদ্ধিতে তুমি যে প্রশস্ত আদর্শ পেয়েছ তা আমি মনে করি নে। না পাবার প্রধান কারণ বাংলা সাহিত্যকে তুমি বাংলা সাহিত্যের বাহির থেকে দেখ্‌তে পাও নি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যে প্রকাশ আছে ঘটনাক্রমে তার পরিচয় তোমার কাছে নেই। অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে ভিতের উপর তার বাসা ফাঁদচে সে ভিৎটা য়ুরোপীয়। তার গল্প, তার কাব্য, তার নাটক, প্রাচীন রীতির আশ্রয়ে তৈরি হয় নি— সেই কারণেই য়ুরোপীয় সাহিত্যবিচারের আদর্শে তাকে বিচার করা ছাড়া অন্য পন্থা নেই। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দ্দেশ এখানে একেবারেই খাটবে না।

যখন কলকাতায় যাব কোনো সুযোগে হয়ত দেখা হতে পারে। সম্প্রতি আমার বৌমা তাঁর সংসার নিয়ে দার্জ্জিলিঙে আছেন— সেই জন্য কলকাতায় গেলে জোড়াসাঁকোর শূন্য বাড়িতে না থেকে স্নেহাস্পদ প্রশান্তকুমারের বরাহনগরের বাগান-বাড়িতে দুই চার দিন থেকে আবার এখানে পালিয়ে আসি। সেখানে তুমি হয়ত যেতে সঙ্কোচ বোধ করবে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যদি আসতে পারো বড়োমানুষির বাধা পাবে না। আগে থাকতে যদি জানতে পারি তবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু কবে কলকাতায় যাব জানি নে— যাবার একটুও ইচ্ছে নেই এইটুকু বলতে পারিনে। এতবড়ো চিঠি লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কিন্তু যে আমাকে সত্যই বুঝতে চায় সে আমাকে পাছে একটুও ভুল বুঝে অস্থানে অর্ঘ্য আহরণ করে এটাতে আমার একান্ত অনভিরুচি বলেই এতটা লিখ্‌তে হোলো। হয়তো কিছু অহঙ্কারের মত শোনাচ্চে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণা যদি অহঙ্কৃত ধারণাই হয় সেটাও প্রকাশ হওয়াই ভালো ইতি

৩০ বৈশাখ ১৩৩৮ শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার নিরতিশয় ব্যস্ততার মধ্যে আমি নতুন কবিতা স্বহস্তে লিখে শ্রীপতি বসুকে পাঠিয়েছি সেটা কোথায় অন্তর্দ্ধান করল? তার পরিবর্ত্তে শ্রীপতির এক অভিমানক্ষুব্ধ পত্র পেলুম— এ পত্র পোষ্টবিভাগের কর্ত্তাদের প্রাপ্য। তোমরা কোন চিঠি পাও কোন্‌টা পাও না তাও নির্ণয় করা অসাধ্য

১২

১৫ মে ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রোসো, সব প্রথমে তোমাকে গুটিকতক কাজের কথা বলি। ভয় পেয়ো না।

হঠাৎ কিছুদিন পূর্ব্বে পারস্যরাজ আমাকে তাঁর রাজ্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নিজের দেহ দারিদ্র্য ভুলে গিয়ে স্বীকার করেছি। সেখানকার গোলাপবাগানের বুল্‌বুলের গীতপত্রী মনে এসে পৌঁছল। সব প্রস্তুত। সেই সময়ে আমার অনুভব হোলো যে-রসের আসরে এ জন্মে আমার ডাক পড়েচে সেখান-কার পরিভাষায় সব ভাষাই মেলে। তাই তোমাকে একখানা পত্রে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম কোনো বিশেষ কুলুপে আমার ভাণ্ডারদ্বার খোলে না। বস্তুত বিশেষ কুলুপের জটিল চেহারা দেখ্‌লেই আমাকে ব্যস্ত করে তোলে। হয়ত আমার সে লেখায় কিছু স্পর্দ্ধার সুর ছিল— সেটা একেবারেই ভালো নয়— তোমার আনন্দের উৎস যদি কোনো বিশেষ আকারের ফোয়ারা দিয়ে উচ্ছলিত হয় তার রূপ ও ভঙ্গী শুধু কেবল রসমাধুর্য্যে নয় তোমার মমত্বের অফুরান ইন্দ্রজালে মূল্যবান। তোমার চিত্ত গভীরভাবে তার মধ্যে আবিষ্ট হোক্‌না কেন!

সেই ও পারের গোলাপবাগানে বুলবুলের আসরের পথে ডানা মেলচি এমন সময়ে জ্বর এল। বুঝলুম আমার মনিব দ্বার

আগ্‌লে দাঁড়ালেন। জ্বর আমার প্রায়ই হয় না। এবারকার মতো চুকে গেল।

আর একটা কথার উপর তোমার মন হুঁচট্ খেয়েছে। সে হচ্চে শ্রীযুক্তা। ও বিশেষণটা ভীমের তূণেই মানায়— আমি সব্যসাচীর চেলা। যিনি খামের যোগে তোমার প্রতি এই সংজ্ঞা প্রয়োগ করেছিলেন তিনি আমার সহকারী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র— তাঁর সুকুমার নামকে শ্রীমান পদবীতে ভূষিত করলুম না। শিক্ষার জন্যে ভ্রমরস্য পেলবং পদং সরিয়ে দিয়ে পতত্রীকে বসানো গেল।

আরো একটা বিষয়ে তিনি স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে পরের অধিকারকে লঙ্ঘন করেছেন। শ্রীপতির নামে যে কবিতা আমি বিশেষ করে রওনা করেছিলুম তার উপর তিনি দক্ষবালার স্বত্ব স্থাপন করেছেন। এ কথা বলে রাখি, নাম্নীর প্রতি যাই হোক ঐ নামের প্রতি আমার লেশমাত্র পক্ষপাত নেই।

যিনি প্রমাদ ঘটিয়েছেন তিনি এই আশু অপরাধের পূর্ব্বেই কিছুকাল থেকেই কান্তাবিরহগুরুণা শাপেনাস্তংগমিতমহিমা। অতএব তাঁর ভ্রম সংশোধন করে তাঁকে ক্ষমার্হ করে নিয়ো।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা আছে। তোমার পরে আমার কোনো শাপ লাগে নি। তোমার জীবনের যন্ত্র এবং আমার যন্ত্রে তারের কিছু তফাৎ আছে। তবুও এক ওস্তাদ আর এক ওস্তাদকে চেনে এবং বাহবা দেয়। আমার বাহবা পেয়েছ।

কিন্তু জ্বরতাপ চড়ে যাচ্চে। তুমি অকারণে নিজেকে পীড়ন কোরো না। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩
২০ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যদিও জ্বর ভোগ করছিলুম তবুও পারস্যযাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলুম। যাত্রার পূর্ব্বদিনে অসুখ বেড়ে উঠল— ডাক্তার পথরোধ করে দাঁড়াল। তাই পারস্যের বদলে শয্যার শরণ নিয়েছি।

তোমার লেখা যখন যা খুসি পাঠিয়ে দিয়ো। নিশ্চয়ই পড়বো এবং ভাল লাগবারই আশা করি। আমার তরফ থেকে চিঠি লেখা অনেক সময়েই দুঃসাধ্য হবে। কবিপরিচিতি নামক একখানি বই তোমাকে পাঠাতে বলেছি। ইতি ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪
[মে ১৯৩১]

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এতটুকু একটুখানি জ্বর রক্তের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্চে —ডাক্তার তাকে চিনে উঠ্‌তে পারে না। দার্জ্জিলিঙের হাওয়ায় তাকে ঝাড়িয়ে নেবার জন্যে পরামর্শ দিচ্চে। অবশেষে হার

মেনে সেই দিকে পা বাড়িয়েছি। কাল রবিবারে কলিকাতায় যাত্রা করব। তারপরে তুই একদিন ডাক্তাররা নানাবিধ যন্ত্রের দ্বারা সওয়াল জবাব করে দেহটার কাছ থেকে তার গোপন অপরাধের বিষয় ও আশ্রয়টার কথাটা কবুল করিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। জানি পারবে না। অবশেষে হিমাচলের উপরে ভার পড়বে শুশ্রূষার।

আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব,— ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে নটরাজের নৃত্যও হয়— যমুনায় নৌকা ভাসান দিয়ে শেষকালে পড়ি গিয়ে সেই গঙ্গায় যে গঙ্গা গৈরিক পরে চলেছেন সমুদ্রে। ইতি

শয্যাগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

দার্জিলিং * ৩০ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ক্ষুদে জ্বরে পেয়ে বসেছিল, তার বহর নিরেনব্বইয়ের বেশি নয়, কিন্তু সেই জন্যেই ঝুঁটি ধরে তাকে বিদায় করা শক্ত হয়ে উঠেছিল। সংসারের সমস্ত ক্ষুদে শত্রুদের জোর ঐখানেই— চেপে ধরতে গেলেই এড়িয়ে যায়। কিছুই নয় বলে যতই অবজ্ঞা করতে চেষ্টা করেছি ততই সে পাকা করে বাসা বাঁধতে

লেগে গেল। অবশেষে দেবতাত্মা নগাধিরাজের শরণ নিয়েছি। নিরেনব্বইয়ের ধাক্কাটা এখানে এসে কেটেচে। আমার শরীরের জন্যে মনে কোনো উদ্বেগ রেখো না। ঘোরতর কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেচে— কুঁড়েমির দুর্গে আছি বল্‌লেই হয়— এমন কি ছবি আঁকার দুর্নিবার নেশাও আমাকে নাগাল পাচ্চে না। আমার খবর যদি পেতে চাও তবে দৈনিক সংবাদপত্র চলবে না— সাপ্তাহিক সম্ভবপর হতে পারবে। যাই হোক দেহটা সম্বন্ধে দুঃসংবাদের আশঙ্কা নেই।

দাদা

ঠিকানা Asantuli. দার্জ্জিলিং

১৬

২ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

এখানকার পাহাড়ে এই জ্যৈষ্ঠ মাসেও যেমন অকস্মাৎ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে উঠে চারদিক অকারণে আচ্ছন্ন করে দেয় তোমার মনের মধ্যেও দেখি সেই দশা। কোথাও কিচ্ছু নেই দুঃখের কুয়াশা ঘন করে জমিয়ে তোলো। তোমার পত্রে আমার প্রতি সৌজন্যের কোনো স্খলন হয়েচে এ আমি লক্ষ্যও করি নি তার একটা কারণ বিশ্বাস করতে পারিনে, আর একটা কারণ, দেবতার যে অর্ঘ্যের বর্ণনা নিয়ে তোমার ভাষায় চ্যুতি হয়েচে বলে কল্পনা

করচ সে সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। আমাদের দেবতার যে কি প্রাপ্য আর কি প্রাপ্য নয় সে আমার অগোচর— কেবল মাঝে মাঝে এই কথাটা মনে হয় যাঁদের বন্দনায় কাঁসরের ধ্বনি চলে তাঁদের ভোগের জন্যে কী না চল্‌তে পারে।

শরীরটা এখানে এসে ভালোই আছে সে সংবাদ পূর্ব্বেই জানিয়েছি। দেহটা এখন অপরিমিত আলস্যসাধনায় নিযুক্ত আছে।

তুমি যে-ভাষায় চিঠি লেখ সেই ভাষায় যদি গল্প লেখ নিশ্চয়ই সেটা উপাদেয় হবে। সাজিয়ে লিখ্‌তে গেলেই ঠক্‌বে। তোমার জানা কথা ঘরের কথাকে গল্পে ফুটিয়ে তুল্‌লে সাহিত্যে তা আদর পাবে কেননা তোমার লেখায় সহজ রস আছে। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

৪ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি থেকে তোমার লেখা কিছু কিছু আমার চুরি করতে ইচ্ছে করে। হয়ত কোন্‌দিন করব। তোমার মধ্যে দেখবার দৃষ্টি, ভাববার মন, লেখবার কলম ও হৃদয়ের আবেগ একসঙ্গে মিলেচে। তোমার লেখায় অনায়াসে তুমি রস সঞ্চার করতে পারো। লেখক হিসাবে আমার একটা অভাব আছে।

আমি আমাদের দেশের সমাজকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানি নে। তাই গল্প যখন লিখি ছবিতে ফাঁক থাকে, পাশ কাটিয়ে চলতে হয়। তোমার চিঠিগুলিতে খাঁটি বাঙালীঘরের হাওয়া পাই। বিদেশে থাকবার সময় এক একদিন হোটেলের কেদারায় ঠেসান দিয়ে মুলতান সুরে গুন্‌গুন্ করে গান গাই, "মনে রইল সই মনের বেদনা", অম্‌নি বাংলা দেশের মেয়ের করুণ হৃদয়ের স্পর্শ মনে এসে লাগে। তোমার চিঠির বিচিত্র আলোচনায় বাঙালী মেয়ের অন্তরের সুরটি স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে— আমার ভালো লাগে। হাসি পায় যখন তোমার চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করো যে আমার রাগ হচ্চে। তুমি কি মনে করো মতামতের গদাযুদ্ধ করা আমার স্বভাব? যেখানে আমি রস পাই, সেখানে তর্কের বিষয়টা আমার কাছে গা-ঢাকা দেয়, সেখানে কিছুই আমার পক্ষে বেগানা নয়। বৈষ্ণব যেখানে বোষ্টম নয় সেখানে আমিও বৈষ্ণব, খৃষ্টান যেখানে খেষ্টান্ নয় সেখানে আমিও খৃষ্টান। আমাদের দেবপূজায় বিদেশী ফুলের স্থান নেই, কিন্তু আমার মনের কাছে সব ফুলই ফুল, সোলার ফুল ছাড়া। নিজের মধ্যে যা খাঁটি বিশ্বের সত্যকে তা স্পর্শ করে।

ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং— রাজসাহী জেলার রান্নার যে গন্ধ তোমার চিঠি থেকে পাওয়া গেল সেটা লোভনীয়, সুক্তনিতে এসেই থামবার দরকার নেই। আমার মুস্কিল এই, আমার এ বয়সে উপাদেয় ভোজ্যের সমাদর রসনা পর্য্যন্ত, পাকযন্ত্র পর্য্যন্ত নয়। এত কম খাই যে, যদি তার বিবরণ প্রচার করি তবে আমাদের দেশের লোকে আমাকে মহাপুরুষ বলে মনে

করতে পারে। একদা আমি ভাত না খেয়ে রুটি খেতুম— সেটাকে উপবাস শ্রেণীতে গণ্য করে' আমার প্রজাদের মনে প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল। অবশেষে নিতান্ত দৈন্যের জ্বালায় যদি অবতারের ব্যবসা ধরা দরকার হয় তবে এই পরিমাণে তার শিক্ষা এগিয়ে আছে।

ঘন মেঘ করে বৃষ্টি এল, এইবার চিঠি বন্ধ করা যাক্। ইতি

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

৭ জুন ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

বাহির থেকে যতটা পীড়া পাও তাই যথেষ্ট কিন্তু অন্তর থেকে স্বরচিত পীড়া তার সঙ্গে যোগ কোরো না। বিধাতা যেখানে দাঁড়ি টেনে দেন তোমার মনকে বোলো তার পিছনে মোটা কলমে আরো একটা দাঁড়ি টেনে খতম করে দিতে। আমাদের দেশে অন্ত্যেষ্টিসৎকারের তত্ত্বটা ঐ— মৃত্যু যখন দেহটাকে সংহার করে তখন সেটাকে কবরে জমাবার চেষ্টা না করে আগুন জ্বালিয়ে সেটার উপসংহার করাই শান্তির পথ। সংসার আমাদের অনেক কিছু দিয়ে থাকে কিন্তু তার চরম দান হচ্চে বঞ্চিত হবার শিক্ষাদান। যা পাওয়া যায় তার উপরে

একান্ত নির্ভর করার অভ্যাসেই আমাদের সাংঘাতিক ফাঁকি দেয়, যা হারায় বা না পাওয়া যায় সে ফাঁকির মধ্যে প্রবঞ্চনা নেই,— সেটার উপলক্ষ্য সংসারে পদে পদেই ঘটে তবু তাকে সহজে গ্রহণ করবার শিক্ষাটা কিছুতেই পাকা হতে চায় না। যেখানে আপিল খাটে না সেখানে নালিশ করার মতো অপব্যয় কিছুই নেই। অন্তরের মধ্যে একটা ক্ষতিপূরণের ভাণ্ডার আছে— কিন্তু আমরা সেই ভাণ্ডারের কুলুপে মরচে ধরিয়ে ফেলি তাই সান্ত্বনার সম্পদকে অন্তরে আবদ্ধ রেখে তাকে পাই নে। আমাদের উৎস আছে তার মুখে পাথর চাপানো, ডোবা আছে তার জল পদে পদে শুকিয়ে যায়— সংসারের নিষ্ঠুরতা বারবার কঠোর কণ্ঠে এই কথাই বলে, ঐ পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দাও। বাহিরটা বিশ্বাসঘাতক, তাকে জোরে আশ্রয় করতে গেলেই আশ্রয় ভাঙে— সেই ভাঙনেই যদি অন্তরের পথ দেখিয়ে না দেয় তবে দুদিক থেকেই ঠকতে হয়। আমার মুখে উপদেশ শুনে মনে কোরো না যে আমিই বুঝি বাহিরের মর্ত্ত্যলোক ডিঙিয়ে অন্তরের অমরাবতীতে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। যখন সংসার থেকে তাড়া খাই তখন সংসার পেরোবার রাস্তা সাফ করতে লেগে যাই— ফাঁড়া কেটে গেলে আবার কুঁড়েমিও ধরে। অতএব উপদেষ্টাকে অযথা ভক্তি করবার কারণ নেই।

সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

১৪ জুন ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার জীবনটা তিন ভাগে বিভক্ত— কাজে, বাজে কাজে এবং অকাজে। কাজের দিকে আছে ইস্কুলমাস্টারী, লেখা, বিশ্বভারতী ইত্যাদি, এইটে হোলো কর্ত্তব্য বিভাগ। তার পরে আছে অনাবশ্যক বিভাগ। এইখেনে যতকিছু নেশার সরঞ্জাম। কাব্য, গান এবং ছবি। নেশার মাত্রা পরে পরে তীব্রতর হয়ে উঠেচে। একদা প্রথম বয়সে কবিতা ছিলেন একেশ্বরী — ধরণীর আদিযুগে যেমন সমস্তই ছিল জল। মনের এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত তারি কলকল্লোলে ছিল মুখরিত। নিছক ভাবরসের লীলা, স্বপ্নলোকের উৎসব। তার পরে দ্বিতীয় বয়সে এল কাজের তাগিদ। সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে কাছাকাছি মিলতে হোলো। তখনি এল কর্ত্তব্যের আহ্বান। জলের ভিতর থেকে স্থল মাথা তুলল। সেখানে জলের ঢেউয়ে আর উনপঞ্চাশ পবনের ধাক্কায় টলে' টলে' কেবল ভেসে ভেসে বেড়ানো নয়, বাসা বাঁধার পালা, বিচিত্র তার উদ্যোগ। মানুষকে মানতে হোলো, রঙীন প্রদোষের আবছায়ায় নয়, সে তার সুখ দুঃখ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল বাস্তব লোকে। সেই মানব অতিথি যখন মনের দ্বারে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে, অয়মহং ভোঃ, সেই সময়ে ঐ কবিতাটা লিখেছিলুম, এবার ফিরাও মোরে। শুধু আমার কল্পনাকে নয়, কলাকৌশলকে নয়, দাবী করলে

আমার বুদ্ধিকে চিন্তাকে সেবাকে আমার সমগ্র শক্তিকে, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বকে। তখন থেকে জীবনে আর এক পর্ব্ব সুরু হোলো। একটা আরেকটাকে প্রতিহত করলে না— মহাসাগরে পরিবেষ্টিত মহাদেশের পালা এলো। মাতামাতি ঐ রসসাগরের দিকে, আর ত্যাগ ও তপস্যা ঐ মহাদেশের ক্ষেত্রে। কাজেও টানে, নেশাতেও ছাড়ে না। বহুদিন আমার নেশার দুই মহল ছিল বাণী এবং গান, শেষ বয়সে তার সঙ্গে আর একটা এসে যোগ দিয়েছে— ছবি। মাতনের মাত্রা অনুসারে বাণীর চেয়ে গানের বেগ বেশি, গানের চেয়ে ছবির। যাই হোক্ এই লীলাসমুদ্রেই আরম্ভ হয়েচে আমার জীবনের আদি মহাযুগ— এইখানেই ধ্বনি এবং নৃত্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ, এইখানেই নটরাজের আত্মবিস্মৃত তাণ্ডব। তার পরে মধ্যযুগে নটরাজ এলেন তপস্বীবেশে ভিক্ষুরূপে। দাবীর আর শেষ নেই। ভিক্ষার ঝুলি ভরতে হবে— ত্যাগের সাধনা কঠিন সাধনা।

এই লীলা এবং কর্ম্মের মাঝে মাঝে নৈষ্কর্ম্ম্যের অবকাশ পাওয়া যায়। ওটাকে আকাশ বলা যেতে পারে, মনটাকে শূন্যে উড়িয়ে দেবার সুযোগ ঐখানে— না আছে বাঁধা রাস্তা, না আছে গম্যস্থান, না আছে কর্ম্মক্ষেত্র। শরীর মন যখন হাল ছেড়ে দেয় তখনি আছে এই শূন্য। সম্প্রতি কিছুদিন এই অবকাশের মধ্যে ছিলুম— আপিসও ছিল বন্ধ, আমার খেলাঘরেও পড়েছিল চাবী। এই ফাঁকের মধ্যেই তোমার চিঠি এল আমার হাতে, পড়তে ভালো লাগ্‌ল,— ভালো লাগবার প্রধান কারণ, এই চিঠির মধ্যে তোমার একটি সহজ আত্মপ্রকাশ আছে, এই

সহজ প্রকাশের শক্তি একেবারেই সহজ নয়। অধিকাংশ লোক আছে যারা প্রায় বোবা, আর একদল আছে যারা কথা কয় পরের ভাষায়, যারা নিজের চেহারা দাঁড় করাতে চায় পরের চেহারার ছাঁচে। তোমার সমস্ত প্রকৃতি কথা কয়, ঝরনা যেমন কথা কয় তার সমস্ত ধারাটাকে নিয়ে। আমি বুঝতে পারি আমাকে চিঠি লেখায় তোমার আন্তরিক প্রয়োজন আছে। প্রকাশ করবার আবেগ তোমার মধ্যে আছে, তার উপলক্ষ্য চাই। আমি স্নেহের সঙ্গে শুনচি জেনে তুমি মনের আনন্দে অবাধে কয়ে যাচ্চ। আমাকে তুমি দেখো নি, স্পষ্ট করে জানো না, সেও একটা সুযোগ। কেননা তোমার শ্রোতাকে তুমি নিজের মনে গড়ে নিয়েচ। তার অনতিস্ফুট পরিচয়ই একটা আবরণ, তার অন্তরালে অসঙ্কোচে আপন মনে কথা বলে যেতে পারো।

ছুটি ছিল,— না টেনেছিল আসল কাজে, না জমেছিল বাজে কাজ। তাই আমিও তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পেরেছি। কিন্তু যখন নামবে বর্ষা, কাজের বাদল, তখন আর সময় দিতে পারব না। আর বেশি দেরি নেই। ইতিমধ্যে দুই একদিন ছবি আঁকার পাকের মধ্যে পড়েছিলুম, ভুলেছিলুম পৃথিবীতে এর চেয়ে গুরুতর কিছু আছে। যদি পুরোপুরি আমাকে পেয়ে বসত তাহলে আর কিছুতেই মন থাকত না। ওদিকে কাজের দিনও এলো বলে, তখন সময়ের মধ্যে ফাঁক প্রায় থাকবে না। কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখচি, কারণ, আমার চিঠি পাওয়া তোমার অভ্যাস হয়ে আসচে, বন্ধ যখন হয়ে যাবে তখন মনে কোরো না তার কারণ উপেক্ষা। আমার সময়ের উপর

আমার ব্যক্তিগত অধিকার খুব কম, অবকাশের তহবিল সম্পূর্ণ আমার জিম্মায় নেই, তাকে যেমন খুসি ব্যয় করতে পারি নে।

তোমাদের পূজার্চ্চনার সঙ্গে বিজড়িত দিনকৃত্যের যে ছবি দিয়েছ, তার থেকে নারীপ্রকৃতির একটি সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পেলুম। তোমরা মায়ের জাত, প্রাণের পরে তোমাদের দরদ স্বাভাবিক ও প্রবল। জীবদেহকে খাইয়ে পরিয়ে নাইয়ে সাজিয়ে তোমাদের আনন্দ। এর জন্যে তোমাদের একটা বুভুক্ষা আছে। শিশুবেলাতেও পুতুল খেলাতে তোমাদের সেই সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। তোমার বোন যে তোমাকে প্রাণপণে সেবা করত সে তার স্বভাবের গরজে ; না করতে পারলেই তার চিত্ত বঞ্চিত হোতো। ঠাকুরের সেবার যে বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই সেই মাতৃহৃদয়েরই সেবার আকাঙ্ক্ষাকে বড়ো করে পরিতৃপ্তি দেবার এই উপায়। ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোলা, কাপড় পরানো, পাছে তাঁর পিত্তি পড়ে এই ভয়ে যথাসময়ে আদর করে খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারের বাস্তবতা আমার মতো লোকের কাছে নেই, তোমাদের কাছে আছে তোমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির নিরতিশয় প্রয়োজনের মধ্যে— যেমন করে হোক্ সেই প্রকৃতিকে চরিতার্থতা দেবার মধ্যে। প্রাণের বেদনা যে আমার প্রাণেও বাজে না, তা নয়, কিন্তু সে বেদনা যথাস্থানেই কাজ খোঁজে, কাল্পনিক সেবায় নিজেকে তৃপ্ত করবার চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়,— আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে— সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে—

যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়। ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করেচেন, সেইখানে নারীর পূজা সত্য হয়েচে। মানুষের মধ্যে যে দেবতা ক্ষুধিত তৃষিত রোগার্ত্ত শোকাতুর, তাঁর জন্যে মহাপুরুষেরা সর্ব্বস্ব দেন, প্রাণ নিবেদন করেন, সেবাকে ভাববিলাসিতায় সমাপ্ত না করে তাকে বুদ্ধিতে বীর্য্যে ত্যাগে মহৎ করে তোলেন। তোমার লেখায় তোমাদের পূজার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয় এ সমস্তই অবরুদ্ধ অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মবিড়ম্বনা। আমার মানুষ-রূপী ভগবানের পূজাকে এত সহজ করে তুলে তাঁকে যারা প্রত্যহ বঞ্চিত করে তারা প্রত্যহ নিজে বঞ্চিত হয়। তাদের দেশের মানুষ একান্ত উপেক্ষিত, সেই উপেক্ষিত মানুষের দৈন্যে ও দুঃখে সে দেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে সকল দেশের পিছনে পড়ে আছে। এ সব কথা বলে' তোমাকে ব্যথা দিতে আমার সহজে ইচ্ছা করে না— কিন্তু যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত সেখানে আমার মন ধৈর্য্য মানে না। গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলেম তখন পশ্চিমের কোন্ এক পূজামুগ্ধা রানী পাণ্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন— ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থালি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরি। দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে অন্নের জন্যে, আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ-সামর্থ্য সময় প্রীতি ভক্তি সমস্ত দিচ্চে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্চে। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য অন্য কোনো দেশেই নেই, এর প্রধান

কারণ এই যে, এ দেশে হতভাগা মানুষের সমস্ত প্রাপ্য দেবতা নিচ্চেন হরণ করে।

রানী মহলানবিশ, প্রশান্ত মহলানবিশের স্ত্রী। প্রশান্ত মহলানবিশ বিশ্বভারতীর প্রধান পাণ্ডা। কিন্তু পাণ্ডা নানা কর্ত্তব্য নিয়ে অন্যমনস্ক, সেই জন্যে তোমাকে বই পাঠাবার আবেদন আমি পুরুষ দেবতাকে লঙ্ঘন করে নারী দেবতাকে জানিয়েছিলুম সেই জন্যেই তার ফল এত দ্রুত পাওয়া গেল। ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

দাদা

একটা কথা মনে রেখো তোমার উজ্জ্বল রচনায় যে ছবি আমার কাছে প্রকাশ পায় আমার কাছে সে অত্যন্ত ঔৎসুক্য-জনক। তোমার লেখার রস আমাকে গভীর আনন্দ দেয় মতের অনৈক্য স্বতন্ত্র কথা। তোমার লেখা অত্যন্ত সত্য সেইখানে তার মূল্য অনেক। দার্জ্জিলিং

২০

১৮ জুন ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

রাগ করতে যাব কেন? তুমি আমার নামে যে কয় দফা নালিশ তুলেছ প্রায় সবগুলোই যে সত্যি। অস্বীকার করতে পারব না যে আমি অনেক কথাই বলেছি যা দেশের লোকের

কানে মধুর ঠেকে নি। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন করতে গিয়ে সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, প্রজারা জয় জয় করেছিল, সোনার সীতা দিয়ে তিনি ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিলেন। দশের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে যদি সত্যকে নির্ব্বাসন দিতে পারতুম, তাহলে সান্ত্বনার প্রয়োজনে সোনার অভাব ঘটত না। আমার চেয়ে ঢের বড়ো বড়ো লোকেরাও যে-কালে ও যে-সমাজে এসেছেন সেখানে তাঁরা তিরস্কৃত হয়েচেন— নইলে বিধাতা তাঁদের পাঠাবেন কেন? দশের ভিড়ে একাদশ দ্বাদশ সর্ব্বদাই আসে, কোম্পানির কাগজ জমিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে আসে বিষম মুস্কিলটা, হিসাবী লোকের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার জন্যে। প্রতিধ্বনির সম্প্রদায়, প্রথার প্রাচীর তুলে অচল দুর্গ বানিয়েচে, তাদের কণ্ঠে কণ্ঠে পুঁথির প্রতিধ্বনি এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে হাজার হাজার বৎসর ধরে একটানা চলেইচে— মহা-কালের শৃঙ্গধ্বনি মাঝে মাঝে জাগে সেই ফাঁকা আওয়াজের শূন্যতা ভরিয়ে দেবে বলে। পানাপুকুর স্তব্ধ হয়ে থাকে আপন পাড়ির বাঁধনে— হঠাৎ এক এক বছর বর্ষার প্লাবন আসে তার কূল ছাপিয়ে দিতে— সেটা দেখায় যেন বিরুদ্ধতার মতো, কিন্তু তাতেই রক্ষে। আমি গোড়া থেকেই একঘরের দলে ভিড়েছি, ঘরের কোণ-বিহারীদের মাঝখানে যারা বেগানা আমি সেই হা-ঘরেদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লুম— ঘোরো যারা তারা মারতে আসবে, মারতে এসেই বেরোতে শিখবে।

তুমি লিখেচ আমি পুরাতন ভারতের প্রতিকূল। রঘুনন্দনের ভারতটাই বুঝি পুরাতন ভারত? দেবীদাসের কৌলীন্যই বুঝি

সনাতন কৌলীন্য ? মহাভারত পড়েছ ত— **পৌরাণিক** যুগের আচার আচমনে উপবাসে বুকের হাড় বের করা পুরাতন ভারতের সঙ্গে কোন্‌খানে তার মিল ? যে পুরাতন ভারত চিরন্তন ভারত আমি তাকেই প্রণাম করে মেনে নিয়েছি, তার বাইরে যাই নি। আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে-উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদ-বর্জ্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল-করা,— যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয়, পাণ্ডাপুরোহিতের পদসেবায় নয়। যে-য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কার-মুক্ত করে কর্ম্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য জানুক বা না জানুক। যে-য়ুরোপ শক্তি-পূজার বীভৎস আয়োজনে বিজ্ঞানের খর্পরে নররক্তের অর্ঘ্য রচনা করচে সেই য়ুরোপ পৌরাণিক— সেই য়ুরোপ জানে না বাহিরের যন্ত্র মনের দৈন্য তাড়াতে পারে না, যন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আমরাও যেমন অন্তরের পাপকে বাহিরের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ করতে চেয়েছি— তারাও তেমনি অন্তরের অকৃতার্থতাকে বাহিরের আয়োজনে পূর্ণ করবার দুরাশা রাখে, এইখানেই যাকে আমরা পুরাতন ভারত বলি তার সঙ্গে এদের মেলে। মেলে না সেই উপনিষদের সঙ্গে যিনি বলেচেন,

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,

হৃদা মনীষা মনসাভিক্ঌপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

যে দেবতা সকল জনানাং হৃদয়ে, যাঁর কর্ম্ম আচারবিচারের নিরর্থক ক্রিয়াকর্ম্ম নয় সকল বিশ্বের কর্ম্ম, সকল আত্মার মধ্যে যে মহাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয় তিনিই উপনিষদের দেবতা, তাঁকেই দেউলের মধ্যে সরিয়ে রেখেছে যাকে বলি পুরাতন ভারত— আর সোনার শিকলে বাঁধতে চেয়েচে স্বর্ণলঙ্কাপুরীর য়ুরোপ। এই উভয়ে পরস্পরের সতীন বলেই এদের পরস্পরের প্রতি এত বিরাগ। মানুষের আত্মায় যিনি মহাত্মা, মানুষের কর্ম্মে যিনি বিশ্বকর্ম্মা, আমি জেনে না জেনে সেই দেবতাকেই মেনেচি— তিনি যেখানে উপবাসী পীড়িত সেখান থেকে আমার ঠাকুরের ভোগ অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারিনে। খৃষ্ট বলেচেন, বিবস্ত্রকে যে কাপড় পরায় সেই আমাকেই কাপড় পরায়, নিরন্নকে যে অন্ন দেয় সে আমাকেই অন্ন দেয় —এই কথাটাই ব্রহ্মভাষ্য। এই কথাটাকেই "দরিদ্রনারায়ণ" নাম দিয়ে হালে আমরা বানিয়েছি— দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণকে উপলব্ধি ও সেবা করার কথাটা ভারতের জালস্বাক্ষর করা— আমাদের উপলব্ধি প্রধানত গো-ব্রাহ্মণের মধ্যে। কিন্তু যথার্থ পুরাতন ভারত, যে-ভারত চির-নূতন— যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি— তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আমার সব লেখা যদি ভালো করে পড়তে তাহলে বুঝতে আমার চিত্ত মহা-ভারতের অধিবাসী— এই মহা-ভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।

যদি সময় পাই তোমার অন্য নালিশের কথা অন্য কোনো চিঠিতে বলবার চেষ্টা করব। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২১

২৩ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

আমার কল্পরূপকে আশ্রয় করে যাঁকে তুমি হৃদয়ে উপলব্ধি করেচ আমি তাঁকেই পূজা করে থাকি, তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই— তিনি পরমমানব। নিজেকে বৃহৎ কালে বৃহৎ দেশে তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়ে যখন আমি ধ্যান করি তখনি নিজেকে আমি সত্যরূপে জানি, আমার ছোটো-আমির যত কিছু ক্ষুদ্রতা সব বিলীন হয়ে যায়— তখন আমি সত্য আধারে নিত্য আধারে থাকি। তাঁরই আহ্বানে রাজপুত্র ছিন্নকন্থা পরে' পথে বেরিয়েছেন। বীরের বীর্য্য, গুণীর গুণ, প্রেমিকের প্রেম তাঁরি মধ্যে চিরন্তন। তুমিও হৃদয় দিয়ে তাঁকেই গভীরের মধ্যে স্পর্শ কর, যেখানে তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার সত্যকার আত্মনিবেদন। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ— তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁকে সত্য অনুভবের দ্বারা জানতে হবে, নিজের বাইরে, নিজের গভীরে। আমি সহরের মানুষ, একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুন্‌লুম, "আমি

কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।" আমি যেন চমকে উঠ্‌লুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, "হৃদা মনীষা"— হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে। সেই মহান্ আত্মার অমরাবতী হচ্চে, "সদা জনানাং হৃদয়ে।" কত লোক দেখেচি যারা নিজেকে নাস্তিক বলেই কল্পনা করে, অথচ সর্ব্বজনের উদ্দেশে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করচে, আবার এও প্রায়ই দেখা যায় যারা নিজেকে ধার্ম্মিক বলেই মনে করে তারা সর্ব্বজনের সেবায় পরম কৃপণ, মানুষকে তারা নানা উপলক্ষ্যেই পীড়িত করে বঞ্চিত করে। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কর্ম্মের মিল আছে মহান্ আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ আছে কত নাস্তিকের,— তাদের সত্য পূজা জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে, কত বিচিত্র কীর্ত্তিতে জগতে নিত্য হয়ে গেছে, তাদের নৈবেদ্যের ডালি কোনোদিন রিক্ত হবে না। মনের মানুষের শাশ্বত রূপ তারা অন্তরে দেখেচে, তাই তারা অনায়াসে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত পণ করতে পারে।— তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ— সেই বেদনীয় পুরুষকে আপনার মধ্যে জানো, মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দিক্। য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি— কারণ তারা বেঁচে থাকে সকল কালের সকল লোকের মধ্যে, যাঁর উপলব্ধির মধ্যে তাদের আত্মোপলব্ধি তাঁর বিরাট আয়ু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সকল সত্তাকে নিয়ে। মানুষকে অন্নবস্ত্রবিদ্যা, আরোগ্য, শক্তি সাহস দিতে হবে এই সাধনায় যারা আত্ম-নিবেদন করেচে তারা কোনো দেবতাকে বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা মানুক্

বা না মানুক তারা সেই বেদ্য পুরুষকে জেনেচে, সেই মহান্ আত্মাকে, সেই বিশ্বকর্ম্মাকে, যাঁকে জান্‌লে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতরে থেকে বাঁধা অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁরা পূজাকে নিঃশেষিত করে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না, কেননা, তাঁরা মনের মানুষকে দেখেচেন মনের মধ্যে, মানুষের মধ্যে নিত্যকালের বেদীতে। দেশ বিদেশের সেই সব নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্ম্মভাই বলেই জানি। সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাঁদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তাঁরা যে দেশে থাকেন সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক্ এই আমার কামনা। তোমার চিঠিতে বারবার তুমি লিখেচ, নিজের দেশের কাছ থেকেই নিতে হবে। সত্য কথা, কিন্তু নিজের দেশ সকল দেশেই আছে, অন্য দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সকল দেশের— যদি অভিমানে বা অশক্তিতে তা না নিই তবে নিজের সম্পত্তিকে অস্বীকার করা হয়,— বিশ্বমানবের বেদীতে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, জ্ঞানের প্রেমের কর্ম্মের, তাতে সকল মানুষেরই ভোগের অধিকার,— তাকে নিয়েও যদি জাত মান্‌তে হয় তবে সঙ্কীর্ণভাবে হিঁদু হয়েই মরব মানুষ হয়ে বাঁচব না। যদি বলো নকল, তা নিজের দেশের নকলও নকল, পরের দেশের নকলও নকল— যে কর্ম্ম খাঁটি তা নকল নয়, যা মেকি তাই নকল, তার উপর স্বদেশেরই ছাপ থাক্ আর বিদেশের।

তোমাকে সম্প্রতি আমার লেখা যে বই পাঠিয়েছি তার মধ্যে আমার বিশেষ কোনো উপদেশ আছে বলেই তোমাকে পাঠিয়েছি

তা নয়— মনে করেছিলুম এই বইগুলি সম্ভবত তোমার কাছে নেই। এগুলি সাহিত্যের বই, এদের মূল্য ভাবরসের। আমার যে সব বইয়ে সমাজ ধর্ম্ম স্বদেশ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করেচি সে তোমাকে দিই নি, সেগুলোতে মতামতের তর্ক বিতর্ক। ইচ্ছা কর পাঠিয়ে দিতে পারি। ১লা জুলাই পাহাড় থেকে নামব চার পাঁচ দিন কলকাতায় থাকব— তার পর শান্তিনিকেতন। ইতি ৮ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২২

২৪ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

আমের প্রতি আমার প্রবল লোভ। তোমাদের উত্তর বঙ্গের চাপড় ঘণ্ট এবং বেতের শুক্তনি আমার রুচির পক্ষে বেশি তীব্র; তাদের সম্বন্ধে আমার রসনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু নাম শুনলে গুরুমশায়ের পাঠশালা মনে পড়ে। যাই হোক এই ফলের অর্ঘ্যযোগে তোমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেবা আমাকে আনন্দ দিয়েচে। এই পর্য্যন্ত যেই লিখেচি সেই মুহূর্ত্তেই আমার সেবক তোমার দানের ডালি থেকে কয়েকটি ফল একটি পাত্রে সাজিয়ে আমার সামনে ধরল। আমার মন সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েচে। ফল ভোগ সমাধা হোলো

আমার। কিন্তু অবকাশ নেই। আজ সার জগদীশচন্দ্র মধ্যাহ্ন-ভোজনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন। কোথাও বেরই নে, এ রকম ভোজেও আমার রুচি নেই, কিন্তু জগদীশের আহ্বান এড়াতে পারিনে। সাজসজ্জা করে বেরতে হবে। এদিকে অম্বুবাচীর আকাশ অম্বুবাচনে মুখর হয়ে উঠেচে। কিন্তু গিরিরাজের প্রকাশ বাষ্পে আচ্ছন্ন।

চিঠির মধ্য দিয়ে তোমার লেখা যতই পড়ি যেমন আনন্দিত ও বিস্মিত হই তেমনি মনে বেদনাও বোধ করি। তোমার মধ্যে যে সংরাগ যে আবেগ যে প্রবল প্রকাশের শক্তি তা প্রতিহত হয়ে তোমাকে পীড়িত করচে। বিধাতা তোমাকে শক্তি দিয়েছেন অথচ ক্ষেত্র দেন নি এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কিছু হতে পারে না।

আজ আর সময় নেই। ইতি ৯ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৩

২১ জুন ১৯৩১

ওঁ দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যে মত, চিন্তাপ্রণালী দিয়ে তার সঙ্গে তোমার হয় তো মিল হবে না, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে মিল হবে। তোমার হৃদয় যে গন্ধে আনন্দ পেল, হয় তো ঠিক জানল না সে গন্ধ রজনীগন্ধার বন থেকে আসচে, কিন্তু আনন্দটি সত্য। যদি ঐখানেই শেষ হোত তাহলে কথা ছিল না, আনন্দ যদি আমার

নিজের মধ্যেই এসে অবসান হোত তাহলে চুকে যেত। ওকে যে আবার কোনো একটা আকারে ফিরিয়ে দিতে হয়, পূজায়, সেবায়। কিন্তু ঠিকানা ভুল হলে আপ্‌শোষের কথা। আনন্দ যখন পাই তখন সেটা কোথা থেকে পাই স্পষ্ট নাই বা জানলুম, পেলেই হোলো। কিন্তু সেবা যখন দিই তখন কোথায় গেল না জানলে লোকসান। পোষ্ট্‌বাক্সে চিঠি ফেলে দিলুম সেটা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছল এটা কি সেই রকম ব্যাপার? ঠাকুরকে কাপড় পরালুম, সে কাপড় কি পৌঁছবে বস্ত্রহীনের কাছে, ঠাকুরকে স্নান করালুম সেই স্নানের জল কি পৌঁছবে যে-মানুষ জলের অভাবে তৃষিত তাপিত? তা যদি না হোল তাহলে এ সেবা কোন্ কাজে লাগ্‌ল? কেবল নিজেকে ভোলাবার কাজে? নিজের ছেলেকে যখন কাপড় পরাই তখন তার মধ্যে দুটো কথা থাকে, এক হচ্চে, সে কাপড় যথার্থই ছেলের প্রয়োজনের কাপড়, দুই হচ্চে ছেলের প্রতি আমার স্নেহ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করে নিজেকে সার্থক করে। খেলার সামগ্রীকে যখন কাপড় পরাই তখন কেবলমাত্র আমার তৃপ্তিই হোলো, বাকিটুকু ব্যর্থ। তুমি লিখেচ ঠাকুরের সেবা এবং জীবের সেবা দুইই আমাদের পূজার অঙ্গ কিন্তু দুর্ম্মতিবশত, যে-সেবাটা জগতের দুঃখনিবারণের জন্য সত্যকার কাজে লাগে বর্ত্তমান কালে সেইটেকে আমরা উপেক্ষা করেছি। ভালো করে ভেবে দেখো কালক্রমে এ মোহ এলো কেন? তার কারণ, এই বিশ্বাস মনে আছে যে ঠাকুরকে অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে একটা সত্যকার কাজ করা হোলো। তা ছাড়া ঠাকুরের স্থান সর্ব্বাগ্রে, জীবের স্থান

তার পরে, অতএব বড়ো কর্ত্তব্যটাকে সস্তায় সেরে বড়ো পুণ্যটা লাভ করা হয়ে গেলে বাকিটা বাদ দিতে ভয় হয় না, দুঃখ হয় না— বিশেষত বাকিটাই যেখানে দুষ্কর। জাতকুল দেখে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা সহজ, লোকে তাই করে,— সে ভক্তি অধিকাংশ স্থলেই অস্থানে পড়ে' নিষ্ফল হয় ; যথার্থ ব্রহ্মণ্যগুণে যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যে জাতেরই হোন্, তাঁকে ভক্তির দ্বারা ভক্তির সত্যফল পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ নয় এই জন্যই অস্থানে ভক্তির দ্বারা কর্ত্তব্যপালনের তৃপ্তিভোগ করা প্রচলিত হয়েচে। কালের ধর্ম্ম বলে' কোনো পদার্থ নেই, মানবচরিত্রের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার ব্যবস্থা যদি থাকে তবে সেটাকে ঠেকানো যায় না। আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই মানুষ বঞ্চিত উপেক্ষিত, মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য যদি বা শাস্ত্রের শ্লোকে আছে আচারে নেই ; তার প্রধান কারণ, ধর্ম্মসাধনায় মানুষ গৌণ। শস্তায় পাপমোচন ও পুণ্যফল পাবার হাজার হাজার কৃত্রিম উপায় যে দেশের পঞ্জিকায় ও ভাটপাড়ার বিধানে অজস্র মেলে সে দেশে বীর্য্যসাধ্য সত্যসাধ্য ত্যাগসাধ্য বুদ্ধিসাধ্য ধর্ম্মসাধনা বিকৃত না হয়ে থাকতেই পারে না। যদি গঙ্গাস্নান করলেই, যদি বিশেষ তিথিতে যে-কোনো ব্রাহ্মণকে খাওয়ালেই পাপ যায় তাহলে সযত্নে আত্মসম্বরণপূর্ব্বক পাপ না করাটা স্বভাবতই পিছিয়ে পড়ে। যেটা অন্তরের জিনিষ, যেটা চৈতন্যের জিনিষ সেটাকে জড়ের অনুগত করে' যদি নিয়ত তার অসম্মান করা হয় তবে আমাদের অন্তরপ্রকৃতি জড়ত্বে ভারগ্রস্ত হতে বাধ্য। দেবপ্রতিমার কাছে পাঁঠা বলিদানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

যখন করি তখন বলে থাকি পাঁঠাটা প্রতীকমাত্র আসল জিনিষটা হচ্চে মনের পাপ। কিন্তু ব্যাখ্যাটা মুখের কথা, কর্ম্মটাই বাস্তব, তাই পাপটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায় বরঞ্চ কিছু বেড়ে ওঠে মাঝের থেকে হতভাগা প্রতীকটা পায় দুঃখ। প্রতীকের উপর দিয়েই যত ফাঁকি চালিয়ে দিয়ে মানুষ আপন বুদ্ধিকে আপন মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করে, আপন সাধনাকে দুর্ব্বল ও লঘু করে দেয়। পুনশ্চ ব্যাখ্যা করবার সময় বলা হয়, যারা অজ্ঞান তাদের পক্ষেই এই বিধি। কিন্তু যারা অজ্ঞান তাদের অজ্ঞানকেই প্রশ্রয় দিয়ে চিরস্থায়ী করার দ্বারাই মুক্তির পন্থা সুগম করা হয় এ কথা মানতেই পারি নে। চিরজীবন পাঁঠাবলি দিয়ে এবং বলির সংখ্যা ভীষণভাবে বাড়িয়ে তোলার রক্তসিক্ত পথ দিয়ে কয়জন পূজক অবশেষে বাহিরের ঐ পাঁঠা থেকে অন্তরের পাপের ঠিকানায় পৌঁছেছে? যারা জ্ঞানী তাদের তো কোনো ভাবনাই নেই, তারা সকল ক্ষেত্রেই স্বতই ঠিক পথ বেয়ে চলে, যারা অজ্ঞান তাদের মুগ্ধ করে রাখলে মোহের অন্ত তারা পাবে না। এই কারণেই এ দেশে বহুযুগ থেকেই পুণ্যলুব্ধ মানুষ পাণ্ডার পায়ে মোহর ঢেলে আসচে, দেশের লোকের গভীর দুঃখ যেখানে সেখানকার জন্যে, না মন, না ধন কিছুই রইল বাকি। এ সম্বন্ধে দোষ দেবার বেলা আমরা আর এক প্রতীককে পাকড়াও করেছি, সে হচ্চে ঐ বিদেশী। সন্দেহ নেই বিদেশীর হাত দিয়ে মার খেয়ে থাকি কিন্তু সেই বিদেশীকে দিয়ে আমাদেরকে আঘাত করাচ্চে কে? আমাদের ভিতরকার সেই পাপ সেই কলি যে চিরদিন দেশের মানুষকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করে এসেচে—

তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার মতো কৌতূহলও যার নেই। যে মারের জমি বহুকাল থেকে আমরা নিজের হাতে তৈরি করেচি সেইখানেই আজ শত শতাব্দীর বেশি কাল ধরে বিদেশী মারের ফসল বুনে আসচে। আমাদের ধর্ম্মকে যদি সত্য করতে পারতুম, পূজার মধ্যে যথার্থ বীর্য্য, সেবার মধ্যে যথার্থ ত্যাগ থাকত, আমাদের সাধনা যদি যথার্থ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষকে সম্পূর্ণ আত্মীয়তার সঙ্গে স্বীকার করতে পারত তাহলে কখনোই দেশকে এত যুগ ধরে এত দৈন্য এত অপমান সইতে হত না, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত দুর্ভর অজ্ঞানের চাপে সমস্ত দেশের লোক এমন অসহায় ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে মরত না।

তুমি মনে কোরো না, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মানুষ আমার সাধনার লক্ষ্য। চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আপনার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি— নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও স্বার্থকে ডুবিয়ে দিতে চাই তাঁর মধ্যে, অনুভব করতে চাই, আমার মধ্যে সত্য যা কিছু, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোটো আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়ো আমি, মহান্ আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি। সেই উপলব্ধির যোগে আমার পূজা আমার সেবা সত্য হয়, আত্মাভিমানের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়। কর্ম্মই বন্ধন হয়ে ওঠে এই উপলব্ধির সঙ্গে যদি যুক্ত না হয়। য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের

কর্ম্মকে মহৎ করে তোলেন,— তাঁরা দূর কালের জন্যে প্রাণপণ করেন, সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত। যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারা জীবন অত্যন্ত শুচি হয়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হয়ে রইলেন, তাঁরা তো নিজেরই পূজা করলেন— তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রসসম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর মুক্তি বলে যদি কিছু তাঁরা পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানির কাগজ। তাঁদের দেবতা রইলেন কোথায়, পেলেন কি, কেবল চাল কলা, শাঁক ঘণ্টা, ফুল পাতা, ধূপ ধুনো ?

আমার কথা ব্রাহ্মসমাজের কথা নয়, কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়, য়ুরোপ থেকে ধার-করা বুলি নয়। য়ুরোপকে আমার কথা শোনাই, বোঝে না ; নিজের দেশ আরো কম বোঝে। অতএব আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না। আমি যাঁকে পাবার প্রয়াস করি সেই মনের মানুষ সকল দেশের সকল মানুষের মনের মানুষ, তিনি স্বদেশ স্বজাতির উপরে। আমার এই অপরাধে যদি আমি স্বদেশের লোকের অস্পৃশ্য, সনাতনীদের চক্ষুশূল হই তবে এই আঘাত আমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

১লা জুলাই বুধবারে এখান থেকে ছেড়ে বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় পৌঁছব। তুমি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে আমাদের বাড়িতে এলে কোনো বিঘ্ন হবে না। চিঠি লিখে যদি জানাও কোন্‌দিন কোন্‌ সময় আসতে পারো তাহলে যাতে তোমার কোনো

সঙ্কোচের কারণ না হয় সেই রকম ব্যবস্থা করব। নিজেকে আত্মীয়দের কাছে বিপন্ন করে নিজের দুঃসাধ্য কিছু চেষ্টা কোরো না, আমার সঙ্গে পরিচয় তোমার দুঃখ বা সঙ্কটের কারণ হ'লে তাতে আমি বেদনা বোধ করব।— আমি ধর্ম্ম কাকে বলি তার ব্যাখ্যা তোমাকে শোনাই— কারণ সত্য আলোচনাও ধর্ম্ম— কখনো ভেবো না, মিশনরির মতো তোমাকে দলে টানবার লোভ আমার আছে। মনের কথা ব্যক্ত করাই আমার স্বভাব, দল বাঁধা আমার স্বভাবের বিরুদ্ধ। ইতি ১২ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৪

২৮ জুন ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এক এক দিন তোমাকে চিঠি লেখার পর আমার মনে অত্যন্ত অনুতাপ বোধ হয়। যেখানে তোমার সব চেয়ে ব্যথা বাজে সেইখানে আমি তোমাকে বারে বারে আঘাত দিই। অথচ কখনোই সেটা আমি ইচ্ছা করে করিনে। তোমার চিঠিতে যে-ঠাকুরের কথা তুমি এমন গভীর আবেগের সঙ্গে বলো তাঁকে আমি চিনি— তোমার উপলব্ধির সঙ্গে আমার মিল আছে— বোধ হয় সেই জন্যেই অনেকটা যেন অজ্ঞাতসারেই তোমার মনকে নাড়া না দিয়ে থাকতে পারি নে। আমার ঠাকুরকে আমি সেই মন্দিরে দেখতে চাই যেখানে কোনো বানানো

লোকাচারের দেয়াল তুলে কোনো সম্প্রদায় তাঁকে সঙ্কীর্ণভাবে আত্মসাৎ করবার উদ্যোগ না করে— যেখানে সবাই অনায়াসে মিলতে পারে, তাঁকে পেতে পারে, বিশেষ দেশের পণ্ডিতের কাছে বিশেষ ভাষার শাস্ত্র ঘেঁটে বিশেষ রীতির পূজাপদ্ধতির মধ্যে মন আটকা না পড়ে। তুমি যাঁকে ভালোবাসো আমি তাঁকেই ভালোবাসি, সেইজন্যেই আমি তাঁর দ্বার অবারিত করতে ইচ্ছা করি, তাঁর ভালোবাসায় সকল দেশের সকল জাতকেই আপন করে দেখতে চাই। য়ুরোপে যে অংশে তিনি সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছেন সেখানে আমি আনন্দ করি, আমাদের দেশে যে অংশে তিনি মুগ্ধ আচারে অসত্যে আচ্ছন্ন সেখানে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত। আমি জানি তাঁকে অবগুণ্ঠিত করার অপরাধেই আমার দেশ এতদিন ধরে ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে বঞ্চিত। তাঁর মধ্যে মানুষকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে আমার দেশ পদে পদে বাধা দিয়েছে— দেশের অপমানিত মানুষ তাই ক্ষুদ্র হয়েচে দেশ তাই মুক্তি পায় নি। এই জন্যেই থাকতে পারি নে— রুদ্ধদ্বার মুক্ত করতে কঠোর আঘাত করি, নিজেও আহত হই। যিনি আমার সব চেয়ে সম্মানিত তাঁর জন্যেই দেশের লোকের কাছে অপমান স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েচি, তাঁকে প্রতারণা করে দেশের লোকের আদর আমি চাইনে। তিনি কে?

জানি না কে, চিনি নাই তা'রে,—
শুধু এইটুকু জানি— তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে

অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জ্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি', মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তা'রে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন ;
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্যউপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি'
রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণকন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
মাধুর্য্যপ্রতিমা। তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,—
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,

তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়ে বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক। তাহারে অন্তরে রাখি'
[জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি', বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,]
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি'
সুখী করি সর্ব্বজনে।

খুব সম্ভব এ কবিতা তুমি পূর্ব্বেই পড়েচ তবু আমার ঠাকুরের ধ্যান তোমার কাছে রাখলুম সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মাঝখানে, সকল বীরের সকল তপস্যায়, সকল প্রেমিকের সকল ত্যাগে। এসব লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়, তার গভীরতম মর্ম্মস্থানে যে কবি আছে তারই, সে কবির আসন সকল দেশেই, সকল মানুষেরই অন্তরে— (য়ুরোপেও)।

যাই হোক তুমি যেখানে আশ্রয় পেয়েছ সেইখানেই উদার ভাবে মুক্তভাবে বিরাজ করো, সেইখানেই তোমার চিত্তের বাতায়ন খুলে যাক যেখান থেকে তুমি সর্ব্বকালের সর্ব্বজনের মনের মানুষকে আপন বলে দেখতে পাও, যিনি য়ুরোপেরও, যিনি অস্পৃশ্য নমশূদ্রেরও, যিনি পণ্ডিত পুরোহিতের বেড়া দেওয়া

কৃত্রিম শুচিতার নিষেধ লঙ্ঘন করে তাঁরই বুকে আসবার জন্যে দিকে দিকে আহ্বান পাঠিয়ে দিয়েচেন।

তুমি যখন খুসি আমাকে লিখো, যদি বাধা থাকে তো লিখো না— যদি দেখা করতে চাও কোরো, যদি বিঘ্ন বা দুঃখের কারণ থাকে তবে চেষ্টা কোরো না। নিশ্চয় জেনো তোমাকে আমি নিকটের বলেই জেনেছি দূরে থেকে— তুমি আনন্দিত হও শান্তি লাভ করো সকল ব্যাঘাত সকল অভাবের মধ্যেও। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে তোমাকে চিঠি লেখার অবকাশ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হবে— তাতে ক্ষোভ কোরো না। ইতি ১৩ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৫

১ জুলাই ১৯৩১

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

আমার যাওয়া পিছিয়ে গেল।

নীচে এখনো যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ে নি ও বৃষ্টি নামে নি বলে আমার আত্মীয়েরা আমাকে নিষেধ করলেন। অথচ আমার মনটা নেমেচে শান্তিনিকেতনের দিকে। চেষ্টা করব দু তিন দিনের মধ্যে দৌড় দিতে। ইতি ১৬ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৬

৬ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

হিমালয়-শিখরে অধিষ্ঠিত নির্ম্মল অবকাশ থেকে নেমে এসেছি সহরে— এখানে নিরন্তর লোকের ভিড়, কাজের ভিড় —চিত্তবিক্ষেপের হাওয়া এলোমেলো হয়ে বইচে চার দিকে। এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে— অতএব কাজ সারা হলেই যত শীঘ্র পারি পালাব শান্তিনিকেতনে— তার পূর্ব্বে হয় তো এক আধ দিন বরানগরে শশিভূষণ ভিলায় অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। এখন থেকে আমার পত্র শীতকালের রিক্ত অরণ্যের মতো বিরল হবে। এখন থেকে নানা লোকের নানা দাবী মেটাবার কাজে আমার সময়টাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। কাল এসেচি— কিন্তু সময় পাই নি— আজও সময়ের দৈন্য ঘোচে নি। ইতি ২১ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৭

৭ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাহিরের বাধাকে বড়ো কোরো না। অন্তরে তুমি যাঁকে গ্রহণ করেচ তাঁরি ভাবরূপ যদি আমার মধ্যে কল্পিত করে থাক তবে কিছুতেই ক্ষতি হবে না।

দেশের লোকের দ্বারে আমি অতিথি হয়েছিলুম, দ্বার ভালো করে খোলা হয় নি।— যদি সত্যের দূত হয়ে কোনো অমৃতবাণী নিয়ে এসে থাকি তবে দ্বারের বাইরে রেখেই বিদায় গ্রহণ করব। গৃহীরা যদি বা উপেক্ষা করে পথিকেরা তা দেশে দেশে নিয়ে যাবে, এমন আশ্বাস পেয়েছি। মানুষের কাছ থেকে মমত্ব মানুষ আকাঙ্ক্ষা না করে থাকতে পারে না— অতএব তোমরা যারা আমাকে প্রসন্ন মনের অর্ঘ্য দিতে পেরেচ তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অন্তরতম শান্তি ও সার্থকতা তোমার জীবনকে পূর্ণ করুক এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২২ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৮

১৫ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন তোমার চিঠি না পেয়ে ভয় হয়েছিল যে হয়ত বা আমার সঙ্গে দেখা করার দুঃসাহসিকতা তোমার অপরাধ বলে গণ্য হয়েচে এবং সে জন্যে তোমাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। আমি চিঠি লিখে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকে আরও গুরুতর করতে সঙ্কোচ বোধ করছিলুম। আজ তোমার চিঠি পেয়ে মন নিরুদ্বিগ্ন হল।

"লেখন" নামক বইটা নিঃশেষিত। সংগ্রহ করে তোমার ছেলেকে দেব প্রতিশ্রুত ছিলুম। একখানা জীর্ণ মলিন বই পেয়েছি। অগত্যা এইটেই পাঠাতে হবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তোমার চিঠি-পত্র থেকে তোমার ছেলের নাম পাইনি। নামটা জানিয়ে দিয়ো। আমি আগামী কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে কলকাতায় যাব—অপরাহ্ণে। তার পরদিন শুক্রবারে যাত্রা করব ভূপাল রাজভবনে। তার পরে কবে ফিরব নিশ্চিত জানিনে। বইখানি কলকাতায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি যদি তোমার ছেলে সেখানি উদ্ধার কববার জন্যে দূত পাঠায় তাহলে সহজ হয়।

সেদিন তোমাকে দেখে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল তোমার মুখশ্রী, ভক্তিতে সরস মধুর তোমার বাণী আমার মনে রইল। আমার যেটুকু শক্তি আছে সেই শক্তিতে তোমাকে কিছু যদি দিতে পারতুম খুসি হতুম কিন্তু তেমন গভীর

অবকাশ পাবার সম্ভাবনা নেই, তাই কেবল চিঠিতে তর্কই করেচি। সে তর্ক যে পরিমাণে আঘাত করে সে পরিমাণে তৃপ্তি দেয় না। লেখার ভাষায় বাদপ্রতিবাদগুলো কঠোর হয়ে পড়ে— বাক্যের পশ্চাতে যে মন থাকে সে মনের সবটা প্রকাশ পায় না। ইতি ৩০ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদা

২৯

[ভূপাল] ২০ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

পয়লা নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে তোমাকে যে চিঠি লিখে এসেচি সেটা তুমি পাও নি বলে আশঙ্কা করচি। না যদি পেয়ে থাক সেটা আমার ত্রুটিবশত হতে পারে। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, তোমার ঠিকানায় হেমন্তবালা না লিখে হেমন্তকুমারী লিখেছিলুম —এটাকে অপরিশোধনীয় ভ্রম বলা যায় না তবু কর্ম্মচারীদের পক্ষে যথেষ্ট বাধাজনক বলে ঠেকতে পারে। তোমার শেষ চিঠিখানি শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে রেলগাড়িতে বর্দ্ধমানে আমার হস্তগত হয়েচে। রাজভবনে আছি, অপরিচিত ঘর, অনভ্যস্ত আসবাব, সময় যে নেই তা নয় কিন্তু সে যেন অন্যের দেওয়া মোটর গাড়ির মতো, কতটা তাকে খাটাতে পারব, কখন্ বল্‌তে হবে, বাস্ আর নয় ঠিক জানি নে— মন তাই আপনার

গাঁঠরি খুলে গুছিয়ে গাছিয়ে বসতে পারে নি। অতএব সংক্ষেপে সারতে হবে। কেবল তোমার দুই একটা কথার উত্তর দিয়ে ছুটি নেব।

জিজ্ঞাসা করেচ তোমাকে যে চিঠি লিখেচি তার কোনো কোনো অংশ কোনো পত্রিকায় ছাপতে হবে কি না। পত্রিকায় আমার চিঠি প্রায় ছাপা হয়ে থাকে। যাঁদের আমি লিখেচি সেটা তাঁদের ইচ্ছায় ঘটে। বোধ করি সম্পাদকেরা সংবাদ পেলে সংগ্রহের চেষ্টা করে। চিঠির উপরে লেখকের স্বত্ব থাকে না। সাধারণ পাঠকেরও দাবী নেই। সর্ব্বজনের পাঠযোগ্য যদি কিছু থাকে তবে কোনো এক সময়ে সেটা সর্ব্বজনের ভোজে গিয়ে পোঁছয়— কিন্তু তার পরিবেষণকর্ত্তা আমি নই।

যাঁর ধ্যান আমার চিত্তের অবলম্বন শাস্ত্রমতে তাঁকে কি সংজ্ঞা দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করেচ। সহজে বোঝাতে পারব না, উপলব্ধির জিনিষকে ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট করা যায় না। তোমার প্রশ্ন এই তিনি কি সর্ব্বমানবের সমষ্টি। সমষ্টি কথাটায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। এক বস্তা আলুকে আলুর সমষ্টি যদি বল তবে সে হল আর এক কথা। মানুষের সজীব দেহ লক্ষকোটি জীবকোষের সমষ্টি, কিন্তু সমগ্র মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আত্মানুভূতিতে জীবকোষসমষ্টির চেয়ে অসীমগুণে বড়। ব্যক্তিগত মানব মহামানব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারি মধ্যেই তার জন্ম ও বিলয় কিন্তু তাই বলে সে তাঁর সমান হতে পারে না। ব্যক্তিগত মানব মহামানবকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়, মহিমালাভ করে যখন সে নিজের ভোগ নিজের স্বার্থকে বিস্মৃত

হয়, যখন তার কর্ম্ম তার চিন্তা মরণধর্ম্মী জীবলীলাকে পেরিয়ে যায়, যখন তার ত্যাগ তার প্রয়াস সুদূর দেশ সুদূর কালকে আশ্রয় করে, তার আত্মীয়তার বোধ সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে খণ্ডিত হয়ে থাকে না। এই বোধের দ্বারা আমরা এমন একটি সত্তাকে অন্তরতমরূপে অনুভব করি যা আমার ব্যক্তিগত পরিধিকে উত্তীর্ণ করে পরিব্যাপ্ত। তখন সেই মহাপ্রাণের জন্যে মহাত্মার জন্যে নিজের প্রাণ ও আত্মসুখকে আনন্দে নিবেদন করতে পারি। অর্থাৎ তখন আমি যে জীবনে জীবিত সে জীবন আমার আয়ুর দ্বারা পরিমিত নয়। এই জীবন কার? সেই পুরুষের, যিনি সকলের মধ্যে ও সকলকে অতিক্রম করে, উপনিষদ যাঁর কথা বলেছেন "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"। কেবলমাত্র জপতপ পূজার্চ্চনা করে তাঁর উপলব্ধি নয়, মানুষের যে-কোনো প্রকাশে মহিমা আছে, বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে; অর্থাৎ যাতে সে এমন কিছুকে প্রকাশ করে যার মধ্যে পূর্ণতার সাধনা আছে। এ সমস্তই মানুষের সম্পদ, ক্ষণজীবী পশুমানুষের নয়, কিন্তু সেই চিরমানবের,— ইতিহাস যাঁর মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই বর্ব্বরতার প্রাদেশিকতার সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন কাটিয়ে সর্ব্বজনীন সত্যরূপকে উদ্ঘাটিত করচে। সকল ধর্ম্মেই যাঁকে সর্ব্বোচ্চ বলে ঘোষণা করে তাঁর মধ্যে মানবধর্ম্মেরই পূর্ণতা,— মানুষ যা-কিছুকে কল্যাণের মহৎ আদর্শ বলে মানে তারই উৎস যাঁর মধ্যে। নক্ষত্রলোকে মানবের রূপ নেই মানবের গুণ নেই, সেখানে কেবল বিশ্বশক্তির নৈর্ব্যক্তিক বিকাশ, বিজ্ঞান তাকে

সন্ধান করে, কিন্তু মানুষের প্রেম ভক্তির স্থান সেখানে নেই। মহাপুরুষেরা সেই নিত্যমানবকেই একান্ত আনন্দের সঙ্গেই অন্তরে দেখেচেন, কিন্তু বারে বারে তাঁকে নানা নামে, নানা আখ্যানে, নানা রূপ কল্পনায় দূরে ফেলা হয়েছে, এমন কি অনেক সময় মানুষ তাঁকে নিজের চেয়েও ছোট করেচে— এবং ভূমার সাধনাকে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ভোগবিলাসের সামগ্রী করে তুলেচে। তুমি প্রশ্ন করেচ বলেই এত কথা বল্‌লুম, নতুবা তর্ক করে তোমাকে পীড়া দিতে আমি ইচ্ছা করি নে। সত্য যদি নিতান্তই আত্মতৃপ্তির উপকরণমাত্র হোত তবে যে অভ্যাসের মধ্যে যে সুখ পায় তাই নিয়েই তাকে থাকতে বলা যেত। সত্যের সঙ্গে ব্যবহারে তৃপ্তি গৌণ, মুক্তি মুখ্য— যে ক্ষুদ্রতার আবরণ থেকে মুক্তি হলে নিজেদের স্পষ্ট করে জানি অমৃতস্য পুত্রাঃ সেই মুক্তি— তার সাধনায় দুঃখ আছে। আমরা দ্বিজ, একটা জন্ম পশুলোকে, আর একটা জন্ম মানবলোকে, এই দ্বিতীয় জন্মের জন্যেই প্রার্থনা করি অসতো মা সদ্‌গময়। ইতি ২০ জুলাই ১৯৩১

দাদা

৩০

২৬ জুলাই ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ভূপাল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেচি। ফেরবার জন্যে মনটা উৎসুক হয়ে ছিল। যদিও আমার নামের সঙ্গে বেমিল হয় তবু এ কথা মানতে হবে আমি বর্ষাঋতুর কবি। আমার মনের পেয়ালায় এই ঋতুর সাকি যে রস ঢেলে দেন তার নাম দেওয়া যেতে পারে কাদম্বরী। রাজপ্রাসাদে ছিলুম দুটো দিন মাত্র। আরো দুই এক জায়গায় যাবার সঙ্কল্প ছিল, আমার সৌভাগ্যক্রমে, যাঁদের লক্ষ্য করে যাওয়া, তাঁরা কেউ স্বস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। সেটা উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে ক্ষতিজনক কিন্তু মনের শান্তির পক্ষে অনুকূল।

আমার বর্ত্তমান ঠিকানাটা জানাবার জন্যেই লিখ্‌তে বসেচি। আর একটি কথা আছে— নিজের মনকে নিয়ে খুব বেশি টানাটানি কোরো না। অপরাধ হয়েছে বলে সর্ব্বদা কল্পনা করাটা কল্যাণকর নয়। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর বিরোধ করে চিত্তকে মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়া তার প্রতি অবিচার করা। বেশ সহজভাবে থাকতে চেষ্টা কর তাতে তোমার অন্তর্য্যামী প্রসন্নই হবেন। যে জিনিষটিকে আশ্রয় করলে তোমার তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হ'ত বলে নিজেকে দুঃখ দিচ্চ খুব সম্ভব সেটি তোমার স্থায়ী অবলম্বনের পক্ষে সঙ্কীর্ণ। তার প্রতি তোমার নিষ্ঠা সুদৃঢ় নয় বলে নিজের বুদ্ধিকে আজ নিন্দা করচ,

তাই বলে নিজের বুদ্ধিকে খর্ব্ব করে যেখানে তোমাকে ধরে না সেইখানেই নিজেকে কোনোমতেই ধরানোকে তুমি অবশ্য-কর্ত্তব্য মনে কোরো না। আমি যে গৃহে জন্মেচি সেখানকার ধর্ম্মেই দীক্ষা পেয়েছিলুম। সে ধর্ম্মও বিশুদ্ধ। কিন্তু আমার মন তারই মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনোমতেই রাজি ছিল না। তবু আমি এ নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে বেশ সহজভাবেই আপন প্রকৃতির পথে চলেছিলুম। সেই পথ ধরেই আজ আমি নিজের উপযোগী গম্যস্থানে পৌঁচেছি। এটাকে অপরাধ বলে মাথা খুঁড়ে মরি নে। দেবতা আমাদের সঙ্গে কেবলি লড়াই করবার জন্যেই লক্ষ্য করে আছেন এটা সত্য নয়, অতএব একাদশীর দিনে অনর্থক নিজেকে পীড়ন না করলে ভক্তবৎসলের নির্দ্দয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি হবে না এটা মনে করা তাঁর প্রতি অন্যায় অবিচার। তোমার পালে একদা আপনি বাতাস এসে লাগবে, যদি বিশ্বাস করে পালটা মেলে রাখ। অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে হাবুডুবু খেয়ে মলেই যে পারে পৌঁছন যায় তা নয়, তলায় যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

ছোট্ট চিঠি লিখ্‌ব মনে করেছিলুম, তর্ক করব না এও ছিল সঙ্কল্প, দুটোই লঙ্ঘন করলুম। কিন্তু তা নিয়ে পরিতাপ করব না। ইতি ১০ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩১

২৭ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার সাধনা সম্বন্ধে তোমার সুন্দর ভাষায় যা লিখেচ সেটি সত্য। মানবের পরিপূর্ণতার শাশ্বত আদর্শ শাশ্বত মানবের মধ্যে আছে,— যে অংশে সেই পরিপূর্ণতা আমরা লাভ করি সেই অংশে সেই পরিপূর্ণের সঙ্গে আমাদের মিলন হয়। সেই মিলনে এত গভীর আনন্দ যে তার জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে পারে। এমনি করেই যুগে যুগে কত সাধকের ত্যাগের উপরেই মানবসভ্যতা প্রশস্ততর প্রতিষ্ঠা লাভ করচে। পূর্ণ মানুষের ডাক না শুন্‌তে পেলে মানুষ বর্ব্বরতার অন্ধকূপে চিরদিনই পশুর মতো পড়ে থাকত। আজো অনেক বধির আছে, কিন্তু যাদের মর্ম্মের মধ্যে পূর্ণের বাণী প্রবেশ করে এমন অল্পসংখ্যক লোকও যদি থাকে তাহলেই যথেষ্ট। বস্তুত তারাই অতি কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেচে। আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের সমস্ত ইতিহাসই হচ্চে সেই অভিসার। নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার রাত্রের এই অভিসারে মানুষ বারেবারেই পথ হারিয়েছে, পিছিয়ে গেছে, কিন্তু এ কথাটা কখনোই সে ভুল্‌তে পারে নি যে তাকে চল্‌তেই হবে, যেখানে আছে সেইখানেই তার চরম আশ্রয় এমন কথা বল্‌লেই মানুষ মরে— এমন কি, যখন সে পিছিয়ে চলে তখনো চলার উপরে তার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

আমি যাকে মানুষের সাধনার বিষয় বলি তার একটা বিশেষ দিক হয় তো তোমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। মানুষের পূর্ণতা শতদল পদ্মের মতো, তার বিকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব করে' কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের প্রবল উৎকর্ষসাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ বলে আমি স্বীকার করি নে। অনেক সময় দেখা যায় দৃষ্টি যখন অন্ধ হয় তখন স্পর্শশক্তি অদ্ভুত রকমে বেড়ে যায়। কিন্তু তবুও বলতে হবে দৃষ্টি ও স্পর্শের যোগেই আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণ সার্থকতা। মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সঙ্কীর্ণ করে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দেব সেটাই সমগ্রকে পঙ্গু করবে। পৃথিবীতে যাঁরা বিজ্ঞানের সাধনা করেন তাঁরাও মোহমুক্তির দিকে মানুষের একটা জানলা খুলে দিচ্চেন। কিন্তু যদি তাঁরা বলেন অন্য জানলাগুলি বুজিয়ে দাও দেওয়াল গেঁথে, তাহলে সেই এক জানলার পথে বিজ্ঞানের অতি তীব্র উপলব্ধি জন্মাতে পারে তবু পূর্ণতার ঐশ্বর্য্যে মানুষ বঞ্চিত হবে। পেটুক বল্‌তে পারে জল খেয়ে কেন পেট ভরাব, জঠরের সমস্ত গহ্বর সন্দেশ দিয়ে ঠাসাই ভোজের চরম আনন্দ, তেমনি মাতাল বলে খাবার খেতে শক্তির যে অপচয় হয় সেটা বন্ধ করে একমাত্র মদ খেয়েই তৃপ্তির পূর্ণতা ঘটানো চাই। আপাতত যাই হোক্ পরিণামে উভয়েই বঞ্চিত হয়। সাধারণত যাকে আধ্যাত্মিক সাধন বলা হয় তাকে যখন আমরা লোভের সামগ্রী করে তুলি তখন আলো পাবার জন্যে একটি জানলা ছাড়া অন্য সব জানলায়

দেয়াল গাঁথবার উৎসাহ জাগে। এইরকম গুহাবাসের সন্ন্যাসকে আমি মানি নে ; গুহার বাইরের বিরাট জগৎকে আমি গুহার চেয়ে বেশি সত্য বলেই জানি। সেই জন্যেই, কোনো আধ্যাত্মিক নামধারী গুহার মধ্যে ঢুকলেই আমার পরমার্থ লাভ হবে এমন লোভ যদি কোনো খেয়ালে আমাকে পেয়ে বসে তবে ক্ষণকালের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে তার থেকে বেরিয়ে আসব সন্দেহ নেই। যদি বলো অনেকে ত নিজেকে অবরুদ্ধ করার সাধনায় শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে যায়। আমার উত্তর এই, মাড়োয়ারি মহাজন তো রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত আড়তের গদিতে রুদ্ধ থাকে, মুনফাও জমে। কোনো একটি জাতের মুনফাকেই একান্ত করে সেইটেকেই চরম লাভ বলা লোভের কথা। চলমান জগতে যা কিছু চল্‌চে সমস্তকেই অধিকার করে পূর্ণস্বরূপ আছেন অতএব, মা গৃধঃ, লোভ কোরো না —এই হোলো ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। পূর্ণকে উপলব্ধি করতে যদি চাই তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়-সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি। এই হোল আমার নিজের কথা। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান দর্শন লোকসেবা সব দিকেই নিজেকে মুক্তি দেওয়ার দ্বারাই পূর্ণকে উপলব্ধি করব— চিত্তে তাঁর বিচিত্র প্রকাশের পথকে সব জানলার যোগেই খুলে রেখে দেব তবেই আমার মনুষ্যত্ব সার্থক হবে। য়ুরোপের সাধকেরা যে মুক্তির পথে অসীম অধ্যবসায়ে মানুষের সহায়তা করচে তাকে আমি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেচি, আবার ভারতীয় সাধকেরা আপনার মধ্যে আত্মজ্যোতিদর্শনের যে সাধনাকে গ্রহণ

করেচেন তাকেও আমি প্রণাম করে মেনে নিই। এই উভয়ের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিয়ে যদি পংক্তিবিভাগ করি, এবং এক পাশ ঘেঁষে সমস্ত জীবন কেবল শুচিবায়ুর চর্চ্চা করি তাহলে কৃপণের গতি লাভ করব।

কিন্তু একটি কথা মনে রেখো, চতুষ্পথে আমার চলা; সম্প্রদায়ের দুর্গে রুদ্ধদ্বারের মধ্যে আমি বাঁচিনে। এই জন্যে যদিও আমি নিজের মত গোপন করিনে, তবু কাউকে ডাকা-ডাকি করে কোনোদিন বলিনে আমার মত গ্রহণ করো। তুমি নিজের পথে নিজের মতে চল্‌লে তোমার প্রতি আমার স্নেহ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে এমন শঙ্কা কোনোদিন কোরো না। স্বভাবতই তোমার চিত্তশক্তির একটি প্রসারতা আছে, এইরকম বেগবান চিত্তকে খোঁটায় বেঁধে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো সহজ নয়। তোমার কঠিন দুঃখ হচ্চে এই দ্বিধা নিয়ে। তোমার সংস্কার এই যে, চিত্তকে পীড়িত করে খর্ব্ব করে তাকে বিশ্বের অধিকার থেকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করে তবে সার্থকতা, অথচ তোমার প্রকৃতিতে যে বুদ্ধিশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য আছে, সে অবারিত আকাশে আলো চায় হাওয়া চায় গতি চায়। সেই চাওয়াটাকে তুমি অপরাধ বলে ভয় পাও। পাখীকে খাঁচায় বন্দী করে তাকে আকাশভীরু করে তোলা হয়েচে। কিন্তু এই আকাশ-ভীরুতা তার স্বভাব নয়, সে তার ডানা দেখেই টের পাওয়া যায়।

যাই হোক, আমাকে তোমার গুরু বলে গণ্য কোরো না, আপনার লোক বলেই জেনো। বাইরের দিক থেকে তোমার পরিচয় অল্পই পেয়েচি তবুও তোমাকে স্নেহ করা আমার পক্ষে

অত্যন্ত সহজ হয়েচে। তার কারণ তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে কোনোরকমের সংস্কারের বাধায় তাকে ছায়াবৃত করতে পারে নি, তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি সকল রকম বাধার মধ্যেও তোমাকে মুক্ত রেখেচে। আমার সম্বন্ধে কঠোর বিরুদ্ধতা থাকাই তোমার পক্ষে স্বভাবসঙ্গত ছিল, আমার দেশের লোকের অনেকেরই তাই আছে। কিন্তু অভ্যাসের আচারের মতের নানাপ্রকার বাধা সত্ত্বেও সে সমস্ত পার হয়েও তুমি আমার কাছে আসতে পেরেচ সে তোমার বুদ্ধির অসামান্য উদারতাবশত। প্রকৃত আত্মীয়তার মিলনক্ষেত্র এই উদারতায়, মতের মিল প্রভৃতিতে নয়। চিঠিতে তোমাদের সাধনার কথা তুমি যে রকম করে প্রকাশ করেচ তাতে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি,— তোমার নিজেকে সুনিপুণ ভাষায় সুস্পষ্ট করে আমার গোচর করতে পেরেচ। মানুষের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য সেইখানেই যেখানে সে আমাদের কাছে অস্পষ্ট। যে হয়েচে সুপ্রত্যক্ষ তাকে আমরা অন্তরের মধ্যে অনায়াসে গ্রহণ করি। তুমি যে পথেই চলো না কেন, সে পথ আমার নির্দ্দিষ্ট না হলেও আমি লেশমাত্র ক্ষোভ করব না এ কথা নিশ্চিত জেনো। কিন্তু সে পথ তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ না হয়, সে পথে তোমার সম্যক চরিতার্থতা ঘটে, তুমি শান্তি পাও এই আশা করি। আমাকে চিঠি লিখতে যদি তোমার বাধা ঘটে বা অবকাশ না পাও আমি কিছুই মনে করব না। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে সহজে নিজের জীবনকে গ্রন্থিমুক্ত করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হও এই ইচ্ছামাত্র আমার মনে রইল। ইতি ১১ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩২

৩১ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শেষ চিঠিতে তোমাকে কি লিখেছিলুম মনে নেই কিন্তু তোমার চিঠি থেকে বোধ হল তোমাকে ক্ষুব্ধ করেচে। তুমি নিশ্চয় জেনো তোমাকে কোনো বিশেষ পথে প্রবর্ত্তন করবার জন্যে আমার মনে একটুও তাগিদ নেই। সত্য বলে অন্তরে যা আমি উপলব্ধি করি তা আমি সকলকে বলিনে—এখানে সত্য বলচি তাকে যা সকল সত্যের গোড়ায়। আমার ভিতরকার দরজা যে চাবিতে খোলে, সে চাবি সকলের কুলুপে লাগবে না। তা ছাড়া গুরুর পদ আমার নয় সে আমি নিশ্চিত জানি। আমি অনুভব করি, আমি কথা কই এইটেই আমার স্বধর্ম্ম। তোমার চিঠিতে আমি কথা কয়ে গেছি সেটা শুনিয়েচে অনুশাসনের মতো। কিন্তু প্রকাশ করা যদিও আমার স্বভাবসঙ্গত, প্রচার করা একেবারেই নয়। যে উপলব্ধিতে তুমি গভীর আনন্দ পেয়েচ সে তোমার আপনারই জিনিষ। ধার করা জিনিষ নিয়ে তোমার চলবে না, এমন কি সে যদি দামী জিনিষ হয় তবুও না। প্রচার করতে যাদের অত্যন্ত উৎসাহ তারা এই কথাটা বুঝতে পারে না, এই জন্যে তারা সংসারে কেবলি বাহ্যিকতার আবর্জ্জনা জমায়। সত্য অন্তরের হলে তবেই খাটি হয় তবেই তাতে শান্তি তাতে স্বাস্থ্য তাতে সৌন্দর্য্য তাতে আনন্দ, অন্ন পাকযন্ত্রে এসে তবেই প্রাণের সামগ্রী হয়ে

ওঠে, তাকে গায়ে মাথায় মাখলেই সেটা অশুচি হয়ে পড়ে। যারা প্রচারে উৎসাহী তারা কোনোমতে ভিতরের জিনিষকে বাইরে চাপিয়ে দিয়ে খুসি হয়— এই জন্যে তারা দল গড়ে তোলে মন গড়ে তোলে না। যারা স্বভাবতই দলচর লোক তারাও দলের চাপরাস পরে সগর্ব্বে খুসি হয়ে বেড়ায়। সকল ধর্ম্মসমাজেই দলের অত্যাচার আছে। কেননা, অধিকাংশ লোকেরই অন্তরের আবরণ শেষ পর্য্যন্ত খোলে না। এই কারণে তারা বাইরের দিক থেকে চালিত হবার ঔৎসুক্যে বাহ্যিকতাকেই চিরদিনের মতো আঁকড়ে ধরে এবং তারাই এই বাহ্যিকতার জবরদস্তি নিয়ে অন্যের উপর অত্যাচার করতে ছাড়ে না। ধর্ম্মের নামে যত উন্মত্ততা যত রক্তপাত সে তো এই বাহ্যিককে নিয়েই। ধর্ম্মের অভিমান এই নিয়েই, মূঢ়তা এইখানে।

তোমার চিঠি পড়ে এ কথা বুঝি যে, একটি আন্তরিক উপলব্ধি সোনার কাঠির মতো তোমার চিত্তকে জাগিয়েছে। সব সময়েই তার স্পর্শ পাও বা না পাও একবার পেলেই তার সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। এর উপরে বাইরে থেকে তর্ক একেবারেই মিথ্যে। তুমি প্রদীপ দেখেচ কি না তা নিয়ে নানা সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা করা চলে কিন্তু যখন তুমি বলো আমি আলো দেখলুম তখন সেই আলোর সাক্ষী তুমি নিজেই। সেই আলো আমিও যদি দেখে থাকি তাহলে তোমার সঙ্গে প্রদীপের ঝগড়াটা থামিয়ে দেওয়াই ভালো, কেননা সেটা সামান্য কথা।

একটা জায়গায় আমাকে তুমি সম্পূর্ণ বোঝনি। বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করেচ পাছে আমার কথা মানতে পারচ না বলে

আমি তোমার উপর রাগ করি। এই আশ্রমেই এমন অনেক লোক আছে যারা আমাকে মানে না, [নানা বিষয়ে] যারা আমার বিরুদ্ধ। আমি তাদের বর্জ্জন করিনি, তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সহজ। আমার এই স্বস্থানেও স্টিম রোলার চালিয়ে মতভেদের পার্থক্যকে গুঁড়িয়ে একাকার করে দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নিজের কথা তুমি যা বল তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি তাতে আমি আনন্দও পাই, কিন্তু তাই বলে সব সুদ্ধ তাকে গ্রহণ করতে গেলে আমার পক্ষে সেটা একেবারেই বেমানান হবে। বাহিরের জিনিষ সীমাবদ্ধ, তোমার সীমায় আমার সীমায় মিল হতেই পারে না— অন্তরের জিনিষ সীমার অতীত, সেখানে মিলতে কোথাও বাধা নেই। ইতি ১৫ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩৩

৩১ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অন্তরে বাহিরে কোনো বাধা থাকলে কিছুতেই নিজের প্রতি তুমি জবরদস্তি কোরো না। চিঠি না লিখতে যদি পার আমি তোমাকে ভুল বুঝব না। আমি জানি তুমি আমাকে কখনই বিরুদ্ধভাবে বা ঔদাসীন্যে দেখতে পার না। তুমিও আমার আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য পেয়েছ। আমি নানা চিন্তায় নানা কর্ম্মে

প্রবৃত্ত, তা ছাড়া অবকাশ পেলেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত চেষ্টা চিন্তাকে নিজের মধ্যে প্রতিসংহরণ করে পূর্ণতার আনন্দ পাবার চেষ্টাও ভুলি নে। বাহিরের কোনো ক্ষতিকে আমি অন্তরে গ্রহণ সহজে করি নে। সংসারে অনেক পেয়েছি সংসারেই তাদের সব কিছু ধরে রাখতে পারি নি— কিন্তু হৃদয়ে তারা সার্থক হয়েচে। সেই সার্থকতার ডালি হাতে নিয়েই একদিন সংসার থেকে বিদায় নেব— রিক্তহস্তে যাব না। ইতি ১৫ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩৪

৩ অগস্ট, ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার আশঙ্কা হচ্চে অতি দীর্ঘকাল যে ব্যবস্থার মধ্যে তোমার সমস্ত মন নিবিষ্ট হয়ে ছিল তার থেকে তোমাকে বিচলিত করে কষ্টের কারণ ঘটিয়েছি। চিঠিতে যে সব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করেচি সে কেবল আমার কথাটি তোমার কাছে স্পষ্ট করে বলবার জন্যে। যা আমার বলবার আছে তাকে হৃদয়ঙ্গম করানোই আমার স্বভাব— এই কাজ করতেই এসেচি। আমাকে কবি বলে' সাহিত্যিক বলে' লোকে গ্রহণ করে। বাহবা দেয়, বলে, আমি বেশ বলেচি— আমার রচনার প্রশংসা করে, কেউ বা করেও না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। দীর্ঘকাল এই কাজ করে

এসেচি— দেশের লোকের কাউকে কিছু বোঝাতে পেরেচি বলে বিশ্বাস করি নে— কথায় বুঝিয়েচি কিন্তু অন্তরে নয়। সেই জন্যে আমার স্বদেশে আমি একা। প্রথম প্রথম তা নিয়ে মনে খেদ করেচি— এখন বুঝেচি আমার যা কর্ম্ম তা করেচি, তার পরেকার উপসংহার আমার হাতে নয়। গাছের কাজ হচ্চে বীজকে পোষণ করা, তার পরে মাটির পালা। সেখানকার হিসাব তলব করবার দায় গাছের নয়। আজকাল এই কথা ভেবে শান্তি অবলম্বন করি। যদি দুর্ব্বলতাবশত কখনো নালিষের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পরক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত হই। তোমার মনে যে কঠিন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েচে এ আমি একটুও প্রত্যাশা করি নি। করলে হয় তো চিন্তা করতুম— হয় তো ভাবতুম, তোমার আশ্রয়কে দুর্ব্বল করে' তার পরিবর্ত্তে কোনো অবলম্বন তোমাকে দেওয়ার অবকাশ হয় তো ঘটবে না— এমন অবস্থায় তোমার মনে দ্বিধা জন্মিয়ে দেওয়া নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তোমার বুদ্ধির পরে আমার আস্থা আছে। তুমি নিজের আলোকেই নিজের যথার্থ পথ খুঁজে পাবে— সে পথের সঙ্গে তোমার প্রকৃতির বিরোধ ঘটবে না।

চিঠি লিখতে যদি না পারি কিছু মনে কোরো না— তোমার প্রতি আমার ঔদাসীন্য কল্পনা করে নিজেকে পীড়া দিয়ো না। ইতি ১৮ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৩৫

২১ অগস্ট্ ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার সম্বন্ধে আমার ক্ষোভের কারণ কিছুই ঘটে নি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো। কোনো কারণে যখন তোমার মন বিচলিত বা পীড়িত হয় তখন তুমি অসঙ্কোচে আমার কাছে যেমন খুসি লেখ না কেন তাতে কোনো অন্যায় হয় না। এমনি করে তুমি নিজের সঙ্গেই বিচার করতে থাক। বাতাসের চলা-চলের মতো চিন্তার চলাচল স্বাস্থ্যকর। বদ্ধ মত ও রুদ্ধদ্বার মন নিয়ে যারা থাকে তারা জড় অভ্যাসের আরামে নিবিষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু এ'কে যত বড়ো নামই দাও না এর আসল নাম মানসিক তামসিকতা। এর চেয়ে চিন্তার আলোড়ন নিয়ে দুঃখ পাওয়া ভালো। সৃষ্টির সঙ্গে দুঃখ আছে, তাই উপনিষদে আছে, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ— তিনি তাপে তপ্ত হয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেচেন। তোমার মন সৃষ্টিপ্রবণ, তাই আত্মসৃষ্টি কার্য্যে তোমার চিন্তার বিরাম নেই— অচল সংস্কারের মধ্যে চিরদিনের মতো নিশ্চিন্ত থাকা তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। চিন্তার দ্বন্দ্বে তোমার মন তাপিত। এই তাপের অগ্নিশিখায় তোমার চিত্ত নিজেকে উজ্জ্বল করে' চিন্‌তে চাচ্চে— যা তোমার মধ্যে অস্পষ্ট অসমাপ্ত তা এই আলোড়নে পরিস্ফুট পরিণত হয়ে উঠচে। তোমার এই বেদনাকে কোনো একটা বাঁধা মত ও নির্ব্বিচার অভ্যাসের তলায় চেপে তাকে শান্ত করা তোমার অনিষ্ট

করা। বিশেষত যখন জড় চিত্তের মূঢ় শাস্তি তোমার স্বভাবসঙ্গত নয়। আমার জীবনে নিরন্তর আমার মন নিজের ও চারদিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে চলেচে, কোনো একটা অন্ধকূপের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যায় নি। তোমার মধ্যে চিত্তের এই সচলতা সাধারণ স্ত্রীজনসুলভ নয় এই জন্যেই নারীস্বভাবের রীতি-নিষ্ঠতার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধচে। এই সমস্যার সমাধান তোমার নিজের মধ্যেই হতে থাক্‌বে।

সময়াভাবে তোমাকে চিঠি লিখি নি— শরীরও সুস্থ নয়। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৩৬

২৪ অগস্ট, ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বীরেন্দ্রকিশোরকে পত্রে জানিয়েছিলুম যে তোমাকে যে সব চিঠি লিখেচি তার থেকে উদ্ধার করে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতটাকে প্রকাশ করব। কিন্তু থাক্। আপাতত তোমার পত্রের মধ্যেই নিহিত রইল। যদি ওর প্রাণশক্তি থাকে তবে কোনো এক সময়ে আপনি আবরণ ভেদ করে আবিষ্কৃত হবে— ওর জন্যে আমাকে চেষ্টা করতে হবে না।

বীরেন্দ্রকে লিখেছিলুম সেপ্টেম্বরের আরম্ভে কলকাতায়

৩৫

২১ অগস্ট্ ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার সম্বন্ধে আমার ক্ষোভের কারণ কিছুই ঘটে নি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো। কোনো কারণে যখন তোমার মন বিচলিত বা পীড়িত হয় তখন তুমি অসঙ্কোচে আমার কাছে যেমন খুসি লেখ না কেন তাতে কোনো অন্যায় হয় না। এমনি করে তুমি নিজের সঙ্গেই বিচার করতে থাক। বাতাসের চলাচলের মতো চিন্তার চলাচল স্বাস্থ্যকর। বদ্ধ মত ও রুদ্ধদ্বার মন নিয়ে যারা থাকে তারা জড় অভ্যাসের আরামে নিবিষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু এ'কে যত বড়ো নামই দাও না এর আসল নাম মানসিক তামসিকতা। এর চেয়ে চিন্তার আলোড়ন নিয়ে দুঃখ পাওয়া ভালো। সৃষ্টির সঙ্গে দুঃখ আছে, তাই উপনিষদে আছে, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ— তিনি তাপে তপ্ত হয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেচেন। তোমার মন সৃষ্টিপ্রবণ, তাই আত্মসৃষ্টি কার্য্যে তোমার চিন্তার বিরাম নেই— অচল সংস্কারের মধ্যে চিরদিনের মতো নিশ্চিন্ত থাকা তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। চিন্তার দ্বন্দ্বে তোমার মন তাপিত। এই তাপের অগ্নিশিখায় তোমার চিত্ত নিজেকে উজ্জ্বল করে' চিন্‌তে চাচ্চে— যা তোমার মধ্যে অস্পষ্ট অসমাপ্ত তা এই আলোড়নে পরিস্ফুট পরিণত হয়ে উঠচে। তোমার এই বেদনাকে কোনো একটা বাঁধা মত ও নির্ব্বিচার অভ্যাসের তলায় চেপে তাকে শান্ত করা তোমার অনিষ্ট

করা। বিশেষত যখন জড় চিত্তের মূঢ় শান্তি তোমার স্বভাবসঙ্গত নয়। আমার জীবনে নিরন্তর আমার মন নিজের ও চারদিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে চলেচে, কোনো একটা অন্ধকূপের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যায় নি। তোমার মধ্যে চিত্তের এই সচলতা সাধারণ স্ত্রীজনসুলভ নয় এই জন্যেই নারীস্বভাবের রীতি-নিষ্ঠতার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধচে। এই সমস্যার সমাধান তোমার নিজের মধ্যেই হতে থাক্‌বে।

সময়াভাবে তোমাকে চিঠি লিখি নি— শরীরও সুস্থ নয়। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৩৬

২৪ অগস্ট্‌ ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বীরেন্দ্রকিশোরকে পত্রে জানিয়েছিলুম যে তোমাকে যে সব চিঠি লিখেচি তার থেকে উদ্ধার করে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতটাকে প্রকাশ করব। কিন্তু থাক্‌। আপাতত তোমার পত্রের মধ্যেই নিহিত রইল। যদি ওর প্রাণশক্তি থাকে তবে কোনো এক সময়ে আপনি আবরণ ভেদ করে আবিষ্কৃত হবে— ওর জন্যে আমাকে চেষ্টা করতে হবে না।

বীরেন্দ্রকে লিখেছিলুম সেপ্টেম্বরের আরম্ভে কলকাতায়

যাব। কিন্তু শরীর চলিষ্ণু অবস্থায় নেই অতএব কবে যাওয়া হবে জানি নে।

তোমরা ভালো আছ এই আশা করি। ইতি ৭ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৩৭

২৭ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার চিঠি যে তারিখে পাওয়া উচিত তার চেয়ে দেরীতে পাচ্চ লিখেচ। তার কারণ হচ্চে এই যে আমাদের এখানে যে পোষ্টমাষ্টার আছে সে একাধারে ডাক-হরকরা এবং গুপ্ত চর। আমাদের চিঠি চলাচলে দেরি করে ; খোওয়া যায়। এমন কি, একজনের থামের মধ্যে আরেকজনের চিঠি অসতর্কতাবশত ঢুকে পড়েচে এমন ঘটনাও একবার ঘটেছিল। উপরওয়ালাদের কাছে বারবার দুঃখ জানিয়েচি— মনে মনে হাসতে হাসতে পরিদর্শক গম্ভীরমুখে পরিদর্শন করেও গেছে। এখন নালিশ করা ছেড়ে দিয়েচি। চোরাই-সন্ধানের বাহনটি নিশ্চয় জানে আমার চিঠি-যোগে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গোপনে বাক্য-বোমা চালাই নে— আমার যা-কিছু বলবার প্রকাশ্যেই বলে থাকি। কিন্তু আমার চিঠি গোপনে পড়বার এমন সুযোগ ছাড়বে কেন, বিশেষত যখন কোনো জবাবদিহী নেই। এরা সরকার বাহাদুরের নোংরা কাজের ময়লা-গাড়ি।

তোমার কাছ থেকে চিঠিগুলি পেয়েছি। হয় তো ব্যবহার করব না। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যখন কলকাতায় যাব সেই সময়ে ফেরৎ পাবে।

আমি নিজের ডাক্তারি নিজেই করে থাকি। রোগের দুঃখটা আমাকেই ভোগ করতে হয় অথচ তার সুযোগটা অন্যে ভোগ করবে কেন? এক সময়ে বহু যত্নে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চর্চ্চা করেছিলুম। কিন্তু রোগের লক্ষণ এবং বহুবিস্তৃত ওষুধের ফর্দ্দের মধ্যে এত বেশি হাৎড়াতে হয় যে বইগুলো এবং ওষুধের বাক্সটা বিদায় করে দিয়েছি। এখন বাইয়োকেমিকের আশ্রয় নিয়েছি— ফল পাই ভালো। মানসিক ক্লান্তিতে আমাকে ভুগতে হয়, তার সব চেয়ে ভালো ওষুধ Kali Phos 6x। তুমি যে স্নায়বিক অবসাদের কথা লিখেচ তাতে ঐ ওষুধটা খাটবে। সুবিধা এই যে উপকার যদিবা নাও করে অপকার করবে না। দিনে দশ গ্রেন পরিমাণে চারবার করে খেয়ে দেখতে পারো। কবি ধরেচেন কবিরাজী এতে যদি হাসি পায় তো হেসো এবং হাসতে হাসতেই ওষুধ খেয়ে দেখো— বিশেষত যখন ওষুধটা বিস্বাদ নয়। পর্য্যায়-ক্রমে আরও একটা ওষুধ ব্যবহার কোরো তার নাম Kali Mur 6x। অর্থাৎ একবার প্রথমোক্ত ওষুধ, তার দু ঘণ্টা পরে দ্বিতীয়টা। আমাকে ফী দিতে হবে না। আমার নিকটবর্ত্তীদের উপরে চিকিৎসা চালাই— কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ইতি ১০ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৩৮

২৮ অগস্ট, ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার কোনো পত্রে তোমার কোনো কথায় তোমার গুরুদেবের লাঘবতা ঘটে নি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমার বর্ণনা থেকে তোমার গুরুদেবের যে চিত্র আমার মনে জেগেছে সে অতি সরস গম্ভীর এবং সুন্দর। তোমার গুরুর মধ্যে তুমি মানবচরিত্রের যে উৎকর্ষ উপলব্ধি করেচ আমার কাছে তা লেশমাত্র অশ্রদ্ধেয় নয়।

আমার শরীর কেমন থাকে জানতে চাও। দিন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে আলো কমে' আসতে থাকে এটাকে বিশেষ খবর বলে দেওয়া চলে না। এখন আমার কাজ করবার বয়স নয় অথচ কাজ করতেই হয় সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে ক্লান্তি অনিবার্য্য। সেই ক্লান্তির দোহাই দিয়ে কাজ বন্ধ করি সে সাহস নেই। কাজের সঙ্গে জড়িত একটা অভিমান আছে— অর্থাৎ আমারই কাজ বলে একটা মমতা। সেটাই তো ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে চাবুকের মতো। মনকে ভোলাই কর্ত্তব্যের নাম নিয়ে। কিন্তু গোড়াকার কথাটা অহঙ্কার।

লোকসাহিত্য বলে একটা ছোট বই এইমাত্র হাতের কাছে এসে পড়ল— তোমাকে পাঠাই, পড়ে দেখো।

১০ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় বন্যার দুঃখ দূর কল্পে

একটা অভিনয় করব স্থির করেছি। তার দু চার দিন আগেই যেতে হবে। ইতি ১১ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

একখণ্ড মানসী পাওয়া গেল সেটাও পাঠাচ্চি

৩৯

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কাজের ঝঞ্ঝাট বেড়ে উঠেচে— নানা রকমের ফরমাস খাটতে হয় তবু সে আমার বহুদিনের অভ্যাসে অনেকটা সহ্য হয়ে এসেচে। কিন্তু নিরতিশয় পীড়িত করে তোলে অত্যাচারের কথা। আমার বেদনাবহ নাড়ি এই রকম কোনো সংবাদের নাড়া খেয়ে যখন ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে তখন সে যেন আর থামতে চায় না। সম্প্রতি দেহমনের উপর সেই উপদ্রব দেখা দিয়েচে। দেশে বন্যাপ্লাবনের দুঃখ মনের উপর ভার চাপিয়ে এতদিন বসে ছিল তার উপরে চট্টগ্রামের বিবরণটা আমার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েচে। আমাদের নিজের দেশের লোক নির্ম্মম হয়ে যখন এরকম দানবিক কাণ্ড করে তখন কোথাও কোনো সান্ত্বনা দেখি নে। তার উপরে আর একটা জ্বালার যোগ হয়ে অশান্ত করে তুলচে— মনে নিশ্চয় জানি এর পিছনে আমাদের মর্ত্ত্যলোকের বিধাতাপুরুষেরা রয়েচেন। এই রকম ব্যাপারের দ্বারা দুটো গুরুতর অনিষ্ট হচ্চে।

প্রথম এই— সমস্ত মুসলমান জাতের উপর হিন্দুর ঘৃণা জন্মে যাচ্চে। অথচ এ কথা নিশ্চিত সত্য তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা ভালো লোক,ঠিকমত পরিচয় পেলে যাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে কোথাও বাধত না। ইংরেজের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এই সমস্ত দুর্য্যোগে যে তীব্র বিদ্বেষবুদ্ধি ব্যাপক হয়ে আমাদের মনকে অধিকার করে সেটাতে আমাদের গভীরভাবে ক্ষতি হয়। মুসলমানেরা যদি সম্পূর্ণভাবে পর হোতো তাহলে এ ক্ষতি আমাদের পক্ষে তেমন সর্ব্বনেশে হোতো না— কিন্তু দেশের দিক দিয়ে তারা আমাদের আপন এ কথাটা কোনো উৎপাতেই অস্বীকৃত হতে পারে না। তাই এটা তো বাইরের শেল নয়, এটা যে মর্ম্মস্থানের ভিতরকার বিস্ফোটক— এর মার কে সামলাবে? যারা আমাদের আপন লোকদের এরকম সাংঘাতিকভাবে পর করে দিচ্চে তারা করচে স্বার্থের জন্য। ভারতবর্ষ তাদের অন্নের থালি, এটাতে টান পড়লে তাদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত যদি হয় তবে সেটা পরমার্থের দিকে না হোক অর্থের দিক থেকে বোঝা যায়। কিন্তু আপনার লোকদের কৃত অন্ধ অন্যায় তাদের নিজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধ। তারা চিরদিনের জন্যে দেশের চিত্তে যে অবিশ্বাস যে ঘৃণা আবিল করে তুলচে তাতে চিরদিনের মতোই তাদের নিজের ক্ষতি। ইংরেজ যখন সমস্ত চীনদেশের কণ্ঠের মধ্যে তলোয়ারের ডগা দিয়ে আফিমের গোলা ঠেসে দিলে তখন এ পাপ থেকে অন্তত বৈষয়িক পুরস্কার পেয়েচে। কিন্তু মনে করো দক্ষিণ চীন যদি উত্তর চীনের মুখে বিষ ঢালতে থাকে তাহলে তাতে চীনের অঙ্গে যে মৃত্যুর সঞ্চার হবে তাতে

দক্ষিণ তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। এ ক্ষেত্রে হারলেও মৃত্যু জিৎলেও মৃত্যু। আমাদের মধ্যে যে-কোনো সম্প্রদায় জাতীয় সত্তার মূলে যদি কুঠার চালায় আর এই মনে করে খুসি হয় যে সে আছে উপরের শাখায় তাহলে তার সে আনন্দ কখনো টিঁকতে পারে না। কিন্তু এ কথা বলে গলা ভাঙলেও বিশেষ ফল হবে না— কারণ মানুষের রিপু্ যখন যে কোনো উপলক্ষ্যেই উত্তেজিত হয় তখন আত্মীয়কে আঘাতের দ্বারা আত্মহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইতিহাসে যত কিছু শোচনীয় ঘটনা ঘটে তা এমনি করেই ঘটে, মানুষ আপনি মরবে জেনেও অন্যকে মারে। আমাদের সাধনা আজ কঠিন হয়ে উঠল— অসহ্য আঘাতেও আত্মসম্বরণ করতে যদি না পারি তাহলে আমাদের তরফেও আত্মহত্যার আয়োজন করা হবে— শত্রুগ্রহের হবে জয়। মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আছে বলেই তোমাকে এসব কথা লিখলুম— কথাটা এস্থলে প্রাসঙ্গিক নয় কিন্তু মর্ম্মান্তিক।— এই চিঠি থেকে কথাগুলো নিয়ে চিঠির আকারেই প্রবাসীতে পাঠাব স্থির করেচি।

তোমার রোগের যে ফর্দ্দ পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেল তোমার দেহে এক হাঁসপাতাল-ভরা ব্যামো। তার অনেকগুলোই তোমার স্বরচিত বলেই আমার বিশ্বাস। দীর্ঘকাল ধরে তাদের বাসা দিয়েছ, তাদের যদি নোটিশ দিয়ে বিদায় করো তাহলে আবার নতুন বাসাড়ে জুটিয়ে আনবে। নিজের হাতে দুঃখ রচনা করবার অসাধারণ ক্ষমতা তোমার আছে তাই সন্দেহ করচি অন্তত অনেকগুলো ব্যামোই তোমার হাতগড়া। রোগসৃষ্টিকার্যে

বিধাতার সঙ্গে তুমি টক্কর দিচ্চ, ওঝার কর্ম্ম নয় তোমাকে মুক্তি দেওয়া।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে এখান থেকে কলকাতায় যাবার কথা। সেই সময়ে তোমার চিঠিগুলি নিয়ে যাব— ওখানে গিয়ে তোমাকে দিলেই হবে। ইতি ২০ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৪০

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার শেষ দীর্ঘ চিঠিখানা পেয়েচ কি না জানিনে। না পাওয়া অসম্ভব নয়। রাজকীয় রজকের নোংরা কাপড়ের বাহন যারা তারা সেটাকে আছড়ানো নেংড়ানো ডিপার্টমেণ্টে হয় তো পৌঁছে দিয়েচে। এ চিঠিখানার কি গতি হবে জানিনে। এ চিঠি দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভূমিকম্প ঘটবার আশঙ্কা নেই তাই হয় ত দু চার দিনের মধ্যে তোমার হাতে পৌঁছতে পারে।

আমি আজ শুক্রবারে সায়াহ্নে কলকাতায় উপস্থিত হব।

তুমি দুর্গতদের সাহায্যকল্পে অল্প কিছু সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েচ। তোমার পক্ষে যদি দুঃসাধ্য হয় কুণ্ঠিত হোয়ো না। তোমার শুভ ইচ্ছারও যথেষ্ট মূল্য আছে। ইতি ২৫ ভাদ্র ১৩৩৮

দাদা

৪১

[১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

ওঁ রবিবার

কল্যাণীয়াসু

এসে অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। তোমার প্রেরিত কাপড় পেলুম কাজে লাগবে। তোমাদের লোক টাকা নিয়ে এসেছিল আমি অনুপস্থিত ছিলুম বলে আমাদের নির্ব্বোধ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল। এ রকম করে লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান আমার ভাগ্যেই ঘটে। কিছু কিছু টাকা আসচে। কাজ আরম্ভ হয়েচে।

এই চটিখানা দেখে স্টেজে ব্যাপারটা কি রকম হবে বুঝতে পারবে না।

তোমার চিঠিগুলি ফিরিয়ে দেব। যদি আস কিম্বা লোক পাঠাও তাহলে সহজ হবে।

তোমার শরীর ভালো আছে ত ?

দাদা

৪২

[১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

আজ যদি নটার সময় আসতে পারো তাহলে দেখার বিঘ্ন হবে না। আমি স্টেজে যাবার পূর্ব্বেই খেয়ে নিই।

দাদা

৪৩

[১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে ভুল বলেছিলেম। বুধবার সন্ধ্যার সময় ম্যাডানের সিনেমায় আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। সেদিনকার আয় আমাদের। আমাদের অভিনয় আজ শেষ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আটটার পূর্ব্বেই। তুমি কি সওয়া আটটা বা পৌনে আটটায় আমাদের এখানে আসতে পারবে। সেদিন তুমি এখানে এসে ফিরে গেছ শুনে দুঃখ পেয়েছি। খবর পাঠালে আমি নিশ্চয় সুবিধা করে দেখা করতুম। যদি আজ আসতে পার লিখে পাঠিয়ো। তোমার দুখানি রুলির জন্যে একজন কুড়ি টাকা দাম দিয়েচে। তোমার ২০ টাকা পেয়েচি।

দাদা

৪৪

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

নানা খুচরো লেখার দায় পড়েচে আমার উপরে— তাতে সময় যায়, আনন্দ পাইনে। তার উপরে শ্রান্তি, এবং মনটা উদ্বিগ্ন। জোড়াসাঁকোয় দরবারী লোকের ভিড়ে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে এখানে আশ্রয় নিয়েচি। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র কাজগুলোও এসেচে। তাই তোমাকে অনেকদিন চিঠি লিখতে পারিনি। তার উপরে কাল

যখন শুনলুম তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে ফিরে গেছ আমার মনে বড়ো আঘাত লাগল। আগে যদি জানতুম তাহলে নিশ্চয়ই এখান থেকে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতুম।

আমি কাল বৃহস্পতিবারে বিকালে জোড়াসাঁকোয় যাব— তার পরদিন সকালে পালাব শান্তিনিকেতনে। হয়ত বৃহস্পতি-বারে তোমার আসা সম্ভব হবে না। না হোক্, কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত জেনো, তোমার পরে আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধা সুগভীর। যদি আমি তোমার অন্তরের অভাব দ্বন্দ্ব বেদনা কোনো উপায়ে লাঘব করতে পারতুম বড়ো খুসি হতুম। কিন্তু আমার সে শক্তি নেই। আমি নিজে যদি বা কোনো সত্য উপলব্ধি করি সেটা আর কাউকে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। লেখবার ক্ষমতা হয় তো আছে, কিন্তু লেখা এবং দেওয়া একই নয়। পরশ পাথর যার শক্তির মধ্যে আছে মানুষকে সেই তো সত্যকার দানে ধনী করে। অন্তরকে সোনা করতে যাঁরা পারেন তাঁদের দেখা পাওয়া দুর্লভ। সেই জন্যে আমার মতো ভাষানিপুণ লোকও হয় তো অল্প কিছু উপকার করতে পারে। ভাষার সাহায্যে হয় তো আমরা বুদ্ধিতে বুঝি কিন্তু অন্তরে পাইনে। সত্য জানা বড়ো কথা নয়, সত্য হওয়াই হচ্চে চরম সিদ্ধি। সেই সত্যকরণের শক্তি যাঁর কাছে পাওয়া সম্ভব তাঁকেই প্রণাম করি। আমার কি প্রণাম প্রাপ্য? কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহদানের যদি কোনো মূল্য থাকে সে মূল্য তুমি পেয়েছ। ইতি ৬ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদা

৪৫

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি চিঠি লিখ্‌তে ত্রুটি করিনে, কিন্তু আনমনা মানুষ, উত্তর দিতে ভুলে যাই। আজ আরম্ভেই তোমার প্রশ্ন ক'টির জবাব দেব।

একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফোটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি যা জেনেছি তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে দ্বিতীয়বার পঞ্চত্ব পায় ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।

১। গোরা ও নৌকাডুবির কল্পনা সম্পূর্ণই আমার মাথার থেকে বেরিয়েচে। এমন ঘটনা ঘটেচে বলে জানিনে কিন্তু ঘটলে কী হতে পারত সেইটে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেচি।

২। দালিয়া গল্পটায় ইতিহাস যেটুকু আছে সে আছে গল্পের বহিঃপ্রাঙ্গণে— অর্থাৎ গাছে চড়িয়ে দিয়ে মই নিয়েচে ছুটি। আসল গল্পটা ষোলো আনাই গল্প।

৩। কেশরলালের গল্পটা পেয়েচি মগজ থেকে। চতুর্ম্মুখের মগজ আছে কিনা জানিনে কিন্তু তিনি কিছু-না থেকে কিছুকে যে ভাবে গড়ে তোলেন এও তাই। অনেককাল পূর্ব্বে একবার যখন দার্জ্জিলিঙে গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারাণী। তিনি আমাকে গল্প বল্‌তে কেবলি জেদ করতেন। এই গল্পটা তাঁর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে

বলেছিলুম। মাস্টারমশায় গল্পের ভূমিকা অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি করে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত।

৪। ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্পলোক থেকে আমদানি।

৫। বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় অল্প কিছু বদল করেচি। বোষ্টমী যে, গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়— সংসারত্যাগ করেছিল বটে। একদিন আমাকে এসে বল্‌লে, কাল রাত্রে স্বপ্নে তোমার পা দুখানি বুকের উপর পেয়েছিলুম— মোজা ছিল না— ঠাণ্ডা। এই তো দূরে থেকেও তোমাকে পেয়েছি। কাছে আসবার এই আকাঙ্ক্ষা, এ তো মোহ।— এই বলে সে চলে গেল, আর তাকে দেখিনি।

৬। কাবুলিওয়ালা বাস্তব ঘটনা নয়। মিনি আমার বড়ো মেয়ের আদর্শে রচিত।

৭। বিদেশের উপাদান নিয়ে আমি কখনো কিছু লিখিনি। বাইরে থেকে মালমসলা ধার নিয়ে লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

—০—

কাল বৌমাকে দেখতে গিয়েছিলুম— অনেকটা সেরেচেন। মীরা আছে শান্তিনিকেতনে।

—০—

নরদেবতা সম্বন্ধে ভাবের দিক থেকে তুমি যে কথা সুন্দর

করে বলেচ সে মেনে নিতে আমার বাধে না। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যেখানে তাঁকে জড়িত করো সেখানে দেখতে পাই তোমাদের ব্যক্তিগত অভ্যাস। সেখানে সকল দেশের সব মানুষ মিলতে পারে না। তোমাদের দেবতত্ত্ব গ্রহণ করা সহজ, কিন্তু দেব-কাহিনী অত্যন্ত বেশি প্রাদেশিক, তার বিচিত্র বিবরণ মূল ভাবকে বাধা দেয়। যেমন তোমার হাঁপানির ওষুধের কথা। শিকড়টা মানতে পারি যদি প্রমাণ পাই। কিন্তু ১৭ বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান সহ সেটা তুলে আনলে তবেই তার শক্তি জাগবে এ কথা মানতে গেলে নিজের বিধিদত্ত বুদ্ধির পরে অবিচার করা হয়। তত্ত্বটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং সেটা দেশকালপাত্রনির্ব্বিচারেই সত্য। কিন্তু তার আনুষঙ্গিক বিবরণ জনশ্রুতিমাত্র, এবং সে জনশ্রুতিও বিচারবুদ্ধিসমর্থিত জনশ্রুতি যদি না হয়, এবং যদি তাতে এমন কিছু থাকে যা আমাদের অপ্রমত্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে তাহলে দশজন বলে বলেই তাকে স্বীকার করে নিতে পারবো না। যে দেশে সকল কথাই এই রকম অন্ধভাবে স্বীকার করে নেওয়াই মানুষের অভ্যস্ত সে দেশের দুর্গতি কখনোই কাটে না। অযৌক্তিক কথাকে সন্দেহ করতেই হবে, তার পরেও যদি সেটা সপ্রমাণ হয় তাহলে কথা নেই। আমি নরদেবতাকে বিশ্বাস করি বুদ্ধের মধ্যে, কেননা বুদ্ধ অনৈতিহাসিক গালগল্পমাত্র নয়, বিশ্বাস করি ভগবদ্গীতার কৃষ্ণের মধ্যে, সে কৃষ্ণও মর্ত্ত্য মানুষের ঘরের লোক। বৃন্দাবনকে যদি বলো আনন্দধামের রূপক তাহলে কোনো কথা নেই, যদি বৃন্দাবনকে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক

বলো, তাহলে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দাবী করব, শাস্ত্রবাক্যমাত্রকেই শিরোধার্য্য করব না। তোমার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। যখন ব্যাখ্যা করো তখন তত্ত্বব্যাখ্যা করো, যখন ব্যবহার করো তখন সংস্কারকে চোখ বুজে মেনে নাও। এ পথে আমি যেতে পারিনে। অথচ তোমার আশ্রয় থেকে তোমার মুগ্ধ মনকে নড়াতে ইচ্ছা যায় না। যেখানে তোমার আনন্দ সেখানে তুমি মজ্জিত হয়ে থাক তাতে দোষ নেই। তার বদলে তোমাকে কিছু দিতে পারি এমন শক্তি আমার কোথায়! আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয় তত্ত্বকে যখন সত্য বলে অন্তরে উপলব্ধি করি— বাইরেকার কল্পিত রূপে তাকে বন্দী করে অতিবিশেষ করে দেখতে গেলে আমার চিত্ত নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করে, সে রকম আত্মবঞ্চনায় আমার কোনোদিন প্রয়োজনবোধ হয় না। যদি বলো এ তো আত্মবঞ্চনা নয়, এ বাস্তব সত্য, তাহলেই কথা ওঠে বাস্তব সত্যকে বিশ্বাসের জন্য যৌক্তিক প্রমাণ না হলে নয়। ইতিহাস শ্রদ্ধা লাভ করে একমাত্র ঐতিহাসিক বিচারের পরে। কিন্তু তোমাকে এ সব কথা বলতে গেলে আমার ব্যথা লাগে। যে বিশ্বাস তোমার প্রেমের মধ্যে রক্ষিত তাকে আঘাত করা তোমাকেই আঘাত দেওয়া। কি হবে এমন পীড়ন করে?

তোমাদের সম্প্রদায়ে যে ব্যবহারটাকে আমার অন্যায় বলে মনে হয় সে সম্বন্ধে আপত্তি না করে থাকতে পারিনে। তোমার চিত্তকে বুদ্ধির ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা না দেওয়া মানব অধিকারকে পীড়ন করা, সুতরাং সেটা বস্তুত অধার্ম্মিকতা। আমার কাছে এসে আমার কথা শুনলে যদি সেটাকে কোনো

সম্প্রদায় অপরাধ বলে গণ্য করে তবে সে সম্প্রদায়ের অন্তরে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ নিহিত আছে। মানুষের চিত্তকে খাঁচায় বাঁধবার ধর্ম্ম যতই ভাবৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হোক্ তবু সে সোনার খাঁচার বাইরে এগবে না। সেই সোনার খাঁচাই তার স্বর্গের আদর্শ। কিছু মনে কোরোনা তুমি— মানুষের বিরুদ্ধে ধর্ম্মগত কর্ম্মগত ভাবগত কোনো অত্যাচার আমি সইতে পারিনে। ইতি বৃহস্পতিবার ৭ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদা

৪৬

[২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজ সন্ধ্যার গাড়িতে চলে যাচ্চি। তোমাকে কতকগুলি বই পাঠাতে বলে গেলুম ১ সুকিয়া স্ট্রীটে। পাবে আশা করি এবং কেউ তাতে অপরাধ নেবেন না। পৌষের পূর্ব্বে কলকাতায় ফিরব না। নিরতিশয় ব্যস্ত ও ক্লান্ত। কাল ভিড়ে প্রাণ কণ্ঠে উঠেছিল। আজ সকাল থেকে লোকারণ্য। ইতি রবিবার

দাদা

৪৭

[শান্তিনিকেতন। সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি বোধ হয় খবর পাওনি— হিজলি হত্যা নিয়ে আমি কি রকম ভীষণ ভিড়ের মধ্যে টাউন হল থেকে মন্যুমেণ্ট পর্য্যন্ত পাক খেয়েছি। তার পরের দিনও সকাল সাতটা থেকে আমার বাড়িতেও ঠেলাঠেলি ভিড়। আমার শরীরে আর সইছিল না। এক মুহূর্ত্তও সময় ছিল না যে এক লাইন লিখে তোমাকে আমার অবস্থা জানাব। রেলগাড়িতেও দুই মাদ্রাজি আমাকে অর্দ্ধেক পথ অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করে সাংঘাতিক অত্যাচার করেছিল। এখানে আধমরা হয়ে পৌঁচেছি। অনেক দিনের অনুপস্থিতিতে এখানেও কাজ জমা হয়ে আছে— যখন বিছানায় উত্তান হয়ে পড়া উচিত ছিল তখনো ডেস্ক আঁকড়ে পড়ে আছি। সামনে স্তূপাকার আধুনিক বাংলা গল্পের বই আমার অভিমতের অপেক্ষায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গেছে। নীরবেই তাদের সৎকার হবে— আমার শক্তি নেই। লেখকরা মনে করে তাদের প্রতি আমি উদাসীন— এ কথা ভাবে না তারা প্রত্যেকে একজন কিন্তু আমার ঘরে তারা অসংখ্য— তা ছাড়া আমার সময় নিরবধি নয় আমার শক্তিও পরিমিত।

তোমাকে কিছু বই পাঠাবার জন্যে লিখেছি। এ চিঠি পাবার আগেই বোধ করি পেয়েচ।

এখন থেকে পৌষ মাস পর্য্যন্ত এইখানেই আমার অবস্থিতি। তুমি শান্ত ও সুস্থ আছ সংবাদ পেলে আমি খুসি হব। ইতি—

দাদা

৪৮

[শান্তিনিকেতন] ১০ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সঙ্কল্প করেছিলুম পূজোর ছুটি আশ্রমেই কাটাব। কিন্তু শরীরের ক্লান্তি এখনো বুকে পিঠে চেপে বসে আছে, তা ছাড়া আমি এখানে থাকব শুনে আমাকে সঙ্গদান করবে বলে অনেকে পণ করেচেন। কোন্ কোন্ বিপদ থেকে কত হাত দূরে পালাতে হবে চাণক্য তাঁর শ্লোকে তা মেপে দিয়েছেন কিন্তু সেকালে বিশ্রামঘাতক আগন্তুকদের সম্বন্ধে কোনো বিধিবিধান ছিল না কেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। স্থির করেছি দার্জ্জিলিং পালাব। সেখানেও জনতার অভাব হবে এমন আশা নেই কিন্তু অন্তত ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। ওখানে যাবার মুখে কলকাতা হয়ে যেতে হবে তখন যদি ইচ্ছা কর একবার দেখা করে যেতে পারো। কবে যাব তোমাকে পূর্ব্বেই জানাব।

সমাজকে যে ভাবে সংশোধন করতে চাও সেটা আমার দ্বারা ঘটাতে পারবে এমন আশা কোরো না। আমি একটু আধটু ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখতে পারি, তারও উৎসাহ আজকাল অনেকটা

কমে গেছে। সমাজ নিয়ে ভাঙাগড়া করবার সখ আমার একটুকুও নেই, তবে এটা জানি যে, এই অচল জড় সমাজ গলায় বেঁধে আমরা দুর্গতির তলায় নেবেছি। বিদেশী শত্রুকে ভয় করিনে কিন্তু এই সাংঘাতিক সমাজকে ভয় করি, মারের বীজ পুঁতে রেখেচে আমাদের মজ্জায়। ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাম সই দেখে বুঝবে ক্লান্ত মন— অবধান দুর্ব্বল।

৪৯

[অক্টোবর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির ভাষা কী সুন্দর। সহজ, গভীর, অকৃত্রিম। তোমার মন তোমার ভাষায় কোথাও বাধা পায় নি, ভাবনার ভঙ্গীর সঙ্গে ভাষার ভঙ্গী লীলায়িত হয়ে চলেচে। এরকম লেখা সহজ নয়। অনেকবার ভাবি তোমার এই শক্তি কেবল চিঠি লেখার খিড়কির রাস্তা দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া আসা করে কেন? চিঠি লেখার ভঙ্গী দিয়েই সদরের জন্যে কিছু কেন লেখ না? কোনো একটা সহজ বিষয় নিয়ে। তোমার এক একটি চিঠি আমাকে বিস্মিত করে, আমার মনকে দুলিয়ে দেয়।

দার্জ্জিলিং যাব বলে এসেচি। পূজোর ভিড়ে গাড়ি পাওয়া দুঃসাধ্য বলে অপেক্ষা করতে হচ্চে। বোধ হয় দুচার দিনের

মধ্যে চলে যাব। যদি কখনো আসতে পার তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করব।

দাদা

৫০

[১৬ অক্টোবর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার ফলগুলি পেয়ে আনন্দ হোলো।

বাধা ভেদ করে আসবার চেষ্টা কোরো না। আমি রবিবার সন্ধ্যার গাড়িতে দার্জ্জিলিং যাব।

সুভাষ বসুর দল আমাকে তাদের এক বাজারে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করছিল। আমার শরীরের প্রতি তাদের দয়া মায়া নেই, জোর করেই বলতে হোলো তাদের বাজারে পদার্পণ করবার মহদুদ্দেশে আমি আয়ুক্ষয় করতে পারব না।

আমাকে ভিন্ন ভিন্ন দল বাঁটোয়ারা করে নিতে চায়— আমি আত্মরক্ষার জন্যে নির্লিপ্ত থাকতে চাই— নইলে আমার কাজ বন্ধ হয়। সব দলকেই বিরক্ত করি। যদি না করতুম তবে এই সব ক্ষুদে দলদের তলায় দলিত হয়ে জীবন ব্যর্থ হোত। এত ক্ষুদ্রতা বাংলা দেশের বাইরে আর কোথাও নেই। পালাতে ইচ্ছা করে। পালাবার সময় হোলো। তখন স্মরণসভার ধুম লাগ্‌বে। আজ তবে আসি। ইতি শুক্রবার

দাদা

৫১

[অক্টোবর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাবার আয়োজন করচি। এ দিকে সকাল থেকে ঘর ভর্ত্তি। কোনোমতে অবকাশ করে নিয়ে স্নানাহারটা সম্পন্ন করতে পেরেচি।

আমাকে তুমি জগদ্বিখ্যাত একটা মহা উপদ্রব বলে উচ্চাসনে চড়িয়ে রেখে দিলে খুসি হব না। যে সমতলক্ষেত্রে তুমি সহজেই আমার কাছে আসতে পার তার ঊর্দ্ধে আমাকে নির্ব্বাসিত কোরোনা। দূরের থেকে প্রভুত্ব প্রয়োগ করা, শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব ভোগ করা আমার স্বভাবসঙ্গত নয়। সরল প্রীতির সম্বন্ধ নিয়ে মানুষের সাহচর্য্য যখন করতে পারি তখন খুসি থাকি। কাল তুমি যেমন কাছের মানুষ হয়ে আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কয়েছিলে সেইটেই আমার বিশেষ ভালো লেগেছিল। ভক্তি করতে পার এত বড়ো গাম্ভীর্য্য আমার নেই কিন্তু সখ্যের উপযুক্ত গুণ হয়ত কিছু কিছু আছে— যার নিজগুণে আবিষ্কার করবার শক্তি আছে তার কাছে এটা ধরা পড়ে।— এবার কাপড়ের বাক্স বোঝাই করার কাজে লাগতে হবে। ইতি রবিবার

দাদা

৫২

২১ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে আমাকে বর দিয়েছ আমি যেন আমার মনের মানুষ খুঁজে পাই। এর থেকে বোঝা গেল এতদিন তোমাকে যা বলে এসেচি তা তুমি বোঝো নি। আমার মনের মানুষের উপলব্ধি আমার অন্তরে পূর্ণতা পাবে এই আমি কামনা করি। "হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" এই মনের মানুষ কেবলমাত্র রসভোগের নেশায় মাতিয়ে রাখবার জন্যে নয়, মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উদ্বোধনের জন্যে। এই মনের মানুষই তো আমাকে একদিন আত্মনিবিষ্ট সাহিত্যসাধনার গণ্ডী থেকে শান্তিনিকেতনের কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। সে কি সঙ্গ পাবার জন্যে, সুখ পাবার জন্যে। এই ত্রিশ বৎসর যে কঠিন দুঃখের পথে আমাকে চলতে হয়েচে তার ইতিহাস কেউ জানবে না— এই দুঃখেই আমার মনের মানুষের সঙ্গে আমার যোগ।

তোমার চিঠিতে তোমাদের বাচিক পূজার দীর্ঘ বর্ণনা করেছ। এই রসতৃপ্তির সমারোহে আমার মন সায় দেয় না। আমি যাকে পূজা বলি, সে কঠিন কর্ম্মে, সত্যের সাধনায়। লোকহিতে আত্মোৎসর্গের যে আয়োজন সেই আয়োজনেই মনের মানুষের পূজা,— যে দেশে এই পূজা সত্য হয় সেই দেশেই শ্রী সম্মান স্বাস্থ্য, সেই দেশেই জ্ঞানবীর কর্ম্মবীরদের যজ্ঞশালা।— আমার মনের মানুষ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন এ কথা নিশ্চয় জেনো।

তাঁর আভাস পেয়েছি ইতিহাসে নরোত্তমদের মধ্যে। যেমন ভগবান বুদ্ধ। তিনি সকল মানুষের মুক্তির জন্যে আত্মদান করেছিলেন— তাঁর ভক্তেরা শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে ভক্তিকে ভোগের জিনিষ করেন নি— ভক্তি তাঁদের বীর্য্য দিয়েছিল, দুর্গম সমুদ্র পর্ব্বত লঙ্ঘন করে তাঁরা মানুষকে সত্য বিতরণ করবার জন্যে দেশে বিদেশে প্রাণ দিয়ে এসেচেন। কাদের দেশে? যাদের তোমরা ম্লেচ্ছ বল, যারা তোমাদের দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে মার খেয়ে মরে।— তোমার পূর্ব্বপত্রে একটা প্রশ্ন ছিল, নিজের খ্যাতি বিস্তার করবার জন্যে আমি মাইনে দিয়ে লোক রেখেচি কিনা। এ রকম সন্দেহ কেবল বাংলাদেশেই সম্ভব। এই দেশেই লোকে কানাকানি করে, যে, কোনো বিশেষ কৌশলে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েছি এবং আমার যে ইংরেজি রচনা খ্যাতি পেয়েচে সেগুলো কোনো ইংরেজকে দিয়ে লেখা।— তথাপি এ দেশেও আমার ভক্ত আছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি পূজা চাইনে। যদি সত্যিই চাইতুম তাহলে এই ধর্ম্মমুগ্ধ দেশে অবতার হয়ে ওঠা আমার পক্ষে শক্ত হত না। আমি যাঁর পূজায় প্রবৃত্ত অন্যদের কাছে তাঁর পূজাই চেয়েচি। তুমি আবিষ্কার করেচ আমি ঈশ্বর নই। শুনে বিস্মিত হলুম। তুমি কাকে ঈশ্বর বল আমি জানিনে— ঈশোপনিষদে এক ঈশ্বরের কথা আছে— তিনি সর্ব্বভূতকে অনন্তকাল ব্যাপ্ত করে আছেন, আমি যে সে ঈশ্বর নই সে কথা মুখে উচ্চারণ করবারও দরকার ছিল না। ইতি বিজয়া দশমী [৪ কার্ত্তিক] ১৩৩৮

দাদা

৫৩

[দার্জিলিং] ২৬ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসে অবধি শয্যাগত হয়েই আছি। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা আবর্ত্ত শরীরের মধ্যে ঘুরপাক দিয়ে বেড়াচ্চে। আজ সকালে ক্ষণকালের জন্যে উঠে বসেছি এমন সময় কাচের প্রাচীরের আড়াল থেকে শ্রীপতি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে। ভিতরে এসে তোমার চিঠিখানি আমাকে দিল। এ কথা পূর্ব্বেও বলেচি আমার অনুরোধে তোমার আচার অনুষ্ঠান অভ্যাস কিছুরই পরিবর্ত্তন কোরো না। তোমার যুক্তি তোমার শ্রেয়োবুদ্ধি আপনা থেকে যাতে সায় না দেবে তা কখনো তোমার আপন জিনিষ হতে পারবে না। আমার বলবার কথা এই, তুমি গভীরভাবে নিজে চিন্তা কোরো, এবং এই কথাটা মনে জেনো, ধর্ম্ম মানেই মনুষ্যত্ব— যেমন আগুনের ধর্ম্মই অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম্ম পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম্ম মানুষের পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতাকে কোনো এক অংশে বিশেষভাবে খণ্ডিত করে তাকে ধর্ম্ম নাম দিয়ে আমরা মনুষ্যত্বকে আঘাত করি। এই জন্যেই ধর্ম্মের নাম দিয়ে পৃথিবীতে যত নিদারুণ উপদ্রব ঘটেচে এমন বৈষয়িক লোভের তাগিদেও নয়। ধর্ম্মের আক্রোশে যদি বা উপদ্রব নাও করি তবে ধর্ম্মের মোহে মানুষকে নির্জ্জীব করে রাখি তার বুদ্ধিকে নিরর্থক জড় অভ্যাসের নাগপাশে অস্থিতে মজ্জাতে নিষ্পিষ্ট করে ফেলি— দৈবের প্রতি দুর্ব্বল ভাবে

আসক্ত করে', নানা কাল্পনিক বিভীষিকার বাধায় পদে পদে প্রতিহত করে তাকে লোকযাত্রায় অকৃতার্থ ও পরাভূত করে তুলি। বুদ্ধি যেখানে শৃঙ্খলিত, পুরুষকার যেখানে গুরুভারগ্রস্ত, সেই হতভাগ্য দেশে সর্ব্বপ্রকার দৈহিক মানসিক রাষ্ট্রিক অমঙ্গল অব্যাঘাতে অচল হয়ে ওঠে। মানুষের পরিপূর্ণতার যে ধর্ম্ম তার মধ্যে ত্যাগ আছে, ভোগ আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, কর্ম্ম আছে, চিন্তা আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কঠোরতা আছে — এই সমস্ত কিছুর শ্রেয়স্করতা হচ্চে তার সর্ব্বজনীনতায়, তার নিত্যতায়— অর্থাৎ এই সকলের মধ্য দিয়ে আমরা মহামানবের **শাশ্বত** অভিপ্রায়কে নিজের মধ্যে সার্থক করি। আমার সার্থকতা যদি সকল মানুষের সার্থকতা না হয় তবে সে ধর্ম্মের ক্ষেত্রের বাইরে পড়ে, বিষয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়ায়। এর কারণ এই যে, বাঘ আপন একান্ত ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যেও আপন ব্যাঘ্রত্ব রক্ষা করতে পারে,— কিন্তু মানুষ যে পরিমাণে একলা সেই পরিমাণেই সে অমানুষ। আমি যে কবিতা লিখি সে যদি নিতান্তই আপনার খেয়ালেই চলে সমস্ত মানুষের খেয়ালের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে মানুষের সাহিত্যে সে টিঁকবে না। তেমনি মানুষের বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা মানুষের মুক্তি —এ সব কিছুই সমস্ত মানুষকে জড়িয়ে। এই যে একজন মানুষ সকল মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি শ্রেয়ের সঙ্গে সম্মিলিত, দূরকালে দূরদেশে তার মানবসম্বন্ধ প্রসারিত এইটেই মানুষের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে যে তপস্যা পূর্ণতার অভিমুখে নিয়ে যায় আমি তাকেই ধর্ম্ম বলি। এই সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতাকে যা কিছু পঙ্গু করে তাকে

যত বড়ো নামই দাও তাকে আমি ধর্ম্ম বলে শ্রদ্ধা করি নে। অতএব তুমি আমাকে যোগী বৈরাগী অনাসক্ত বলে মনে কোরো না। অচলায়তনে আমার একটি গান আছে

আমি সব কিছু চাইরে,
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

ইতি ৯ কার্তিক ১৩৩৮

দাদা

৫৪

[দার্জিলিং] ২৬ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মাঝে মাঝে আমি তোমাকে আঘাত দিই, অবশেষে অনুতাপও হয়। কিন্তু আমার উপায় নেই। আমাদের দেশের ভক্তির সঙ্গে পূজার সঙ্গে সর্ব্বমানবের এমন বিচ্ছেদ, তার প্রতি এত ঔদাসীন্য যে সে আমি সইতে পারিনে। আচার বিচারের মূঢ়তায় সমস্ত দেশের বুক যে কি জোরে চেপে ধরেছে তা একখানা পাঁজি পড়লেই বোঝা যায়। অথচ এই পাঁজি তার নির্ব্বুদ্ধির স্তূপাকার বোঝাই নিয়ে ঘরে ঘরে ফিরে বেড়াচ্চে— আমার তো লজ্জা বোধ হয়। অল্পদিন আগে আমাদের আশ্রমের কাছে একটি বিবাহ দেখেছি— তার স্ত্রীআচার বারো আনা বিশুদ্ধ বর্ব্বরতা। এই আচারের বর্ব্বরতায় সমস্ত দেশে

আমাদের মনুষ্যত্বকে অবমানিত করচে। বিধাতার দত্ত বুদ্ধির সম্মান একেবারে ঘুচে গেছে, আমাদের স্বরচিত চোখে ঠুলি দেওয়া অন্ধতাকে আমরা ধর্ম্মের নামে পূজা করি। এইখানে আমাদের পরাভব হতেই হবে। মানুষের দুঃখ আজ জগদ্ব্যাপী— তার মাঝখানে আমাদের সমাজ জুড়ে নিরর্থকতার বিপুল আয়োজন আমাকে লজ্জিত ও দুঃখিত করে। সে কথা তোমার কাছে লুকোতে পারিনে। তুমি মনে করতে পার এটা আমার মজ্জাগত বৈদেশিকতা, তা যদি সত্য হয় তাহলে স্বাদেশিকতা অশ্রদ্ধেয়। সম্প্রতি এখানে জগজ্জননীর নামে জীবরক্তের স্রোত বয়ে গেছে আর তাই নিয়ে যে উন্মত্ততা সে অনার্য্যের উন্মত্ততা— অথচ সেও ধর্ম্ম এবং মেয়েরাও এই রক্ত নিয়ে ছেলের কপালে ফোঁটা দিয়ে দেয়, মনে করে মাএর আশীর্ব্বাদ পেলে। ইতি
৯ কার্ত্তিক ১৩৩৮

দাদা

৪৫

৩০ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

Glen Eden

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

নিরন্তর অপরাধভীরুতা তোমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেচে — মানুষের কাছে অপরাধ, দেবতার কাছে অপরাধ, গ্রহ উপ-গ্রহের কাছে অপরাধ। প্রায়ই এই অপরাধকল্পনাটা অনুষ্ঠানের ত্রুটি নিয়ে। নিজের চারদিকে এই বিভীষিকা কেন তুমি সৃষ্টি করে তুলেচ? এতে মানুষকে শক্তি দেয় না, দুর্ব্বলই করে রাখে। সামান্য আচারে ব্যবহারে দেবতা কেবলি আমাদের ছল ধরবার জন্যেই বসে আছেন— তাঁর C. I. Dর দল দিন-রাত আনাচে কানাচে ঘুরে পদে পদে আমাদের চলাফেরা নোট করে রাখচে এ যদি সত্য হয় তবে এমন দেবতার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহই শ্রেয়। আর যাই হোক আমার সম্বন্ধে তুমি কোনো অপরাধ কল্পনা কোরো না। আমি সি, আই, ডির চরওয়ালার দেবতা নই আমি কবি। আমি ভুলচুকের উপর দিয়েও মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করি। তুমি যখন ভয় করো যে আমি বুঝি বা রাগ করচি, ক্ষমা করচিনে— তখন বুঝতে পারি এই রকমের ঘর-গড়া ভয়ের চর্চ্চায় আমাদের দেশ অভ্যস্ত— তাতে দুঃখ বোধ করি।

বেশি লেখবার মতো শরীর নয় তবু না লিখে পারলুম না। ইতি ১৩ কার্ত্তিক ১৩৩৮

দাদা

৫৬

১ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কথাটা এই যে, লক্ষ যোজন দূরে কোন্ গ্রহ উপগ্রহ কোথাও বিশেষভাবে পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে আছে বলেই সকাল বেলা উঠেই তোমার হাঁচি আরম্ভ হোলো, দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে সেটা গেল পুড়ে, চোখের ডান পাতা কাঁপতে সুরু করল, বুঝতে পারলে আজ বাজার করতে পাঠালে বাজারদর যাবে চড়ে, কেননা রাহু দৃষ্টি দিচ্চে তোমার বাজারের স্থানে, ওদিকে তোমার গ্রাম সম্পর্কে মাসতুতো বোনের ভাসুরপোকে তোমার দেওরের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছ বলে আত্মীয়বিচ্ছেদ হয়ে গেল, কেননা শনি ছিল তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দ্দের উপরে চেপে —এসব কথা তোমার মন থেকে সরিয়ে দাও। কেন মনকে দুর্ব্বল করো? সংসারে ছোটো বড়ো অনেক অমঙ্গল আছে— বুদ্ধি নিয়ে বীর্য্য নিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করতেই হয়, কখনো হারি কখনো জিতি সংসারের এই নিয়ম। বিশেষ কারণে যখন অন্যমনস্ক থাকি তখন ডালে নুন দিতে পানে চুন দিতে ভুল হয়ে যায়— কেতু নামক পদার্থের উপর এর মূল দায়িত্ব চাপিয়ে কপালে করাঘাত করার মতো এত বড়ো দুর্ব্বলতা আর কী হতে পারে! অথচ এ দিকে সামান্য বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে দেবতার কাছে অপরাধ হচ্চে বলে মনকে পদে পদে পীড়িত করতে থাকো। গ্রহই যদি অপরাধ ঘটায় তবে দেবতার

সঙ্গে অপদেবতার লড়াই হোক্ না কেন, মাঝের থেকে মানুষ কেন পায় শাস্তি ? যদি বলো পুরুষকারের জোরে গ্রহফল খণ্ডন হয় তাহলে গ্রহটাকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখলেই তো পুরুষকার পূরো পরিমাণে জোর পেতে পারে। বিমানচারী অনধিগম্য শত্রুর বিভীষিকার ছায়ায় মনকে পদে পদে আচ্ছন্ন করে কেউ কি কখনো জীবযাত্রায় জয়লাভ করতে পারে ? দেশে চারদিকে তোমার শত্রু আছে ম্যালেরিয়া, মূর্খতা, গোঁড়ামি, নিরুদ্যম, পরস্পর ঈর্ষ্যা কলহ নিন্দুকতা মূঢ়ের আত্মাভিমান, আরো কত কি— এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের যুদ্ধ করতে হবে বুদ্ধির দ্বারা সুবিবেচনার দ্বারা চারিত্রবলের দ্বারা— এর উপরে পঞ্জিকা-বিহারী শত্রুভয় আর বাড়াও কেন ? যে দেশের হাড়ে মজ্জায় নানা আকারে ভয় ঢুকে চিত্তকে ঘুণে খাওয়া করে দিয়েচে,— এমন সব ভয় যার অস্ত্র নেই, যেখানে যুক্তি পৌঁছয় না, সে দেশকে বাঁচাবে কে ? আমাদের দেশে গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে শুভলগ্নে তো সকলেরই বিবাহ হয়— লগ্ন যে পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার হাজার প্রমাণ চারদিকেই— কিন্তু মূঢ়তার জোর কমে না। তর্ক করবার সময় বলে লগ্নফলের উপর স্ত্রীপুরুষের ভাগ্যফল আছে। শুধু স্ত্রীপুরুষ কেন, ভাই বোন শ্বশুর শাশুড়ি, ভাবী সন্তান সকলেরই ভাগ্যফল পরস্পর বিজড়িত। তাই যদি হয় পাড়াপ্রতিবেশী এবং দেশ বিদেশের লোককে বাদ দেওয়া চলবে না। যে ইংরেজের ছেলে বাঁদর ভ্রম করে শিকার করতে গিয়ে বাঙালীর ছেলেকে মেরেচে শুধু সেই নিহত ও হন্তারকের ভাগ্যফল গণনা করলে তো হবে না, ধরে নিতে হবে

যে, সমস্ত ইংরেজ জাতি ও বাঙালী জাতির ভাগ্যফলে এবং যেদিন প্রথম বন্দুক সৃষ্টি হয়েছিল সেইদিনকার নক্ষত্রগুলি পরস্পরের প্রতি যা ভঙ্গী করেছিল তারি গুণে ব্যাপারটা ঘটতে পেরেছিল। তা ছাড়া ভৃগুমুনি সব নক্ষত্র ও সব গ্রহ তাঁর হিসাবের মধ্যে আনেন নি— সম্ভবও নয় জানাও ছিল না। তারা কি বেকার বসে আছে? অতগুলো জ্বলন্ত দৃষ্টি হিন্দুসন্তানের ভাগ্যকে এড়িয়ে গেল কী করে? আর কেন? এসব জঞ্জাল নিয়ে মনকে হতবুদ্ধি অবসাদগ্রস্ত করে কী হবে!

আমি মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখেচি দেখে আমাকে প্রশ্ন করেচ আমি মৃত্যুকে ভয় করি কি না। সাধারণভাবে করি নে। জীবন আর মরণ তো একই সত্তার দুই দিক— চৈতন্যে ঘুম ও জাগরণ যেমন। অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা ঘুমের আবেশ এলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, মুখ আঁচড়ে' ছটফট করে' নিজেকে জাগিয়ে রাখতে চায়— তা দেখে বড়োরা উৎকণ্ঠিত হয় না। জানে যে ঘুম যদি না হয় তাহলে জাগরণটাই পীড়িত হয়ে ওঠে। মৃত্যুও তেমনি— যদি না আসত তাহলে নিরবচ্ছিন্ন প্রাণটাকে নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি করতে হোত। জীবনের সঙ্গে যেটা অবর্জ্জনীয়ভাবে যুক্ত তাকে সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করাই উচিত। মৃত্যু যদি জীবনের একান্ত বিলুপ্তিই হয় তাহলেও সেই ক্ষতিটা কার? যে মরেচে তার কিছুতেই লোকসান নেই। যখন বেঁচে আছি তখন তো মরি নি। আগেভাগে ভয় করে' ভাবনা করে' কী হবে? বিনষ্ট যদি হই তবে কোনো দুঃখ কোথাও রইল না, কোনোভাবে যদি বেঁচে থাকি তাহলে আজও যেমন

তখনো তেমনি— অর্থাৎ বেঁচে থাকার সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি প্রিয় অপ্রিয় এই মতোই আবর্ত্তিত হয়ে চলবে। বর্ত্তমান জীবনকে যদি তার সমস্ত দায় নিয়ে ছাড়তে অনিচ্ছা হয় তবে ঠিক তখনকার জীবনেও তেমনিই হবে। এই জীবনেই কতবার মরেচি ভেবে দেখ। শিশুকালে আমার দাইকে অসম্ভব ভালোবাসতুম। তখনকার যে জীবন সেটা তাকেই কেন্দ্র করে ছিল। এক ঘণ্টার মতো তার তিরোধানের কথা সেদিন বিনা অশ্রুপাতে প্রসন্নমনে চিন্তা করতে পারতুম না। কিন্তু সে আজ ছায়া হয়ে গেল, কোনো ব্যথার দাগ নেই। তার পরে অন্য কেন্দ্র নিয়ে যে জীবন সৃষ্ট হয়েচে সেটার দাম সমস্ত সুখদুঃখ নিয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অবশেষে এ সমস্ত গিয়েও জীবনান্তরে আর একটা সত্তা যখন জমে উঠবে তখন তাকে নিয়েই এত ব্যাপৃত হব যে গতস্য শোচনা বলে পদার্থই থাকবে না। অতএব মৃত্যু সম্বন্ধে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাই তো ভালো। কোনো কোনো বিশেষ আকারের মৃত্যু আমার অনভিপ্রেত। বাঘে আমাকে খাদ্যবস্তুরূপে গিলে গিলে খাবে এটা আমি পছন্দ করি নে। কিন্তু সেই না-পছন্দ জিনিষটা বাঘে খাওয়া,— মৃত্যু নয়। বস্তুত বাঘে খাওয়া উপসর্গটার মধ্যে মৃত্যুটাই সব চেয়ে বাঞ্ছনীয়। বছর পঞ্চাশ ধরে যদি বাঘেই খেত তাহলে প্রাণরক্ষার স্বস্ত্যয়ন করতে গ্রহাচার্য্যকে দক্ষিণা নিশ্চয়ই দিতুম না।

মীরা যদি তোমাকে পিসিমা বলে ফেলে তাহলে সে সম্বন্ধটা মানাবে না। অনেক দিন ধরে তুমি বহুতর দলিলপত্রে যে সম্বন্ধ পাকা করে ফেলেচ, আমার তরফেও যার কবুলতি পেয়েচ, মীরা

আজ সেটাকে অপ্রমাণ করতে পারবে না। মুখে সে যাই বলুক আসলে তারই হার হবে। আমিই হচ্চি আপিল কোর্টের জজ, তোমার দিকেই রায় দিলুম। ইতি ১৫ কার্ত্তিক ১৩৩৮

দাদা

৫৭

৫ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

তোমার পত্রে যে বাচিক ভোজ দিয়েচ সেটা উপাদেয় বলে মনে হোলো। তোমার মীরা মাসীর রান্নায় হাত আছে তাকে দিয়ে বাচিকটাকে কায়িক করে নেব। বহুকাল পূর্ব্বে একদিন নাটোরের মহারাজ পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা ছিল প্রতিদিন তাঁকে একটা কিছু সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ খাওয়াব। মীরার মা ছিলেন এই চক্রান্তের মধ্যে— তিনি খুব ভালো রাঁধতে পারতেন। কিন্তু নতুন খাদ্য উদ্ভাবনের ভার নিয়েছিলুম আমি। সেই সকল অপূর্ব্ব ভোজ্যের বিবরণসহ তালিকা আমার স্ত্রীর খাতায় ছিল। সেই খাতা আমার বড় মেয়ের হাতে পড়ে। এখন তারা দুজনেই অন্তর্হিত। আমার একটা মহৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হোলো। রূপকার রবীন্দ্রনাথের নাম টিঁকতেও পারে, সূপকার রবীন্দ্রনাথকে কেউ জানবে না।

তোমার চিঠির সঙ্গে এক টুক্‌রো রূপকথা পাঠিয়েছ। সম্পূর্ণ

করো না কেন? ছেলেদের পাঠ্য বই আমাদের দেশে নেই বললেই হয়। এই কাজে তুমি হাত দাও না কেন? যত পারো রূপকথা সংগ্রহ করে একখানা বই যদি বের করো, খুব কাজে লাগবে। আর্থিক দিক থেকেও তাতে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

আগামী ১০ই নবেম্বর তারিখে কলকাতায় যাব। চার পাঁচ দিন সেখানে কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাব। ইতি
৫ নবেম্বর ১৯৩১

দাদা

৫৮

৮ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়াসু

তোমার গ্রহ উপগ্রহের অপমানে তুমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছো। তুমি স্থির করেছো আমি হিন্দুধর্ম্মকেই অস্বীকার করতে বসেছি। মুস্কিল এই, আকাশে পাতালে যা-কিছু আছে সমস্তকেই যদি মানতে হয় তাহলে সমস্তকেই সম্মান করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। উপনিষদ বলেন "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" তোমরা উপনিষদকে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু বলে স্বীকার করো কি না জানি নে, আমি উপনিষদকে সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তি বলে মানি। উপনিষদে ঈশ্বরকে বলচেন বন্ধু, তাঁকেই বলচেন বিধানকর্ত্তা।

তোমরা যদি এক কাল্পনিক ভৃগুমুনির দোহাই দিয়ে বলো যে পঞ্চমস্থানে বৃহস্পতিই হচ্চেন বন্ধু, আর আকাশময় গ্রহতারা মিলে আমাদের ছোটো বড়ো ভালোমন্দ সমস্তই বিধান করচেন, তাহলে ঈশ্বরকে কী বলে মানব? আর যদি নাই মানি তাহলে অপরাধ হবে কোন্ যুক্তিতে? কেননা আমার না মানার হেতুই হচ্চে আমার কোষ্ঠীর আকাশে কোনো এক জায়গায় কেতু বসে আছেন তাঁরই প্রভাব। বহুদূর আকাশে কোনো একটা দুষ্ট চক্রান্ত অনিবার্য্যশক্তিতে আমার বুদ্ধিকে যদি বিপথে নিয়ে যায় তাকে যদি অপরাধ বলো, তাহলে ভূমিকম্পের ধাক্কায় কারো ঘাড়ের উপর পড়ে তাকে জখম করলে সেও হবে অপরাধ। হিন্দুধর্ম্ম যদি বলে অপরাধ বাইরেকার জিনিষ, এই জন্যেই তিথিনক্ষত্রের হিসাব মিলিয়ে বিশেষ মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণকে পেট ভরে খেতে দিলে বা গঙ্গাস্নান করলে চুরি ডাকাতি নরহত্যার পাপ নির্ম্মল হয়ে যাবে তবে এমন অনুশাসন আমি যদি অন্যায় বলেই বোধ করি, এমন কি একে যদি নাস্তিকতা বলি তাহলে আমার ধর্ম্মস্থানে যে গ্রহের দৃষ্টি আছে তাঁর প্রতি তাকিয়ে আমাকে ক্ষমা করতেই হবে। নাস্তিকতা কেন বলচি সেটা বুঝিয়ে বলি। অন্ন বস্ত্র ধন স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাইরের পদার্থকে বাইরের নিয়মে অর্জ্জন বা তার ত্রুটি দূর করতে হয়— সেই সব অমোঘ নিয়ম বিজ্ঞান শাস্ত্র আবিষ্কার করচে— এ সম্বন্ধে যতই আমাদের অজ্ঞান দূর হয় ততই আমরা সফলতা লাভ করি। তুমি বোধ হয় বইয়ে পড়েচ, যে, আমেরিকার কটিদেশ ছিন্ন করে যে খাল কাটা হয়েচে সেই খাল কাটবার চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ করে

দিয়েছিল সেখানকার নিদারুণ ম্যালেরিয়া। তার পরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও উদ্যমের সাহায্যে সেখান থেকে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে যত অধিবাসী আছে তাদের সকলের কুষ্ঠি থেকে ম্যালেরিয়াবিধায়ক কুটিল গ্রহ সরে দাঁড়িয়েচে। তার কারণ এই যে, ঈশ্বর আমাদের যে-বুদ্ধি দিয়েচেন তাকে স্বীকার করার দ্বারাই প্যানামা প্রদেশের ব্যাধি দূর হয়ে গেছে। অথচ আমাদের দেশে আমরা ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে মানিনে আমাদের আয়ত্তের অতীত গ্রহকে মানি ম্যালেরিয়াও নড়তে চায় না। যদি কখনো তুমি পাশ্চাত্য মহাদেশে যেতে তাহলে সেখানকার লোকদের দৈহিক মানসিক শক্তি স্বাস্থ্য সম্পদ দেখলে বিস্মিত হতে। তার প্রধান কারণ অন্ন বস্ত্র আরোগ্য সমস্তই তারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবন করচে, তারা গ্রহ-মুখাপেক্ষীদের উপরে জয়ী হচ্চে। বসন্ত প্রভৃতি অনেক মারীকেই তারা তাড়িয়েচে। এখনো ক্যান্সার ও যক্ষ্মার উপরে জোর খাটচে না— কিন্তু তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট আত্ম-বুদ্ধির পথে অধ্যবসায় চালনা করলে একদিন তারা ও দুটি রোগকেও আয়ত্তে আনতে পারবে। ইতিমধ্যে আমরা যে কেবল মঙ্গল গ্রহের দিকেই সভয়ে তাকিয়ে আছি তা নয় শীতলা আছেন, ওলাবিবি আছেন আরও কত কি আমার জানা নেই। বিধিদত্ত নিজের বুদ্ধিকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের ভয়ের আর অন্ত নেই। তারা মা শীতলাকেও ছাড়বে না ডাক্তারকেও না, গ্রহকেও মানবে এদিকে আপিসের বড়ো বাবুরও পায়ে তেল দেবে। এমন দেশে বিধাতার দান বুদ্ধিটাই কি যত অপরাধ

করলে ! সে ছাড়া আর সব কিছুর জন্যেই পুজো মিলবে ! এই তো গেল বাহ্যিক, ভৌতিক— মানুষের আর একটা দিক যেটা তার আন্তরিক তার আত্মিক— সেইখানে তার পাপ পুণ্য। সেই সব রিপুকেই আমরা পাপ বলি যাতে করে বিশ্বাত্মার সঙ্গে আমাদের জীবাত্মার সম্বন্ধ বিকৃত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুর দ্বারা আমরা নিজের অহংসীমার মধ্যে বদ্ধ হই। আত্মা তাতে আপন ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়। কেননা আত্মার ধর্ম্মই হচ্চে নিজের সত্যকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা। ভৌতিক জগতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন বিশ্বশক্তির সঙ্গে আমাদের শক্তিকে যোগযুক্ত করে, বিশ্বনিয়মের দ্বারা আমাদের সকল কর্ম্মকে নিয়মিত করে, খেয়ালের দ্বারা নয়, অন্ধ সংস্কারের দ্বারা নয়— তেমনি আমাদের অন্তরাত্মায় যে কল্যাণবৃত্তি আছে সে করুণার দ্বারা মৈত্রীর দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্মত লোকহিতৈষিতার দ্বারা আপনাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করে। স্বার্থ তখন পরমার্থে উত্তীর্ণ হয়— অর্থাৎ তখন সকলের হিতে নিজের হিত জানি। যে শুভবুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগ-সাধন হয়, উপনিষদে তারই জন্যে প্রার্থনা আছে— বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ— বিশ্বের আদিতে ও অন্তে যিনি পরিব্যাপ্ত তিনিই দেবতা,— স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু— তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত করুন। অশুভবুদ্ধি আমাদের অহংকে আশ্রয় করে— সে যে-সমস্ত পাপ ঘটায় সে তো গায়ে লেগে থাকে না, বাইরের অনুষ্ঠানে তাকে তাড়াবার কথা যখন মনে করি তখন গ্রহ মানি, পাণ্ডা মানি, পুরুৎ মানি,

অন্তর্যামীকে মানিনে, মানিনে তাঁকে যিনি "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ," যিনি "বিশ্বকর্ম্মা" যিনি "মহাত্মা" যিনি সর্ব্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। যে সাধনায় পাপের মূল ক্ষয় হয়, সে আত্মিক সত্যের সাধনা, শুভবুদ্ধির সাধনা। সেই সাধনায় আত্মাকে মানি, এবং সেই আত্মার আশ্রয় বিশ্বাত্মাকে মানি। সেই মানা থেকে ভ্রষ্ট করে আর যে-কোনো স্থূল পদার্থকে মানতে বলো তাকে আমি ধর্ম্ম বলিনে। তুমি যখন দেবতাকে ভক্তির কথা ভালোবাসার কথা বলো তখন সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু যখন তুমি বিচারের চেয়ে আচারকে, বুদ্ধির চেয়ে সংস্কারকে, পুরুষ-কারের চেয়ে গ্রহকে প্রাধান্য দিতে চাও, এবং দিয়ে বলো সেইটেই হিন্দুধর্ম্ম তখন মন অত্যন্ত পীড়িত হয়— একা তোমার জন্যে নয় এই শক্তিহীন বুদ্ধিহীন মোহাচ্ছন্ন দেশের জন্যে।

১০ই নবেম্বরে পাহাড় থেকে নামব বলেছিলুম। সে ঘটে উঠল না। ১৫ই তারিখে যাত্রার দিন স্থির হয়েচে। তার পরে দুই একদিনের বেশি কলকাতায় থাকা হবে না। ইতি ৮ নবেম্বর ১৯৩১

দাদা

১০. ১১. ১৯৩১

তোমার প্রথম জন্মদিন
এনেছে মর্ত্যের হাতে যে-প্রাণ নবীন,
চিরন্তন মানবের মহাসত্তা মাঝে
এলো কোন্ কাজে?
এক অসীম-কেন্দ্র ঘিরে
ফিরে ফিরে
মুহূর্তের দল অগণন
সৃষ্টির বিন্দুর রাশি করিয়া বহন
দিনরাতি
কী গাঁথনি তুলিতেছে গাঁথি
আলোয় ছায়ায়,
বিচিত্র বেদনাঘাতে কম্পিত কায়ায়,
রূপে রসে বর্ণে নৃত্যে গন্ধে গানে বেষ্টিত মায়ায়।

যে সূক্ষ্ম রয়েছে মাঝে, সেই সূক্ষ্ম জানে,
আকাশের যে সূক্ষ্ম ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহ্বানে,
উপকরণের স্থূল [illegible] কাঙাল প্রাণের,
~~[illegible]~~,
ইতি [illegible] তার বস্তু সম্ভারের,

৯॥৯

মরণের যে মুক্তি চাহে তারো,

সংসার যে মুক্তি নিত্য পথ খোঁজ করে কত আশা,

যে মুক্তি উদ্দেশহীন অজানার লাগি

অন্তরে গোপনে রয় জাগি'

সবে তারা মিলি' নিতি নিতি

নানা আবর্তন বেগে রচি' তোলে গহন-আকৃতি।

কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,

কতনা সংশয় তর্ক, কত না বিশ্বাস,

আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত না,

কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—

মন-গড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,

গড়ে দিয়ে ভেঙে দিয়ে খেলা,

অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত

জমিল অভ্যাসে পরিণত,

বাতাসে বাতাসে ভাসে [illegible] চেতনার আবেগ,

দেহহীন তর্জনী-নির্দেশ,

ইঙ্গিতের গূঢ় অভিরুচি

কত সূক্ষ্মমূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি',

কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত না আকাশযাত্রা কল্পনা-পক্ষ-ভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত তুচ্ছ আত্ম-বিড়ম্বনা,
কত জয়, কত পরাভব
ঐক্যবন্ধে গাঁথি এই সব
ভালোমন্দ আলোয় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।।

জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথনির কর্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,
আরব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ
তুমি-রূপে পুঞ্জ হয়ে, শেষে
কয় দিন পূর্ণ করি' কোথা গিয়ে মেশে
যে চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে, অকস্মাৎ হবে গতি-হারা,

সে কিসের লাগি, —
নিদ্রায় আছিল শূন্য, অপেক্ষা করিল।
বাহিরে ও অন্তরালে আকাশের টানি দিল সীমা,
গড়িল প্রতিমা।
অসংখ্য এ বৃত্তকায় উদ্ঘাটিছে মহা ইতিহাস, —
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস॥

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অনুক্ষণ সত্য-করে-জানা।
আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আমার সংসার বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অব্যক্তের বিন্দুর বিস্তারে
তাই নাম প্রকাশ অস্ফুটে,
অকস্মাতে শেষ হয় মৃত্যুর আঘাতে।
তোমার যে সম্ভাষণ
জাগাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে চিত্ত ভরিয়া
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।

তবে কেন পঙ্গু মূর্ছা, মৃত্যুর এ অন্তরের শোক।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন?
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি' উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়॥
শুধু প্রাণরক্ষা আর বংশরক্ষা কাজে
তোমার চিত্তের শক্তি সাঙ্গ হয় নাই আত্মমাঝে,
যে চাহিল তাকে
ছলি তারে ফাঁকি দিবে না কি।
সে চিত্ত অসীম পানে বাতায়ন দিয়েছিল খুলি,
প্রত্যহের আপনারে ভুলি'
বিশ্বের ঐশ্বর্যথালে
আপনার শ্রেষ্ঠদান ভরি দিয়াছিল কালে কালে।

অসীম প্রাণের মর্ত্য যবে এসেছিল কাছে
মর-প্রাণ তুচ্ছ করেছিলে আত্মদানে,
অর্থ তার কোথাও কি হবে না সমাধা,
মৃত্যু তারে দিবে বাধা,
ধূলায় হবে কি ধূলি
মহামূল্যগুলি।

জন্মদিনে এই বাণী
দিক্ তব চিত্তে আনি, —
— মর্ত্যের জরায়ু
অন্ধকারে রুদ্ধ করি লুপ্ত করিবে না তব আয়ু, —
অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রাণ —
এ গর্ভজন্মে তার নহে অবসান —
আরবার নবজন্ম লয়ে
পূর্ণতর উদয়ে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩৮

[১০ নভেম্বর '৩১]

দার্জিলিং। ১৫ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার চিঠি বোধ হয় যথাসময়ে তোমার পৌঁছয় না কেননা এখনো যে আমি দার্জ্জিলিঙে আছি সে খবরটা তোমার কাছে যেন ঝাপসা হয়ে আছে। এতদিন পরে এখানকার মেয়াদ ফুরোলো— আজ রওনা হয়ে কাল সোমবার প্রাতে কলকাতায় পৌঁছব। দু তিনদিনের বেশি থাকা সম্ভব হবে না।— লিখেচ সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভাতসঙ্গীত ছবি ও গান পড়চ। অঙ্কুর যদিও উদ্ভিদ জাতীয় তবু তাকে গাছ বলা চলে না, ঐ লেখাগুলিও তেমনি কাকুতি কিন্তু কাব্য নয়। ওতে এই অতি সহজ কথাটার প্রমাণ হয় যে এক সময়ে আমি বালক ছিলুম। অমৃতং বালভাষিতং বলে একটা কথা আছে— কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হলে সেই বালভাষিতকে কেউ রক্ষা করে না— করলেও সেই অমৃত ভদ্র লোকের পাতে দেবার যোগ্য থাকে না। ছবি ও গানে তুমি আমার ভাঙা ছন্দ দেখে হেসেচ— ভেবেচ ছেলেরা হাঁটতে গিয়ে যেমন পড়ে, ওর ছন্দঃপতনও তেমনি। ঠিক তা নয়— আমি আজন্মকাল বিদ্রোহী— বালকবয়সেও স্পর্দ্ধার সঙ্গে বাঁধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবি-লীলা সুরু করেচি— বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করি নে যদি ধরা না দেবারও স্বাধীনতা থাকে। ঘরে বাস করতে হয় বলেই যদি বাগানে বেরোলেই লোকে চারদিক থেকে তেড়ে আসে তাহলে সেটা তো হোলো

জেলখানা। বস্তুত কাব্যে দেয়াল-ছাঁদা ঘরও কবির, নির্দেয়াল বাগানও তার। আমার কবিতায় কোথাও কোথাও ছন্দের দেয়াল দেওয়া নেই বলে মনে কোরো না ইঁটের পাঁজা পোড়ে নি, মিস্ত্রির মজুরীর অভাব। ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯৩১

দাদা

৬০

[কলিকাতা। নভেম্বর ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কি করে তুমি আপনার কাছ থেকে আপনি দূরে গিয়ে শান্তি ও সার্থকতা পেতে পারো সে তো আমি বল্‌তে পারি নে। তোমার প্রকৃতি ও বাইরের অনুকূল প্রতিকূল নানা অবস্থায় তোমাকে একটা বিশেষভাবে গড়ে তুলেচে তারি ভিতর থেকে ধ্রুব আশ্রয় তোমাকে নিজেই বুঝি সৃষ্টি করতে হবে। তার কারণ তোমার স্বভাবের মধ্যে একটা প্রবল স্বকীয়তা আছে— সে যদি বাধাগ্রস্ত জীবনের পথকে নিজের সহজ প্রতিভার দিকে মুক্ত করতে পারে তাহলেই তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারো। তুমি স্ত্রীলোক, নানা শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাস সংস্কারে তোমাকে ঘিরেচে— তোমার আন্তরিক শক্তির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় নি— তাই কষ্ট পাচ্চ— অথচ তোমার আর কোনো গতি নেই। নূতন যে কোনো পথ খুঁজতে যাবে, খুঁজে পাবে না কষ্ট পাবে। যদি অবস্থা অনুকূল

হোত, যদি যথেষ্ট শিক্ষা ও চর্চ্চা থাকত তাহলে তুমি রচনায় আত্ম-প্রকাশে পূর্ণতা পেতে— সুযোগ হয় নি— এ দুঃখ কে মেটাবে? তোমার অন্তর্যামী, তোমার গুরু তোমাকে এই নিয়ত দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করুন— এই কামনা করা ছাড়া আর কি করতে পারি?

কাল সকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে যাব। তোমাকে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি নিশ্চয় জেনো।

দাদা

৬১

[শনিবার ২১ নভেম্বর ?, ১৯৩১]

কল্যাণীয়াসু

এক্ষণি শান্তিনিকেতনে যেতে হচ্চে। শনির কোপে আইস-ক্রিম মুখের কাছে এসে ফিরে গেল।

জ্যোতিষের বইগুলি পেলুম।

তোমার চিঠি পরে পড়্‌ব

সময় একটুও নেই

দাদা

৬২

[শান্তিনিকেতন] ২৪ নভেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি কি আমাকে বৈরাগী মনে করে বসে আছো? নানা রাগে নানা রসে আমার মন বিচিত্র। কিন্তু তা সম্ভবপর হোতো না যদি না আমি বাঁধনছাড়া হতুম। আকাশে মেঘে মেঘে, ঋতুতে ঋতুতে ফুলে পল্লবে রঙের রসের অন্তহীন খেলা— এই খেলা ভেঙে যেত যদি বাঁধনের জালে আট্‌কা পড়ত। বিশ্ব-ব্যাপারকে আমরা লীলা বলে জানি— সেই লীলার মানেই এই যে তার মধ্যে সবই আছে কিন্তু কিছুই বাঁধা নেই। রসের ঝরনা পূর্ণ থাকচে কেননা সে কোথাও বদ্ধ থাকচে না। কুমারসম্ভবে শুনি দৈত্যরা স্বর্গকে অধিকার করেছে। তার মানে, যে-আনন্দ ছিল মুক্ত তাকে তারা বন্দী করতে চেয়েছিল। তখন সেটা হয়ে গেল ভোগ—ভোগে ক্লান্তি, ভোগে ম্লানতা, ভোগ নিজেকে নিঃশেষ করে দেউলে হয়ে যায়। সেই জন্যেই মন বলে লোভ কোরো না। লোভে আমরা আপনাকেই বন্দী করি কিন্তু যা পাই তাকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁধতে পারি নে। তুমি নিশ্চয় জানো আজ জগৎ জুড়ে একটা আর্থিক দুর্গতি ঘনিয়ে উঠ্‌চে। বিষয়ী লোকেরা ব্যাকুল হয়ে তার কারণ খুঁজচে। তার কারণ এই যে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে আপন আপন সম্পদকে কড়াক্কড় করে আটে-ঘাটে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা— অর্থাৎ ধন কোনো একজায়গায় একান্ত বাঁধা থাকবে এটা বিশ্বনিয়মের

বিরুদ্ধ। রাশিয়ায় সোভিয়েট এ কথাটা বুঝেচে। তারা ব্যক্তিগত লোভের থেকে ধনকে মুক্ত করতে চায়। যদি পারে তাহলেই চঞ্চলা লক্ষ্মীকে তারা সত্য করে পাবে। বিষয়লুব্ধ দৈত্যরা লক্ষ্মীকে আপন ব্যাঙ্কের দুর্গে কড়া পাহারায় বন্দী করেছিল। তাই লক্ষ্মী আজ তাঁর অদৃশ্য রাস্তা দিয়ে পালাচ্চেন। জীবনের সব দুর্ম্মূল্য আনন্দই হচ্চে এই রকমের মুক্ত সম্পদ। তাকে বাঁধতে গেলেই নিজেকে বাঁধি। আমি তাই বলি মুক্তি মানে ত্যাগ নয় বৈরাগ্য নয়, আপন অনুরাগের হাতকড়ি খসিয়ে দেওয়া, তাকে নিরাসক্তির সিংহাসনে রাজা করা— তাকে পাওয়া কিন্তু ধরা নয়। আমার লেখা সম্বন্ধে আজকাল কেউ কেউ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে বলে তাতে প্যাশান্ নেই— অর্থাৎ প্রেম আছে কিন্তু তার শিকল নেই— ঝমঝমানি শুনতে পায় না বলে মনে করে বুঝি সব শূন্য, কিন্তু অনেক সময়েই আঁচলে বাঁধা সোনার গিরেটাই থাকে, সোনা পড়ে খসে। ইতি ২৪ নবেম্বর ১৯৩১

দাদা

৬৩

৩ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। তাতে তোমার নারীহৃদয়ের গভীরতম বেদনার স্পষ্ট পরিচয় পাই। বুঝতে পারি স্নেহ প্রেম ভক্তির আধার পাবার প্রয়োজন তোমাদের পক্ষে কত একান্ত প্রবল। যেখানে তোমাদের হৃদয়ের নৈবেদ্য পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে সার্থক হতে পারে, তোমাদের ত্যাগের শক্তি সমস্ত বাধা ভেদ করে উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রবাহিত হতে পারে তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাধনার পথ সেই অভিমুখেই। নারীর সেই আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা তোমার চিঠিতে অকৃত্রিম মাধুর্য্যে প্রকাশ পায়। বুঝতে পারি যে-বৈষ্ণবধর্ম্ম তোমাকে আকর্ষণ করেচে তুমিও তাকে আকর্ষণ করেচ— পৃথিবী যেমন, যত ছোটো হোক্, তবুও সূর্য্যকে টানে। তুমি অকারণেই সন্দেহ করো যে আমি হয়ত তোমার মনের ভাবটি ঠিক বুঝি নে। একটা কথা মনে রেখো আমরা সকলেই এক হিসাবে অর্দ্ধনারীশ্বর। কারো মধ্যে বা আধাআধি মিশোল, কারো মধ্যে বা ভাগের কমি বেশি আছে। একান্ত নারী এবং একান্ত পুরুষে যদি সংসার বিভক্ত হোত তাহলে তারা মিলতেই পারত না। তাই পরস্পরকে বুঝতে বাধে না, অথচ নিজের নিজের অধিকারের মধ্যে নিজের যে বিশেষত্ব তাকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। অর্থাৎ পুরুষের

প্রকৃতিতে পুরুষ মুখ্য, মেয়ে গৌণ, এবং মেয়েদের প্রকৃতিতে তার উল্টো, এইটেই সাধারণত হয়ে থাকে, না হলে সেটাতে সংসারের ওজন ঠিক থাকে না। মেয়েরা অজস্র স্নেহ প্রেম ভক্তি দিয়ে নিজেকে এবং নিজের সংসারকে পূর্ণ করে তুলবে এইটেই চাই, এইটে হোলো তার রসের দিক,— এর সঙ্গে তার শক্তির দিক আছে যে দিকে তার নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ত্যাগের দৃঢ়তা, যে-শক্তির দ্বারা সে আপন আশ্রয়কেও আশ্রয় দেয়, পালন করে, প্রতিষ্ঠিত রাখে, তার বিকারকে শোধন করে তার বেদনার আরোগ্য আনে, অর্থাৎ যাতে-করে সে নির্ভরের দ্বারা দুর্ব্বল করে না, চরিতার্থ করে। কিন্তু ঐ রসের ধর্ম্ম যদি পুরুষও আশ্রয় করে তাহলে নিজের উপরে পুরুষকে নারীভাব আরোপ করতে হয়, অর্থাৎ সেটা হয় তার স্বভাবের বিরুদ্ধ। পুরুষ নিজেরই স্বভাবকে প্রতিষ্ঠ করে তবেই সার্থকতা লাভ করে, উজানে গেলে দুর্ব্বল হয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় নিয়ে যায়। বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে বীর্য্য দিয়ে অপ্রতিহত অধ্যবসায় দিয়ে আমাদের সৃষ্টিকে কেবলি উৎকর্ষের দিকে নিয়ে চল্‌ব, সমস্ত বাধাকে পরাস্ত করব, প্রতিকূলতাকে ভাগ্যের অমোঘ লিখন বলে স্বীকার করে নেব না, এই হলেই সত্যকার পুরুষের দ্বারা সংসারে স্বাস্থ্য শান্তি সম্পদ আত্মসম্মান বজায় থাকতে পারে, এই হলেই মেয়েরাও নিরাপদ নির্ভর ও গৌরব লাভ করে। নইলে পুরুষরাও যেখানে রসের তরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়াকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে, — সেই পৌরুষবর্জ্জিত দেশ সকল দিক থেকে পরাভবের বন্যায় যায় ডুবে। সেই জন্যে তোমার চিঠিতে তোমার হৃদয়ের মাধুর্য্যে

আমি যতই পরিতৃপ্তি পাই না কেন আমার তরফে পুরুষোচিত যে বীর্য্যের আনন্দ, যে মুক্তির আদর্শ, যে সৃষ্টির তপস্যা, যে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রাণপণ বিদ্রোহ, যে আত্মত্যাগী কর্ম্মের কঠোরতা তার বিজয়বাণী না শুনিয়ে থাকতে পারি নে। বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে পুরুষও নারীর আদর্শে বিমুগ্ধ, সেই জন্যেই তার সৃষ্টিশক্তির এমন বিকার ঘটেছে— সেই জন্যেই কেবলি পরের কুৎসায় পরশ্রীকাতরতায় পরস্পরকে ব্যর্থ করচে, কোনো বড়ো কর্ম্মকে স্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে তুল্‌তে পারচে না— তাই তপস্যা ভঙ্গ করতে, সাধু চেষ্টাকে অশ্রদ্ধা করতে, আরব্ধ কর্ম্মকে ভেঙে ফেলতে, শ্রেষ্ঠতাকে অস্বীকার করতে, যে-কোনো উপলক্ষ্যেই একত্র হবামাত্র খুঁৎ ধরে, ছোটো ছোটো ছুতো নিয়ে, মিথ্যা বলে', অত্যুক্তি করে সব কিছু পণ্ড করে দিতে, অকথ্য ভাষায় কোঁদল করতে তার এমন একটা অস্বাভাবিক আনন্দ। চরিত্রের ভিত্তি দুর্ব্বল, মাটিতে অত্যন্ত বেশি রস, পাথুরে কঠিনতার অভাব— তাই আমাদের মিলনে আঁট নেই, অনুষ্ঠানে স্থায়িত্ব নেই, কেবলি তর্ক বিতর্ক দলাদলি, তালকে তিল ও তিলকে তাল করা।

গ্রহগণনায় জ্যোতির্ভূষণের কী দাবী আমাকে জানিয়ো, মিথ্যে জরিমানা দিয়ো না। জয়ন্তীর প্রবেশিকা তুমি যদি আমার কাছ থেকে দাবী করে নাও তবে আমি খুসি হব। তার বদলে তোমার কাছ থেকে আমি না হয় তোমাদের কোনো একটা উত্তরবঙ্গীয় সুক্তনি কিম্বা চাপড়ঘণ্ট কিম্বা শশা বা কুম্‌ড়োবীচির মিষ্টান্ন অথবা পৌষপার্ব্বণের পিঠের প্রত্যাশা জানাব। কিন্তু

অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে লঙ্কাদাহ উৎপাদন যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখো। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

দাদা

৬৪

[শান্তিনিকেতন *] ৪ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

খুচরো কাজের ভিড় প্রতিদিনই অত্যন্ত বেশি করে ঘনিয়ে আসচে। এ যেন রথের ভিড়ের মত— এক জনের সঙ্গে আর এক জনের সম্পর্ক নেই, অথচ ঠেসাঠেসিতে ফাঁক পাওয়া যায় না। আজ তোমাকে চিঠি লিখব না বলেই স্থির ছিল। কাল একটা চিঠি লিখেচি, অতএব কিছুদিনের ছুটির মেয়াদ দাবি করতে পারি। কিছুদিনের পূর্ব্বের পত্রে আভাস পেয়েচি পত্রোত্তরের বিলম্বে রাগ করবার অভ্যাসটুকু তোমার আছে। বোধ হচ্চে তোমাদের উত্তরবঙ্গীয় মেজাজ তোমাদের লঙ্কারসিত চাপড়ঘণ্টর মতোই ঝাঁঝালো। দক্ষিণ বঙ্গের পলিমাটিতে আমরা মানুষ, আমরা ভীতু স্বভাবের— একান্ত ভালোমানুষির সাহায্যেই আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি। "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর" এই পদ্ধতিটা অন্তত আজকের দিনে নিরাপদে অনুসরণ করতে পারতুম। কিন্তু তোমার চিঠিতে দেখলুম শ্রীপতি তার চিঠির জবাব আজও প্রত্যাশা করচে। যেদিন তার চিঠি পেয়েছি সেই দিনই উত্তরে তাকে জানিয়েছিলুম যে, তার রচিত

আইস্‌ক্রীম পেঁছিবার পূর্ব্বেই যে জোড়াসাঁকো থেকে অকস্মাৎ আমার তিরোভাব ঘটল নিশ্চিত এর মধ্যে মধুসূদনের হাত আছে। শ্রীপতি ম্লেচ্ছজনসেবিত উক্ত ভোজ্য পদার্থের রচনানৈপুণ্য নিয়ে দর্প প্রকাশ করেছিল, দর্পহারী আমাকে তাড়াতাড়ি তাই বিকেলের ট্রেণেই বোলপুরে রওনা করে দিলেন— অতএব এক্ষণে মধুসূদনের সঙ্গেই শ্রীপতি নিষ্পত্তি করে নিক্‌। চিঠি শ্রীপতি যদি না পেয়ে থাকে তাহলে পুলিসে হয়ত তার বদনাম আছে— চিঠি বিলুপ্তি আজকালকার দিনের ইতিহাসেরই একটা অঙ্গ।

কে বলে তুমি আমাকে ঘরের কথা লেখ? ঘরের লোক ছাড়া কাউকে ঘরের কথা লেখাই যায় না। আমি যে-ঘরকে কিছুই জানি নে সে ঘরে তো আমার দরোজা বন্ধ। তোমার ভাষা দিয়ে তৈরি ঘরে তো পর্দ্দা খাটানো নেই, তার ফোটোগ্রাফ নেওয়া যদি চল্‌ত তাহলে দেখতে ও একটা স্বতন্ত্র জিনিষ। কেননা ও ঘর তো আমিই মনে মনে তৈরি করে নিই, কোনো সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে ঠিকমতো ওর মিল হতেই পারে না। তুমি যে নামগুলি ব্যবহার কর সে তোমার চেনা, কিন্তু নামের পিছনকার রূপ তো আমারই তৈরি। তুমি ডাকঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে যা-খুসি গল্প বলে যেয়ো, তাতে কারো এতটুকু আব্রু নষ্ট হবে না — আমার মন খুসি হবে। চিঠিতে এরকম বকে যাওয়া একটা বিশেষ বিদ্যা, সবাই পারে না, তুমি পারো। সহজ কথা সহজে বলার শক্তি খুবই দুর্লভ। আপন ভাষা সকলের আপন আয়ত্তে নেই। ইতি ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

দাদা

[শান্তিনিকেতন *] ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাজের ঘূর্ণীপাকের টান অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে। কিছু দিনের মতো এবার তলিয়ে যাব। চিঠিপত্র লেখা অসম্ভব হবে আগে থাক্‌তে খবর দিয়ে রাখলুম। রাগ যদি করতেই হয় তবে কোনো একটা গ্রহের উপর কোরো, যে গ্রহ এমন করে আমাকে খাটিয়ে মারে।

তোমাদের পাড়াতেই দেখচি রাগের একটা সংক্রামক রোগ-বীজ আছে। শ্রীপতিকে লক্ষ্য করে কিছু পরিহাস করে-ছিলুম, ভেবেছিলুম সেও ঈষৎ হাস্য করবে— কিন্তু তুমি লিখেচ তার মন বিগ্‌ড়ে গেচে। এ ব্যাপারটাও দেখচি আর একটা কোনো গ্রহের দ্বারা সংঘটিত হয়েচে। সে গ্রহ বোধ করি আমার হাসি সইতে পারে না। শ্রীপতির চিঠিতে কলকাতা থেকে হঠাৎ তিরোভাবের অপরাধ আমি নিজে না নিয়ে মধুসূদনের উপর দোষারোপ করেছিলুম— নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল মধুসূদন ঠাট্টা বোঝেন অতএব তিনি অবিচলিত থাকবেন— কিন্তু শ্রীপতির দ্বারা তাঁর বিচলিত ভাবটা প্রকাশ হয়েচে। এবার থেকে মধুসূদনকে সাম্‌লিয়ে চলব— গম্ভীর হয়ে সাবধানে কথা কব। কিন্তু স্বভাব খারাপ, পণরক্ষা হবে না।

রাজার হাতে রাজদণ্ড আছে সেটা নির্ব্বিচার বিভীষিকা হয়ে উঠলে তাকে ঠেকাবার জন্যে প্রজার হাতেও একটা ঢাল না

থাকলে অত্যাচারের সীমা থাকে না। যে প্রজা অতিসহিষ্ণু, রাজাকে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট করে। সেই অন্যায়ের দায়িত্ব প্রজার নিজের দুর্ব্বলতায়। দুর্ব্বল নিজে দুঃখ পায় পাক্, কিন্তু দুর্ব্বলতা অপরাধ হয়ে ওঠে যখন সে সবলের চরিত্রকে বিকৃত করে দেয়। এই জন্যেই অন্যায়কে নিশ্চেষ্টভাবে সহ্য করাও অন্যায়। রাজার হাতে অস্ত্রের অন্ত নেই প্রজার হাতে একটিমাত্র প্রতিরোধের উপায় আছে সে হচ্চে বয়কট্। যদি অভ্যস্ত আরাম থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী এই বয়কট পদ্ধতির ভিতর দিয়ে অত্যাচারের প্রতি ধর্ম্ম-রাজের অপ্রসন্নতাকে প্রকাশ না করে তাহলে যে পর্য্যন্ত না দৈন্যে দুঃখে ম্যালেরিয়ায় পুলিশের গুঁতোয় সে ভবযন্ত্রণা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় ততদিন বিদেশের আমদানি মোটামোটা কানমলাই তার পুরুষানুক্রমে নিরবচ্ছিন্ন পথ্য। তাই, আমাদের শাসনকর্ত্তা-দের প্রতি লয়াল্‌টিবশতই তাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের উদ্দেশে আমি বয়কটের সমর্থন করি। রাজধর্ম্ম অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখ্‌তে সুরু করেচে— তার রচিত লাইনের মিল আমাদের লাইনে যদি জোগাতে পারি তাহলেই অমিত্রতা ঘুচে গিয়ে মিত্রাক্ষরের চলন হবে— কর্ণপীড়া বেঁচে যাবে। এই কর্ণপীড়নের উদ্যোগটা রাজার দিক থেকে বিরাট মাত্রায় ঘনিয়ে আসচে— ধর্ম্মের দোহাই মানবে না— মান্‌বে দুঃখের দোহাই। অতএব নিজেরা দুঃখ স্বীকার করেও যথাস্থানে দুঃখপ্রয়োগ করতে হবে। সব চেয়ে সাধুভাবে এ কাজ করবার উপায় হচ্চে বয়কট।—

সময় নেই। অতএব চল্‌লুম। ইতি ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১

দাদা

৬৬

কলিকাতা [ডিসেম্বর ?, ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার অন্তরের শুভকামনা গ্রহণ কর।

এইমাত্র কলকাতায় পৌঁছলুম। এতদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। ক্লান্তির বোঝা নিয়ে এসেচি। সামনে আছে আমার কবিমেধ— ভয়ে আছি।

দাদা

৬৭

[ডিসেম্বর ?, ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বড়ই ব্যস্ত। নানা আকারে অজস্র দক্ষিণা তোমাদের কাছ থেকে পাচ্চি। যতটা পারি আন্তরিক ভাবে আত্মসাৎ করচি। আমারও কিছু পাঠাই— সেও কিছু কিছু অন্তরের মধ্যে গ্রহণ কোরো।

তোমার পিসিমা জ্যাঠাইমাকে জানিয়ো— কত তৃপ্তি পেয়েছি। কোনো একদিন সাক্ষাৎ যদি হয় মুখে জানাব।

দাদা

৬৮

[ডিসেম্বর ?, ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার ব্যাকুলতায় আমাকে বড়ো ব্যথা দেয়। তোমাকে ক্ষমা করব না কেন? কোনো অপরাধ তোমার মধ্যে নেই। তোমাকে আমি গভীরভাবেই স্নেহ করি— সেই স্নেহে আঘাত কখনোই পাই নে। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে যদি পারতুম খুসি হতুম— কি করতে পারি বলো। বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা দিয়েচ— এই তোমার দান আমার মনে বড়ো বাজচে। তুমি একটুও কষ্ট করে নিজেকে বঞ্চিত করে আমাকে কিছু দাও এ কি আমার ভালো লাগে? তোমার ত্যাগের ইচ্ছাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ফিরে পাঠিয়ে তোমাকে আঘাত করতে চাই নে। কিন্তু আর একদিন এসে তুমি আপনিই ফিরে নিয়ে যেয়ো।

দাদা

৬৯

৬ জানুয়ারি ১৯৩২

কল্যাণীয়াসু

ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত। এ কয়দিনের সম্মানের অভিঘাতে অভিভূত।

তুমি গৃহের ও সম্প্রদায়ের কঠোর বন্ধনে শৃঙ্খলিত। এ রকম

বন্দিদশা আমার অভিজ্ঞতার বাহিরে। কৃত্রিম ও সঙ্কীর্ণ নিয়মের নাগপাশে মানবাত্মাকে এমন করে সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করাকে আমি অধর্ম্ম বলেই জানি। এ বন্ধনকে তুমি যখন নিজেই স্বীকার করে নিয়েছ, এ'কেই তুমি যখন মুক্তি বলে কল্পনা কর তখন উপায় নেই। এ অবস্থায় বন্ধনে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেওয়াতেই তুমি আরাম পাবে। যতক্ষণ বাইরে থাকবে ততক্ষণ দ্বিধার টানাটানিতে তোমাকে বেশি দুঃখ দেবে।

আমার প্রকৃতি অত্যন্ত নিরাসক্ত। আমার মধ্যে স্নেহ প্রেম ভক্তির প্রবলতা নেই তা নয় কিন্তু তা আমাকে বাঁধে না। আমার নেশা নেই। সমস্তই আমি সহজে স্বীকার করি। আমাকে কিছুতে ক্ষুব্ধ করবে এমন কথা তুমি কখনোই মনে কোরো না। আমি নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র। আমি যাকে যা দিই তার থেকে নিজের জন্য কোনো অংশ ফিরিয়ে নিই নে। কিছুতে তোমাকে আমি ভুল বুঝব এমন আশঙ্কা নেই। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯৩২

দাদা

৭০

[জানুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার স্নেহমধুর ভক্তি আমার অন্তঃকরণকে স্নিগ্ধ করে। হৃদয়ের এই মাধুর্য্যই তো সেবা— কর্ম্মের সেবা এরই অনুবর্ত্তী-মাত্র— সেই প্রত্যক্ষ সেবা না হলেও চলে। তুমি দূরে থাক বা

নিকটে থাক, পত্র লেখ বা না লেখ তাতে তোমার পরে আমার স্নেহ বা বিশ্বাস ক্ষীণ হবে না এ কথা নিশ্চিত জেনো। অকারণ সংশয়ে তুমি নিজেকে পীড়া দিয়ো না।

কিছুকাল ডাকঘরের আয়বৃদ্ধি করব না— যদি চিঠি লিখি সে পোস্ট্‌কার্ডে। দুর্গ্রহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ইতি

দাদা

৭১

[জানুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর এখনো দুর্ব্বল।

তোমার সমস্ত অন্তরের তৃপ্তি দেবার মতো আমার শক্তি নেই— যদি থাকত খুসি হতুম। তুমি যে-সুধার পিয়াসী সে সুধা তোমার স্মৃতিতেই রয়েছে— আর কোথাও পাবে না। বর্ত্তমানের সঙ্গে তোমার অতীতের দ্বন্দ্ব বেধে গিয়ে তোমাকে এত কষ্ট দিচ্চে।

মহাত্মাজির পত্র পেয়েছি। মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

দাদা

৭২

[জানুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ পোষ্ট আপিস

Khardah

কল্যাণীয়াসু

মিষ্টান্ন পেয়ে পরিতুষ্ট হলুম। গঙ্গাতীরে আশ্রয় নিয়েছি। নির্জ্জনে শান্তিতে আছি। বোধ হয় শরীরও সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে— যদিও বল পাওয়ার আশা রাখি নে। ইতি

দাদা

৭৩

২১ জানুয়ারি ১৯৩২

ওঁ খড়দহ

কল্যাণীয়াসু

চুপচাপ করে আছি এখানে। জায়গাটি ভালো, বাড়িটি মস্ত— ভূতের বসতি বলে অপবাদ আছে।— সেই ভূত আমাদের উপকার করেছে— বাড়ির ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া সে যে আমাদের সহবাসী এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জ্যোতি বাচস্পতি কৃত আমার বর্ষফল পাওয়া গেছে। তাকে পারিশ্রমিক পাঁচ টাকা দিতে বলেছিলে— পাঠিয়ে দেব।

যথাসম্ভব সমস্ত কর্ম্ম থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে আলস্যচর্চ্চা করচি। প্রয়োজন ছিল। মনের শক্তি ম্লান হয়ে এসেচে—

তাই কর্ম্মে রুচি নেই। কিন্তু সংসারের দাবী কমে নি। দূরাগত আগন্তুকেরও দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সম্পাদকদেরও দর্শন মেলে।

মনে তুমি শান্তি ও শক্তি পাও এই আমি একান্তমনে কামনা করি। ইতি ২১ জানুয়ারি ১৯৩২

দাদা

বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো

৭৪

[খড়দহ] ২৩ জানুয়ারি ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মিষ্টান্ন পেয়েছি— সকলে মিলে তার সমাদর চল্‌চে।

তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। সঞ্চয়িতা এখনো বেরোলো না— ভুল সংশোধন করতে গিয়ে দেরি হোলো— বেরোলে একখানা পাঠিয়ে দেব— কোন্ ঠিকানায় পাঠাতে হবে জানিয়ে দিয়ো।

সকল রকম কর্ম্মবিমুখ চিত্ত নিয়ে একটা লম্বা চৌকিতে পড়ে দিন কাটাই। গঙ্গার ধারের দিকে প্রশস্ত একটা বারান্দা আছে সকাল বেলাটা সেইখানে আমার আশ্রয়। পশ্চিমতীরে বাড়ি বলে রৌদ্র ক্রমে প্রখর হয়ে আক্রমণ করে— তখন ঘরে ঢুক্‌তে হয়। শুয়ে শুয়ে কখনো কখনো আপন মনে কবিতা

লিখি। গদ্য লেখার মতো শক্তি ও উৎসাহ নেই। লোক যে একেবারে আসে না তা নয়-- কলকাতা থেকে দর্শনার্থীর সমাগম হয়— তা ছাড়া প্রতিবেশীও আছে।

সন্ধ্যাবেলায় বাতাস নিস্তব্ধ হয়, তখন মশকের পালা। কলকাতার কীটগুলোর চেয়ে তাদের ক্ষুধা ও অধ্যবসায় বেশি— বোধ হয় গঙ্গার হাওয়ায়।

তোমার খাদ্যবাহন পাত্রটাকে ফিরে পাঠাচ্চি। ইতি ২৩ জানুয়ারি ১৯৩২

দাদা

৭৫

[খড়দহ] ২৪-২৫ জানুয়ারি ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার প্রেরিত মিষ্টান্ন পেয়েছি এবং সম্ভোগ করচি।

তুমি আমার ব্যবহার-করা পাদুকা চেয়েছ— মনে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ হয়েচে তবু পাঠাই। ইতি ১০ মাঘ ১৩৩৮

দাদা

যদি খড়দহে তোমাদের তীর্থ সন্দর্শনে আসতে পার ত খুসি হব। এখানে গঙ্গার ধারে আমার এই বাসাখানি নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। কাল বিমল এসেছিলেন— কিন্তু ঠিক সেই

সময়ে খুব ভিড় জমে গেল। তোমাদেরই আত্মীয় সুসঙ্গের সুহৃদ ও তাঁর স্ত্রী তা ছাড়া অমল ও তার পরিজনবর্গ এসে উপস্থিত। বউমা ছিলেন না। এই গোলেমালে বিমলের সঙ্গে কথা কওয়ার সুবিধা হোলো না। এখানে রাস্তা এত ভালো যে টায়ার ফাটার আশঙ্কা নেই। আমরা থাকি ঠিক শ্যামসুন্দর ঘাটের পাশেই।

আজ মাঘোৎসবে জোড়াসাঁকোয় যাচ্চি। ফিরতে হয় তো রাত হবে।

যদি সুবিধা হয় তো এসো— এখানে চারিদিক শ্যামল, নির্ম্মল আকাশ ও অনাবিল সহজ অবকাশ। ১১ মাঘ ১৩৩৮

দাদা

৭৬

[খড়দহ। জানুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ বৃহস্পতিবার

কল্যাণীয়াসু

আগামী কাল শান্তিনিকেতনে যাবার ব্যবস্থা করচি। অল্প কয়দিনের জন্যে। যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব। এখানে শরীর ভালো থাকে। তার পরে যদি কোনো একদিন এখানে আসা সহজে সম্ভবপর হয় তবে চেষ্টা কোরো।

দাদা

৭৭

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

গত সোমবারে বোলপুরে যাবার কথা ছিল। বাধা পড়ে গেল। বুধবারে যাব।

এতদিন তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করেচি। কিন্তু আমি যে জাতে তার্কিক নই দলিলসমেত তার প্রমাণ করে দেবার জন্যে সঞ্চয়িতা এক খণ্ড তোমার কাছে পাঠালুম। সংসারে তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন আছে, যেমন এই ধরাধামে পদক্ষেপ করে না চল্‌লে চলে না। কিন্তু মানুষের পিঠে পাখা নেই বটে মনে আছে। সে ওড়ার সুখেই উড়তে চায় অর্থাৎ সে প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। কবিতায় যে সঙ্গীত আছে, তার মধ্যেই আছে মুক্তিআকাশে পক্ষচালনের ছন্দ। সঙ্গীতের সুরে অর্থ-শাস্ত্রের সমস্যা আলোচন ও সমাধান করা চাই এমন কথা আজ-কাল কেউ কেউ বলে থাকেন। তাঁরা লোকহিতৈষী, তাঁদের কাছে সঙ্গীতটা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। ধর্ম্মোপদেষ্টা যখন মুক্তির কথা বলেন তখন তিনি বন্ধন ছেদনের পরামর্শ দেন— কিন্তু কাব্যে বন্ধনকেই অবন্ধিত করে— রূপকে ত্যাগ করে না, তার অরূপতাকে উদ্ভাবিত করে। সুন্দরের বাঁশির সুরে টানে বিশ্বের দিকে, কিন্তু টেনে বাঁধে না— টেনে নিয়ে চলে অসীমে, ক্ষণিকের দীনতা থেকে অনির্ব্বচনীয়ের পূর্ণতায়। তখন অপরূপকে ভালো-বাসি, নিজেকেই ভালবাসবার নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ পাই।

বদ্ধপ্রাচীর ঘরের চারিদিকে যেমন বাগান, সাহিত্য তেমনি সংসারক্ষেত্রের সংলগ্ন করেই আনন্দের মুক্তিক্ষেত্র রচনা করে। যে পরিমাণে তা সত্য হয় সেই পরিমাণেই সাহিত্যের নিত্যতা।

আজ আর সময় নেই। ইতি ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

দাদা

৭৮

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

যে বেদনায় এত করে তোমাকে অশান্ত করচে তোমার চিঠিতে তার প্রকাশ দেখে আমি ব্যথা পাই। তুমি বাতাসের সঙ্গে লড়াই করচ, তুমি নিজের হাতে গ্রন্থি রচনা করে তাই নিয়ে নিরন্তর টানাটানি করতে প্রবৃত্ত। স্বভাবের মধ্যে নিজে দ্বিধা ঘটিয়ে একটা দারুণ আবর্ত্ত সৃষ্টি করেচ। সহজ হও, প্রকৃতির সহজধারাকে যদি জবরদস্তি করে অবরুদ্ধ না করো তা হলে সে আপনিই আপন সমুদ্রপথ খুঁজে নেবে। মাটির বাধায় নদীর যাত্রাপথ বেঁকে বেঁকে যায় কিন্তু সে যদি পথের ভয়ে চলা বন্ধ না করে তাহলে তার স্রোতের প্রেরণা তাকে চরমেরই দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই চরম সম্বন্ধে যদি একটা কাল্পনিক ভূগোল-বৃত্তান্ত খাড়া করে তোলো তাহলে খাল-খোঁড়াখুড়ির আর অন্ত থাকে না, তাহলে বাহিরের বাঁধা দস্তুরের অবরোধে তোমার

আত্মপ্রকাশ পীড়িত হতে থাকবে। ভুবন ভরে আছে সৌন্দর্য্যসুধা, জীবনের মূলে আছে অমৃতরস, নানা কৃত্রিমতার ধাক্কার মধ্যে পড়ে আমরা যা পেয়েছি তাকেই পাই নে। যিনি আপন সৃষ্টিতে আনন্দরূপ বিস্তার করেচেন তাঁকে সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করো ; কেন কেবলি ভাব তিনি জেলখানার কর্ত্তা, তাঁর অর্ডিনান্সের কালো উর্দ্দি-পরা পেয়াদাগুলো তোমার খুঁৎ ধরবার জন্যে কেবলি উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্চে। যে দেবতার রাজত্বে এত ভয়, এত সংশয়, যিনি মানুষের আত্মপীড়ন দিয়েই নিজের ট্যাক্‌সো আদায় করেন, যিনি ভোজের পূরো আয়োজন সাম্‌নে রেখে পিছন থেকে সেটা হরণ করতে কথায় কথায় শাস্ত্রবুলির দোহাই দিয়ে হাত বাড়ান তাঁর সম্বন্ধে আন্‌সিভিল ডিসোবীডিয়ান্সই তো বিধি। পৃথিবী জুড়ে তাঁর ভক্তদের হৃৎকম্প আর থাম্‌তে চায় না— তাদের এ রাস্তা বন্ধ, ও রাস্তা বন্ধ, এখানে অশুচিতা, ওখানে নিষেধ। এমন জগতে হতভাগাদের হাতকড়া দিয়ে বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে চাবুকের ব্যবস্থা করে সৃষ্টিকর্ত্তার এ কী নিষ্ঠুর খেলা! ইংরাজের দেশে ধনী লোকেরা একটা করে অরণ্য নিজের অধিকারে রাখে সেখানে সেই সীমানার মধ্যে বন্যজন্তু ছাড়া থাকে— তাদের আহার বিহারের বাধা নেই। সাধারণ লোকেরা তাদের শিকার করলে দণ্ড পায়, কারণ সেটা অবৈধ। কর্ত্তা তাদের স্বয়ং শিকার করবেন বলেই তাদের পালন করেন। আমরা কি সেই রকম শিকারের পশু। দেবতা অর্থহীন বিধিনিষেধে জর্জ্জর করে মারলে দোষ নেই— অথচ সে রকম নিষ্ঠুরতা মানুষ যদি করে তবে সেটা অবৈধ হয়। তাই যখন দেবতার নামে মানুষ নিজেকে

বঞ্চিত করে, শেলে শূলে বেঁধে, উপবাসে ক্লিষ্ট করে অকারণ বাধায় জীবনের পথ সঙ্কীর্ণ করে তখন তাঁর নামে কত বড় অপবাদ দেয় তা বুঝতেও পারে না, অথচ সেই অত্যাচার মানুষের পক্ষে কলঙ্ক। যে দেবতা বুদ্ধির দোহাই মানেন না দয়ার দোহাইও না তাঁকে যে মানুষ ভয়ে ভয়ে মানে সে নিজেকে অমানুষ করে। সে দেবতা নেই, মানুষই নিজের প্রবৃত্তিকে মুখোষ পরিয়ে দেবতা তৈরি করেচে, তার পরে মানুষই মরে তার হাতে। আমি বোধ হয় ১৫ই তারিখে কলকাতায় যাব— থাকব এবার চৌরঙ্গি আর্ট স্কুলে, প্রিন্সিপাল মুকুলচন্দ্র দের আতিথ্যে। ইতি ২৯ মাঘ ১৩৩৮

দাদা

৭৯

[২৮ চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা]

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

কল্যাণীয়াসু

ছবির একজিবিশনে চৌরঙ্গী আর্ট স্কুলেই আছি। শরীর দুর্ব্বল আছে। শ্রীমান বিমলাকান্তকে যদি এখানে পাঠাতে পার খুসি হব— সে আমার ছবিও দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে বাসন্তীর আসা যদি সম্ভব হতে পারে তাহলে কথাই নেই। ইতি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

দাদা

৮০

[কলিকাতা। ফেব্রুয়ারি ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আগামী শনিবারে বেলা দুটো তিনটে থেকে সন্ধ্যা আটটা নটা পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোয় থাকব। ইতিমধ্যে ছবির তদারকে আমাকে এখানে থাকতে হচ্চে। এ জায়গাটি খুব সুন্দর— একটি বড়ো পুকুর, বড়ো বড়ো গাছ, চাঁপা ফুলের গন্ধ, আর নিরন্তর পাখীর ডাকে কলকাতার সমস্ত অপরাধ চাপা দিয়ে রেখেচে। সহরের পাথুরে রাস্তা বেয়ে এইখানে এসে বসন্ত ঋতু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেচে, আমিও ঋতুরাজের সহচর। ইতি

দাদা

৮১

[শান্তিনিকেতন *] ১৪ মার্চ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দিনের অনেকটা অংশ ব্যস্ত থাকি বাকি অংশ থাকি ক্লান্ত। তাই চিঠি লেখা ঘটে না। আজকাল ডাকঘরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় বন্ধ। নিজের পদবীগুলোকে মনেও রাখি নে, অন্য কেউ রাখে এমন ইচ্ছাও হয় না। ভারমুক্ত মনে সহজ চালে চল্‌তে ইচ্ছা করি। উপাধির বোঝা নিয়ে সর্ব্বত্র প্রবেশ চলে না।

আমি কবি, সেই জোরে সকলের বন্ধু, সকলের সমক্ষেত্রে আমার বিচরণ।— পারস্যে রওনা হব ৪ এপ্রেলে। এখান থেকে বেরোব মার্চ মাসের শেষ দিকে। দিন সাত আট কলকাতা অঞ্চলে অবস্থিতি। সম্ভবত খড়দহে। ইতি ৩০ ফাল্গুন[১] ১৩৩৮

দাদা

৮২

[মার্চ-এপ্রিল ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

পারস্যের পথে কলকাতায় এসেচি। হয় তো কাল পরশুর মধ্যেই কয়েক দিনের জন্যে খড়দহে গিয়ে আশ্রয় নেব। যদি দেখা করতে আসার বাধা না থাকে এসো কিন্তু নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। একটা কথা নিশ্চয় মনে রেখো মানুষকে আমি সহজ ভাবে বুঝি, সেই জন্যে আমি কোনো কারণেই অবিচার করি নে। দুঃখ দেখলে দুঃখ পাই কিন্তু কৃত্রিম আইন মিলিয়ে অপরাধী করি নে। ইতি বুধবার

দাদা

১ বস্তুতঃ ১ চৈত্র। ২৯ দিনে ফাল্গুন সমাপ্ত।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি উদ্বেগ আশঙ্কার জালে নিজেকে অত্যন্ত বিজড়িত করে সর্ব্বদাই পীড়িত হয়ে আছ। ভয় যার নিজের মধ্যেই বাইরে সে ভয়কে সৃষ্টি করে। এমন করে আত্মপীড়নের কারান্ধকারে তুমি কেমন করে বাঁচবে। এমন কি ধর্ম্মের নামে যারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করা কর্ত্তব্য মনে করে এবং সেই কর্ত্তব্যকল্পনার দ্বারা বিধাতাকেই খর্ব্ব করতে কুণ্ঠিত হয় না তাদের কাছেও তুমি সঙ্কুচিত। কেন তুমি তোমার মনুষ্যত্বের অধিকারের উপর দৃঢ় হয়ে সগৌরবে দাঁড়াতে পার না ?

আমি পরশু সোমবার প্রত্যুষে আকাশপথে যাত্রা করব— চেষ্টা করব এক মাসের মধ্যে যাতে ফেরা হয়। নিশ্চিত বলতে পারি নে।

বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো আর বিমলাকে।

... ...সুহৃদ শ্রেণীভুক্ত করে জানি নে। এই জন্যে তাঁকে স্বাক্ষরিত করে আমার বই উপহার দেওয়া চলবে না। জনতা থেকে সরবার দিন আমার এসেচে— জনতা আর বৃথা বাড়াতে ইচ্ছে করি নে। তোমার ছেলে মেয়ে ছাড়া তোমার অন্য সুহৃদ্বর্গকে স্বীকার করে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। আমার শঙ্কা হয় তারা তোমার ক্ষতি করতেও পারে। ইতি ৯ এপ্রেল ১৯৩২

দাদা

৮৪

[৩ জুন ১৯৩২]

ওঁ

শ্রীপতির চিঠি পেয়েছি·—
বোলো আর একটু সুস্থ হয়ে
খবর নেব।

কল্যাণীয়াসু

বিদেশ থেকে সম্মান নিয়ে এসেছি। দেশে এসে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরল। দুর্ব্বলতায় ভারাক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছি---নীলরতন বাবু দেখচেন। তোমার চিঠি ও আম পেয়ে খুসি হয়েছি। তোমার মন যে পন্থায় চিরাভ্যস্ত, সেই পন্থায় তুমি শান্তি ও স্থিতি লাভ করো এই আমি কামনা করি। আমি যে পন্থায় দাঁড়িয়েছি সে পন্থায় সুখশান্তি খোঁজবার অবকাশ আমার নেই, শেষ পর্য্যন্ত হুকুম মেনে চল্‌তে হবে। আমার জন্যে না আছে ঘরের কোণ, না আছে স্বজনের সেবা, আমাকে ঘুরতে হবে সর্ব্বজনের জনতায়। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ [১৩৩৯]

দাদা

ও পৃষ্ঠা বাসন্তীর জন্যে —

৮৫

[খড়দহ *] ৭ জুন ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল বৃহস্পতিবার সকালে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করব। সেখানে আশা করচি সুস্থ হতে পারব। অনেক কাজ এবং অনেক চিন্তার বিষয় জমেচে, নিষ্কৃতি পেতে দেরি হবে। অমিয় এখনো এসে পৌঁছন নি সেই জন্যে আমার কর্ম্মের বোঝা কিছুদিন পর্য্যন্ত যথেষ্ট ভারি হয়ে থাকবে। ইতি ৭ জুন ১৯৩২

দাদা

৮৬

[শান্তিনিকেতন * ১০ জুন ১৯৩২]

১১ জুন ১৯৩২ ?

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার বিশ্বাস আমার সব চিঠি তোমার হাতে পৌঁছয় নি। তখন চিঠিগুলির নকল রেখেছিল ধীরেন সেন। তাই অবলম্বন করে প্রবাসীতে পত্রধারা বেরিয়েচে— তুমি কোন্‌গুলি পাও নি তা আমি জানিও নে। এখানে ঘন ঘোর মেঘ, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও চলেছে— জয়দেবের দেশে মেঘমেদুর বর্ষাকাল রমণীয়। এখানে এসে শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। এখনো গ্রীষ্মের ছুটি ফুরোয় নি তাই কিছু পরিমাণে বিশ্রামের অবকাশ আছে।

কিন্তু পারস্যভ্রমণ লেখায় সেই অবকাশটুকু সম্পূর্ণ হরণ করেছে। আজকাল লিখ্‌তে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়। সমস্ত পৃথিবী-জোড়া দুঃসময়ের ছায়া আমাদের সকলেরই ভাগ্যকে নিরালোক করে তুল্‌চে— তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু অন্তরাত্মা তো আমাদের নিজের হাতে। বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ [১৩৩৯]

দাদা

৮৭

২২ জুলাই ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। দুরবস্থাগ্রস্ত শরীর মন নিয়ে কর্ম্মসংক্ষেপ করবার চেষ্টা করি কিন্তু কর্ম্ম বেড়েই চলে।

চিঠিতে তুমি যে আশ্রমের বর্ণনা করেছ তার মধ্যে রসের যে উদ্ভাবনা আছে আমার কল্পনাকে তা যে স্পর্শ করে না এমন কথা মনে কোরো না। কিন্তু মানবসংসারের সমস্ত দায়িত্বকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখে বুদ্ধিবৃত্তিকে অন্ধ করে নিরন্তর ভাবরস-সম্ভোগে আত্মবিস্মৃত হওয়ার মধ্যে যতই সুখ বা শান্তি থাক, তাকে আমি কোনোমতেই শ্রেয় বলে মনে করতে পারি নে। এই ধর্ম্মবিলাসিতায় আমাদের দেশকে মর্ম্মে মর্ম্মে মেরেছে। সম্প্রতি নবজাগ্রত পারস্য ও আরব্যকে দেখে এসেছি, পূর্ব্বে

দেখেছি জাপানকে, তারা ধর্ম্মমোহ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই রাষ্ট্রীয় মুক্তি পাবার অধিকারী হয়েছে— হতভাগ্য ভারতবর্ষ এই মোহের কুহেলিকায় আবৃত— সে অন্ধ, সে পঙ্গু, সে আপনার দেবতাকে নিয়ে খেলা করচে সেই অপরাধে দেবতা তাকে সকল প্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করচেন অপমানের আর অন্ত নেই। তবু কর্ত্তব্যবিমুখ মূঢ় ভক্তি নিয়ে ঠাকুরঘরের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাকেই যারা পরমার্থ বলে জানে— তারা যে কত বড়ো অকৃতার্থ তা বোঝবার শক্তিও তাদের নেই কেননা তারা ভাবমদে অপ্রকৃতিস্থ।

কঠিন দুঃখের দিন এসেছে কিন্তু নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাই নে— কণ্টকিত পথের উপর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজের লক্ষ্য অভিমুখে চল্‌তে হবে। এক এক সময়ে ক্লান্তি আসে, তখন পালাতে ইচ্ছা করে যেমন করে একদিন ইস্কুল পালাতুম। তখন আবার ধিক্কার আসে মনে, লজ্জা পাই। ইস্কুলমাস্টার তো নেই, নিজেকেই নিজে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিই। অতএব ফাঁকি দেব কাকে, পশ্চাতে নিজের চৌকিদার নিজেই আছি। মনকে এক একবার বোঝাতে চাই, কর্ম্ম আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে কাব্য। কিন্তু মন যে বোকা নয়, তাকে কথায় ভোলানো শক্ত। অতএব শেষ পর্য্যন্তই আছে খাটুনি। চিঠি বেশি লিখব এমন আশঙ্কা কোরো না— তুমিও তো নিষ্কৃতি নিয়েছ। ইতি ৬ শ্রাবণ ১৩৩৯

দাদা

৮৮

২৮ জুলাই ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ভারতবর্ষে দ্রাবিড়জাতীয়দের সমাজ মাতৃতন্ত্র, অর্থাৎ সে সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য। এটা যে হতে পেরেছে তার প্রধান কারণ, তাদের ভাবপ্রবল স্বভাব। সর্ব্বদা ভাবরসে তাদের মন আর্দ্র। যাদের এই রকমের প্রকৃতি নিজের মধ্যে এই ভাবরসকে উদ্বেল করে তোলাই তাদের ধর্ম্মসাধনার চরম লক্ষ্য। তারা আপন হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থতা দেবার জন্যেই নিজের দেবতাকে ব্যবহার করে। এই রসোন্মত্ততায় বিশ্বসংসারকে ভূলে থাকাকেই তারা ধার্ম্মিকতা বলে মনে করে। এই পানগোষ্ঠীর বাইরে তাদের পক্ষে সমস্তই অশুচি, সমস্তই পরিত্যাজ্য। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন তৈরি হয়েছিল, এ ভুল করেছিল কে? ভোজ্যআয়োজনে নিরন্তর ব্যাপৃত, ধূপে দীপে মাল্যে মণ্ডিত, কীর্ত্তনে ভজনে নিত্য মুখরিত, আত্মবিস্মৃত এই এক একটি সঙ্কীর্ণ রসমণ্ডলীর বাইরে যে বিপুল সংসার পড়ে আছে, ভক্তিভাবাকুলদের পক্ষে সেখানে যেন দেবতার অরাজকতা,— সেখানে বিশ্ববিধাতার কোনো দাবী নেই, কোনো আহ্বান নেই। এইরকম মনোভাবটি মেয়েলি — সেই চিত্তবৃত্তির মধ্যে কর্ম্মের প্রাধান্য নেই, বুদ্ধির সর্ব্বদা গদ্‌গদ বাষ্পাবিলতা। এই প্রেমভক্তি নিজের মধ্যেই নিজে আবর্ত্তিত। এ'কে স্বার্থপরতা যদি বা না বলি তবু এ'কে বলা যায় আত্মপরতা। বাঙালী অনেক অংশে দ্রাবিড়, এই জন্যে

তার এত বেশি ভাবাকুলতা। বাঙালী অত্যন্ত বেশি মেয়েলি। তার মানসক্ষেত্রের এই অতিরিক্ত আর্দ্রতা যদি না ঘোচে তাহলে সে ভাবোদ্বেগে মরীয়া হতে পারবে কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না। একদিকে তার আছে কোনো একটা সঙ্কীর্ণ কেন্দ্রকে ঘিরে ভাবাবিষ্ট অন্ধ আত্মনিবেদন, আর একদিকে নিজের চক্রের বাইরে ঈর্ষা বিদ্বেষ কলহপরতা। কী জানি আমার প্রকৃতির কাছে এই মাতামাতি, এই হৃদয়াবেগে আবর্ত্তিত বিচিত্র নিরর্থকতা একান্ত অরুচিকর। অন্তত পুরুষের পক্ষে এটা একান্ত অমর্য্যাদাকর এবং দেশের পক্ষে এটা সাংঘাতিক দুর্ব্বলতাজনক বলে মনে হয়। ভারতবর্ষে একরকম সন্ন্যাসী আছে যারা শুষ্কতার মরুভূমির মধ্যে নিরুদ্দেশ, আর একরকম ভক্ত বৈরাগী আছে যারা সিক্ততার তারল্যের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। এদের কাছে যারা দীক্ষা নিচ্চে মানুষের বিধাতা তাদের হারালেন। তবে তারা মানুষের ঘরে জন্মালো কেন? মানুষের কাছে জ্ঞানে ভাবে ভোগে তাদের যে অপরিসীম ঋণ তার কী শোধ করলে? আমি তো বলি, থাক্ ভক্তি থাক্ পূজা, মানুষের সেবায় দেবতার যথার্থ প্রসন্নতা যেন লাভ করি।

আমার এমনি স্বভাব যে প্রথম থেকেই তোমাকে কেবল পীড়া দিচ্চি। ধর্ম্মকে অবলম্বন করে রসসম্ভোগ করাকেই তুমি যদি চরম শ্লাঘনীয় না বলতে তাহলে আমি চুপ করে থাকতুম। কিন্তু তুমি যে তোমার পূজার উপলক্ষ্য করে আমার মানব-দেবতাকে উপেক্ষা করতে চাও, তার মধ্যে কাল্পনিক অশুচিতা মূঢ়ভাবে আরোপ করে তাকে অবমানিত করতে চাও সে আমি

সহ্য করতে পারি নে। তুমি আমাকে অনুনয় করে বলেছ দেবতাকে আমি যেন অবজ্ঞা না করি— কেন করব অবজ্ঞা— যে জীবনবেদীতে তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠা, যেখান থেকে তিনি আমাদের কঠোর তপস্যা ও আত্মত্যাগ চান সেখানেই তাঁকে আমার সমস্ত সম্মান দিতে চাই— পারি নে বলেই আমার দুঃখ। আশা করি আমার সাধনা সম্পুর্ণ নিষ্ফল হয় নি।

চিঠি লিখতে পারব না বলেও লিখ্‌তে হোলো। কাজ ফেলেই লিখেচি। তোমাকে স্নেহ করেই লিখি। তবুও লেখা সংক্ষেপ করতে হবে।

মীরার চিঠি পথ থেকে পেয়েছি। এতদিনে তার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে— খবর পাবার সময় হয় নি।

বিমলাকে বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ১২ই শ্রাবণ ১৩৩৯

দাদা

৮৯

[শান্তিনিকেতন] ৪ অগস্ট্‌ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আগামী শনিবারে কলকাতায় যেতে হবে কিছুদিন থাকাও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের বাড়ি এসে আমার সঙ্গে দেখা করা তোমার পক্ষে অসাধ্য বলে লিখেচ। আমিও তার প্রত্যাশা

করি নি, সুতরাং তুমি কুণ্ঠিত হোয়ো না। কিন্তু অসাধ্যতার অন্যতম কারণ তোমার পারমার্থিক ক্ষতি এ কথা শুনে চিন্তিত হলুম। পরমার্থ শব্দের অর্থ আমি যতদূর জানি তাতে এই বুঝেছি যে ওটা স্বার্থ ও সমাজবিধির উপরে। যাঁরা পরমার্থ সাধন করেন তাঁদের কাছে স্বার্থ নেই সামাজিক বিধি বিধান নেই। কোনো মানুষকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন না ঘৃণা করেন না অস্পৃশ্য বলে বর্জ্জন করেন না। তাঁদের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাধনার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র কৃত্রিম প্রাচীরে ঘেরা নয়। তাঁরা নির্বিচারে সকল মানুষের আপন। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি। তোমার পরমার্থ ছোঁওয়া খাওয়া নিয়ে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের জাতবিচার নিয়ে। তুমি সর্ব্বদাই যে হিন্দুয়ানির কথা বলে থাকো সেই হিন্দুর অধ্যাত্মশাস্ত্রেও পরমার্থ শব্দের এমন কোনো ব্যাখ্যা শুনি নি যাতে জোড়াসাঁকোর দেউড়িতে এসে তাকে ঠোকর খেয়ে পড়তে হয়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে শাস্ত্রবিহিত আচারের ব্যত্যয় সত্ত্বেও পারমার্থিক উৎকর্ষ লাভ করেছেন এমন সাধককে আমরা জানি। তার পরে প্রাচীন কালের কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, তপোবনে ভোজ্য সম্বন্ধে ঋষিদের যে রুচি ছিল তৎসত্ত্বেও তখনকার কালে যদি পরমার্থসাধন সম্ভব হোত তবে এখন হবে না কেন? কালের গায়ে তো জাতের ছোঁয়াচ লাগে না। ভবভূতির উত্তরচরিতে তপোবনের আহার্য্যের উল্লেখ আছে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষে আরো অনেক দেশ আছে। যে দেবতাকে আমরা ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণদের আঁচলধরা করে শুচি করে রেখেছি, আশা করি সেই

সব দেশও এই দেবতারই সৃষ্টি। সে সব দেশেও এমন সকল ভক্ত ও সাধকদের জন্ম হয়েছে স্মৃতিরত্নরা যাঁদের পায়ের ধুলো নেবারও যোগ্য নন। আজ তোমার ঘরে তাঁরা প্রবেশ করলে তোমার ঘর গোবর গঙ্গাজল দিয়ে তুমি শোধন করে নিতে, কিন্তু তাই বলেই তুমি তাঁদের চেয়ে শুচিতর যেহেতু তুমি ছুঁৎমার্গে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছ, পরমার্থের খাতিরে এমন অহঙ্কার মনে পালন কোরো না। পৃথিবী সেই সব ম্লেচ্ছদের পদক্ষেপে পবিত্র হয়েছে, তাঁদের চরিত স্মরণ করলে অনুসরণ করলে পরমার্থের পথ বাধাহীন হয়। যথার্থ পরমার্থের আদর্শে বিচার করলে আমি অশুচি তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ এ নয় যে আমি খাওয়া ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চলি নে— তার কারণ আমার মন নিষ্পাপ নয়। দিনে দশবার গঙ্গাস্নান করে সকল প্রকার শকড়ি বাঁচিয়ে আতপ তণ্ডুল খেলেও আমি অশুচি। কিন্তু তবু বিধাতা আমাকে ত্যাগ করেন নি, মানুষও যে করবে এমন অমানুষিকতা আমি প্রত্যাশা করি নে। তুমি যেসব অতিসাবধানী সাধকদের কথা লেখো, বিশ্ববিধাতার অধিকাংশ সৃষ্টি যাঁদের কাছে বর্জ্জনীয়, তাঁরা বিশ্বদেবকেও অশুচি বলে জেনেছেন ও সেইভাবে ব্যবহার করেছেন এতবড়ো পারমার্থিক অশুচিতা কিছু কি কল্পনা করা যেতে পারে।

আমার সময় নেই অথচ এসব প্রশ্ন উঠ্‌লে চুপ করে থাকা আমি অকর্ত্তব্য বলে মনে করি। তোমাকে পীড়া দিতে দুঃখ পাই তবুও সত্যের অপমান চুপ করে স্বীকার করতে পারি নে।

তীর্থসংস্কার সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছ তা আমি মানি। কিন্তু

দেশের লোকের অন্তরে যে তামসিকতা যে মলিনতা আছে তীর্থে তাই ব্যক্ত না হয়ে থাকতে পারে না। আমরা সংস্কার মানি সত্যকে মানিনে বলেই সর্ব্বত্র এত বাহ্য আচার এবং আন্তরিক নোংরামি। আমাদের পৌরুষহীন কর্ম্মহীন ভাবরসাবেশে সর্ব্বদা বাষ্পাচ্ছন্ন ভক্তি কেবল আপনার ভাববিলাসিতাপরিতৃপ্তির জন্যে নিজেকে বিহ্বল করেছে, সে মানুষকে চেয়ে দেখে না, ঠেকিয়ে রাখে ; মানুষের মূঢ়তা মলিনতা দূর করবে কি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অশ্রুবর্ষণ করে। নিজের শুচিতারক্ষার আগ্রহে তারা যদি মানুষকে দূরে রাখে তবে সেই সব মানুষের কলঙ্কগুলো জমে উঠবে না কেন ? যখন তা চোখে পড়ে তখন তারা নিজের পবিত্রতাবোধের খাতিরেই নাসাকুঞ্চন করে কিন্তু সেই সব মানুষের পরিত্রাণের কথা ভাবে কি ?

আমার আর সময় নেই। ইতি ৪ অগষ্ট ১৯৩২

দাদা

৯০

[৫ অগস্ট্ ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছু মনে কোরো না। আমরা কবিরা খামখেয়ালি মেজাজের মানুষ— হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠি কিন্তু সেটা অত্যন্ত অস্থায়ী। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি সেটা আমার একটুও ভালো

লাগচে না। যদি সান্ত্বনা দেবার শক্তি থাকত তো দিতুম। তুমি নিশ্চয় জেনো আমি যদি তোমার প্রতি নির্দ্দয়তা করে থাকি সেটা বিবেচনা না করে ঝোঁকের মাথায়। এই আঘাত এখন আমাকে ফিরে লাগচে।

কাল সন্ধের সময় ইউনিভর্সিটি থেকে নিমন্ত্রণ সেরে বরানগরে মহলানবিশদের বাড়িতে যাব দুই তিন ['দিন'] থাকব। তার পরে ১১ই অগষ্ট তারিখে জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসব। বোধ হয় ১৩ই চলে যাব শান্তিনিকেতনে।

তোমার মন থেকে বেদনা দূর হয়েচে জানলে আমি নিরুদ্বিগ্ন হব।

দাদা

৯১

৩১ অগস্ট ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন চিঠি লিখিনি। শরীর মন ও সংসারের উপর দিয়ে বিস্তর উৎপাত গেছে। সে জন্যে বিলাপ পরিতাপ করা আমার অভ্যাস নয়, করিও নি। কিন্তু সাধারণত, মনকে বাইরের নানা কর্ত্তব্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করতে এখন আর একটুও ইচ্ছা করে না। যে কর্ম্মসাধনার মধ্যে অনেকদিন মন কেন্দ্রীভূত তাকে কোনো কারণেই বর্জ্জন করা দুর্ব্বলতা এবং সেটা লজ্জা-জনক— তার মধ্যে নিবিষ্ট থাকতে হয়েচে, অথচ তার সঙ্গে

নিঃসংসক্ত আছি। তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে তার কোনো অভাব কল্পনা কোরো না। নানা মতামত নিয়ে তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করেচি, সেও তোমাকে স্নেহ করি বলেই। তোমার চিঠি থেকে আমার দেশের অনেক কথা জানতে পেরেচি— তার কোনো অংশ সুন্দর, কোনো অংশ নিরালোক এবং অনার্য্য— সেটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সম্ভব নয় উচিতও নয়। সেই জন্যে তা নিয়ে আলোচনা করেচি, তোমাকে দলে টানবার জন্যে নয় কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে। আঘাত অনেক পেয়েছ, সে আমার ভালো লাগেনি। এ সব তর্ক এখানেই শেষ হোলো। ক্লান্ত লেখনীকে আর খাটিয়ে মারতে ইচ্ছা করে না। আমার সঙ্গে কোনো ব্যবহার করার মধ্যে ঐহিক ও পারত্রিক সঙ্কোচের কারণ তোমার মনে আছে। আমি তার উপলক্ষ্য হতে ইচ্ছা করি নে— তোমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করি বলেই। আমার চিন্তার, আমার সাধনার, আমার জীবনযাত্রার পথ তোমার থেকে অনেক দূরে। তুমি সম্পূর্ণ তাকে বুঝতে পারবে না। তা নিয়ে আক্ষেপ করা মূঢ়তা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুমি আমাকে যদি শ্রদ্ধা করতে পারো সে কম কথা নয়। পরলোকগত ত্রিবেদীমশায় আমার সেই রকম বন্ধু ছিলেন। আমার মতের জন্যে নয়, সকল তর্কবিতর্কের বহির্ভূত মনুষ্যত্বেরই জন্যে। সেই অকৃত্রিম মৈত্রীর স্বাদ আমি তাঁর প্রীতি থেকে অনুভব করেছিলুম। অতএব জানি সংসারে সেটা দুর্লভ হলেও অলভ্য নয়। তোমার ছেলেমেয়েকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ইতি ৩১ অগষ্ট ১৯৩২

দাদা

৯২

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হয়েচি। কিন্তু বড়ো চিঠি লেখবার মতো অবকাশ ও মনের স্বচ্ছন্দতা আমার এখন নেই। তাই সংক্ষেপে দু কথা লিখে দিচ্চি। "পরিশেষ" নামে একখানা কবিতার বই তোমাকে দু দিন হোলো পাঠিয়েছি, পেয়েছ বোধ হয়। তুমি পড়বে বা আলোচনা করবে বলে পাঠানো নয়, আমার স্নেহের দান বলে এ'কে তুমি গ্রহণ কোরো। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় যাব। আমাদের এখানকার সঙ্গীতবিভাগের ব্যয় বহনের মত কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়েচে তাই গান ও অভিনয়ের সাহায্যে সঙ্কল্পসিদ্ধির আশা করচি।

তোমরা আমার সর্ব্বান্তঃকরণের শুভকামনা গ্রহণ করো। ইতি ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

দাদা

২৩

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ হোমিয়োপ্যাথির ল্যাকেসিসের সঙ্গে বায়োকেমিক ওষুধের বিরোধ আছে কিনা। বায়োকেমিক পক্ষের নেই, কিন্তু হোমিয়োপ্যাথি অন্যপন্থী ওষুধের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। সেই কারণে, আমি বোধ করি যতদিন হোমিয়োপ্যাথি খাচ্চ ততদিন অন্য সব ওষুধ বন্ধ রাখাই ভালো।

... ...

... ... আমি চেষ্টা করি মনকে তার সম্বন্ধে সহজ করে রাখি। কারো প্রতি মনের মধ্যে বিরোধ জমিয়ে রাখতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি— আমি জানি সেটা আত্মাবমাননা। কিন্তু মানুষের অহমিকা প্রবল, সেখানে নিরন্তর আঘাত লাগ্‌লে মনকে শান্ত রাখা কঠিন, সেই জন্যে এই সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ থেকে মনকে সরিয়ে রেখে দিই। যেটা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় সেটা এই যে, আমার দেশে আমার নিন্দার ব্যবসায়ে জীবিকা ভালো চলে, বুঝতে পারি আমার সম্বন্ধে তীব্র বিদ্বেষ কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আমার দেশে। আমার প্রতি আঘাত, আমাকে অবমাননা দেশের লোককে কতই কম বেদনা দেয়। তা যদি না হোত তাহলে আমার বিরুদ্ধে নিন্দার পণ্য এত লাভজনক হোত না। এটাকে জেনে নিয়ে শান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আমাকে আঘাত করা দেশের লোকের পক্ষে এত

নির্ম্মমভাবে সহজ হয়েচে সেটা হয়তো আমার পক্ষে গৌরবেরই বিষয়। আমি সত্যরক্ষার দিকে দৃষ্টি করেচি লোকের মনরক্ষার দিকে নয়। বিধাতা আমাকে যত প্রশ্রয় দিয়েচেন এমন অতি অল্প লোককেই দিয়েচেন, অতএব আমার পক্ষে নালিশ শোভা পায় না। এসব কথার আলোচনা ভালো নয়, এতে আত্মলাঘব ঘটে।

আমাকে তুমি যদি সর্ব্বদা জানবার অবকাশ পেতে তাহলে আমাকে কঠোরগম্ভীর মানুষ বলে ভয় করতে না, এবং পাছে আমি কিছু মনে করি বলে এত বেশি সাবধান হতে না। আমাকে দূর থেকে নানা লোকে নানা রকম মনে করে নেয়, তার একটা কারণ, আমার নানা অংশকে মিলিয়ে সমগ্র করে দেখবার অবকাশ সকলের ঘটে না। আর যাই হোক আমি ভয়ঙ্কর নই। ইতি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

দাদা

৯৪

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পড়ে বিস্মিত হলুম। এত অত্যন্ত উদ্বেজিত হবার কী কারণ ঘটেচে বুঝতে পারলুম না। তোমার সম্বন্ধে কোনো কঠোরতা কোনো নিষেধ আমার মনে নেই, আমার ভাষায় কি করে তা প্রকাশ পেতে পারে ভেবে পাচ্চি নে।

আমার সন্দেহ হয় তোমার শরীরের অস্বাস্থ্য তোমার মনকে বিকল করেচে। অথবা হয় তো তোমার প্রতিবেশীর ছোঁয়াচ লেগে থাকবে। সহজ সম্বন্ধের বিপর্য্যয় আমার জীবনে বারবার অকারণেই ঘটেচে— পুনশ্চ ঘটা অসম্ভব নয়। আমার এ বয়সে সে জন্য মনকে উদ্বিগ্ন করা কিছু নয়। স্বভাবতই আমার প্রতি তুমি যে রকম ব্যবহার রক্ষা করতে ইচ্ছা করো, তাই কোরো, যেখানে তোমার বাধা সেখানে টানাটানি কোরো না। যাই করো, আমার সম্বন্ধে কোনো কাল্পনিক অভিযোগ মনে পোষণ কোরো না। আমার মধ্যে এমন কিছু সুর থাক্‌তে পারে যেটা স্বতই তোমাকে পীড়ন করে, সেটা অবশ্যই দুঃখের কারণ, কিন্তু তা অনিবার্য্য। তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে বলেই সেটুকু স্বীকার করে নিয়েও ধৈর্য্য রক্ষা করা চলে। যাই হোক এ সকল কথা যুক্তির কথা নয়, অভিরুচির কথা, সুতরাং এ নিয়ে বোঝা-পড়ার চেষ্টা করা বৃথা। ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩৩৯

দাদা

৯৫

[২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

… … … সঙ্গে তোমাদের মেলামেশা আছে বলে আমি বিরক্তি বোধ করি এমন সন্দেহমাত্র আমার পক্ষে অগৌরবের কথা। তোমার পূর্ব্ব চিঠিতে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনা

দেখেই মনে করেছিলুম, আমার সম্বন্ধে লোকের অকারণ দ্রোহভাব পূর্ব্বেও বারম্বার দেখেছি আবার বুঝি তারই লক্ষণ দেখা গেল সেই কথাই বলেছিলুম। আমার বন্ধু সুনীতিকুমার সজনীকান্তেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমন কি আমার দৃঢ় বিশ্বাস শনি-বারের চিঠিকে তিনি আমার বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করতে সহায়তা করেন। ও তাতে আনন্দ বোধও করে থাকেন। সে জন্যে আমি যদি সুনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করতুম— তা হলে তার চেয়ে লজ্জার কথা আমার পক্ষে কিছু হতে পারত না। সুনীতির সমাজমতের সঙ্গে আমার বিরোধ থাকাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে আমি হিন্দুসমাজের শত্রু অতএব কঠিন শাস্তির যোগ্য— অতএব সেই শাস্তির ব্যবস্থা করা তিনি কর্ত্তব্য বলেই মনে করেন। শাস্তির প্রণালী ও রুচি সম্বন্ধে মানুষের স্বভাব ও শিক্ষা দায়িক— সে সম্বন্ধেও আমার আদর্শের সঙ্গে তাঁদের মিল না থাকতে পারে কিন্তু তাই নিয়ে যদি আমি বিবাদ করতে পারি তবে সেইটেই যথার্থ গ্লানির বিষয় হোতো। সজনীকান্ত কল্পনা করচেন তাঁর লেখনী দেশের লোকের মনে আমার বিরুদ্ধে স্থায়ী অবজ্ঞা সৃষ্টি করতে পারে। যদি তা যথার্থই সম্ভব হয় তবে সেটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বুঝে রাখা ভালো আমার দেশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। সেটাতে আমার যথার্থ কোনো লাঘবতা নেই। আমার রচনায় যদি কোনো গুণ থাকে সেটা সজনীকান্ত বা আর কারো মতামতের উপর নির্ভর করে না সেটা আমি নিশ্চিত জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। এ কথাও আমি নিশ্চিত জানি যে

বলাকা পূরবী প্রভৃতি আমার আধুনিক রচনা সজনীকান্ত যে সত্যই ভালোবাসেন না তা নয়— তিনি যে চক্রান্তের মধ্যে আছেন তাতে সহজ মনে আমার এখনকার কিছুই ভালো লাগবার আন্তরিক স্বাধীনতা নেই। আমি তা নিয়ে যদি রাগারাগি করি তবে সেইটেই আমার শাস্তি।

কলকাতায় শীঘ্র যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতি ৪ আশ্বিন [১৩৩৯]

দাদা

৯৬

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাদের তোমরা অন্ত্যজ বলো তাদের নির্ম্মল ও শুচি হবার উপদেশ দিতে আমাকে অনুরোধ করেচ। করতে পারি যদি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো যে অন্ত্যজাতীয় যারা ঠাকুরের দর্শন স্পর্শন ও সেবার অধিকারী তারা সকলেই নির্ম্মল নিরাময়, তারা অন্ত্যজগমন করে না, তাদের কারো দুষ্ট ব্যাধি নেই, অন্তরে বাহিরে তারা সকলেই বা অধিকাংশই শুচি— তারা মিথ্যা মকদ্দমা করে না, তারা অকপট। তারা মন্দিরে প্রবেশ করলে দেবতা যদি অশুচি না হন, শত শত বৎসর তাদের সংস্রবেও যদি তাঁদের দেবত্বে কোনো সঙ্কোচ না ঘটে থাকে,

তবে কেবল জন্মগত হীনতাই কি তাঁদের অসহ্য। দেবতা কি কেবল তোমাদেরই দেবতা, তোমাদের বিষয়সম্পত্তির মতো। দেবতা সম্বন্ধে এমন ধারণার মতো দেবতার অপমান আর কিছুই হতে পারে না— ভারতবর্ষে দেবতা অপমানিত এবং মানুষ অপমানিত। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৩৯

দাদা

৯৭

১ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পড়ে আমি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করি। তোমার বুদ্ধিকে আমি কেবলি পীড়ন করচি। তোমার স্বভাবে তুমি স্বচ্ছন্দে বর্ত্তমান থাক, তাতে আমি লেশমাত্র আপত্তি বোধ করব না। তোমার মন ক্লিষ্ট হয়েচে বলেই তুমি আমাকে অসম্ভব রকম ভুল বুঝচ। শিবারামের গল্প লেখবার সময় তোমার কথা আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না— পরিচয় পত্রে কোন্ কবিতার মধ্যে তোমার প্রতি আঘাত প্রচ্ছন্ন আছে বহু চিন্তা করেও বুঝতে পারলুম না। কালের যাত্রায় তোমার বর্ণিত ব্রাহ্মণকন্যার ওষুধের গুণের কথাটা ব্যবহার করেচি কিন্তু সে তো তোমাকে পীড়া দেবার জন্যে নয়, আমাদের দেশের বিশ্বাস-মোহের দৃষ্টান্ত দেবার জন্যে। কিন্তু তাতে যদি তোমাকে দুঃখ

দিয়ে থাকে তবে আমাকে ক্ষমা কোরো। এ কথা নিশ্চিত জেনো যে তোমাকে ইচ্ছা করে বেদনা দেব বা বিদ্রূপ করব এ আমার দ্বারা হতেই পারে না। পরিচয়ের কোন্ কবিতায় তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ আমাকে জানালে আমি বুঝতে পারব কি ভাবে আমাকে সতর্ক হতে হবে।

শরীর ক্লান্ত এবং নানা চিন্তায় মন ভারগ্রস্ত। ১ অক্টোবর ১৯৩২

দাদা

৯৮

২ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার কয়েকটি চিঠি পড়ে দেখ্‌লুম। আমার সঙ্গে মতান্তর নিয়ে তোমার মন অত্যন্ত অশান্ত হয়েচে। কোনো উপায় নেই, কারণ মত তো গায়ের চাদর নয় যে, কাউকে খুসি করবার জন্যে বদল করা চলে। বুঝতে পেরেছি তোমার মন এমন অবস্থায় এসেছে, আমার সম্বন্ধে তোমার সহিষ্ণুতা বেশিক্ষণ টিঁকবে না,— ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছ শেষকালে সম্পূর্ণ উল্‌টো বুঝবে, তার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ স্তব্ধ হওয়াই ভালো। স্নেহের বন্ধনকে বিরক্তিতে নিয়ে যাওয়া শ্রেয় নয়।— দুই একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই, আর কেউ হলে কোনো কথাই বলতেম না।—

তুমি সাম্যতত্ত্ব নিয়ে আমাকে খোঁটা দিয়েচ। আমি সাম্য-নীতির চূড়ান্তে উঠেচি এমন অহঙ্কার কখনো করি নে, কিন্তু তাই বলেই যতটা পারি তাও ত্যাগ করতে হবে এ'কে সুযুক্তি বলে না। আমি মানুষটা স্বল্পাশী, জানি ভূরিভোজন মনের শক্তি হ্রাস করে; জনরব এই যে কোনো একজন পওহারী বাবা না খেয়ে সাধনা করেন। তুমি যদি বলো, আপনি যখন পবন আহার করে থাকতে পারেন না তখন স্বল্পাহারের বড়াই করেন কেন— এমন খোঁচা চুপ করে স্বীকার করে নিলেও অগৌরব হবে না। সজনীকান্তের পরিবারের সঙ্গে তোমাদের সখ্য হয়েছে বলে তুমি যখন আমার অপ্রীতি কল্পনা করেছিলে তখন বলেছিলেম, আমার মনের এমন বিকার যদি হোত তাহলে লজ্জিত হতুম। আমি কখনো বলিনে যে বিনা কারণে বিনা আমন্ত্রণে অতিশয় ঔদার্য্যের গরিমা দেখাবার জন্যে তার বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে পড়বার জন্যে আমার ব্যগ্রতা আছে। যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করত তবে নিশ্চয় যেতুম— না করলেও অকস্মাৎ তার ওখানে না যাওয়াকে যদি তুমি আমার দুর্ব্বলতা বল তবে নিঃসন্দেহ স্বীকার করব সে দুর্ব্বলতা আমার আছে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তাদের সম্প্রীতি ঘটেচে বলে তোমাদের প্রতি বিমুখ হব সে দুর্ব্বলতা আমার নেই। পূর্ব্বটা আছে বলেই এটাও আমার থাকা উচিত ছিল এই যদি তোমার মত হয় তাহলে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না এর বেশি আর কি বলব।

কিন্তু এর চেয়ে আরো আশ্চর্য্যের কথা তোমার চিঠিতে

আছে। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে তোমাদের বাড়িতে কেমন বেড়িয়ে আসতে পারি তাই তুমি দেখ্‌তে চাও। আমার বন্ধু ও পরিচিত-দের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অতি অল্পই আছে। যাঁদের বাড়িতে আমি অবাধে যাই তাঁরা ধনে মানে তোমাদের সঙ্গে তুলনীয় নন। আর যাঁরা অবাধে যখন তখন আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন তাঁদের মধ্যে নগণ্যের সংখ্যা কম নয়— আমার সময় নষ্ট হয়, কাজের ক্ষতি হয় স্বাস্থ্য পীড়িত হয় নিতান্ত অসাধ্য না হলে পদের অভিমানে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করিনে। এটা খুব বেশি কথা নয় এবং এই নিয়ে আমি যশোলাভ করবার দাবী রাখি তা মনে কোরো না। সাম্যতত্ত্ব প্রচারের খাতিরে অকস্মাৎ তোমাদের বাড়িতে উঠে সবাইকে সচকিত করে দেব এমন আশঙ্কা মনে রেখো না।

আর একটা খোঁটা ইঙ্গিতে দিয়েছ সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা আমার পক্ষে আরো কঠিন। তুমি লিখেচ দরিদ্র ও অস্পৃশ্যদের আর্থিক সহায়তার জন্য যাঁরা স্বার্থত্যাগ করেচেন তাঁরা সাহিত্যিক নন, তাঁরা ধনী নন, তাঁরা অমুক অমুক অমুক। আমি কিছু করেছি কিনা তার হিসাব তোমার কাছে দিতে চাই নে কিন্তু যদি এক পয়সা ব্যয় নাও করে থাকি তাই বলেই কি যেটা উচিত সেটাকে উক্ত করতেও পারব না? আমি পাড়ায় পাড়ায় আগুন নিবিয়ে বেড়াই নে, চেষ্টা করতে গেলে পারিও নে, তাই বলে কি তুমি আমাকে লিখ্‌তে দেবে না যে লোকের ঘরে আগুন দেওয়া অন্যায়। আমি যে সকল কাজ করে থাকি যারা তার কোনো খোঁজ রাখে না, তারা আমার

কাজের খোঁটা দিয়ে থাকে, বাঙালীর মধ্যে জন্মেছি বলে আমার এই দুর্ভাগ্য। তুমিও খোঁটা দিতে যদি সুখ পাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তবুও মনের মধ্যে এইটুকু সংশয় রেখো যে, সব খবর হয় তো তোমার জানা নেই, এবং জানবার সম্ভাবনামাত্র নেই। বস্তুতই আমি তোমার অপরিচিত অতএব বিচার করবে কেমন করে— কিন্তু তাই বলেই যে অবিচার করবে সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে কেন কারো সম্বন্ধেই ভালো নয়। তোমার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হওয়াকে যদি অপরাধ বলে গণ্য করো তবে সেই সূত্রে আমার প্রতি কাল্পনিক অপরাধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

মহাত্মাজি সম্বন্ধেও তুমি কিছুই জানো না, আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি— তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। তোমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর মতের মিল নেই বলেই তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা শ্রদ্ধেয় নয়। এ ক্ষেত্রেও তোমাকে বলি মনকে এই বলে নম্র কোরো, "আমি হয় তো তাঁকে জানি নে, জানা আমার সাধ্যের মধ্যে নয়, অতএব নীরব থাকব।"

আর আমি কৈফিয়ৎ দেব না। তোমার মন উদ্বেজিত হয়েছে, এ অবস্থায় বাদপ্রতিবাদে সুফল ফলে না। আমারও অবকাশের একান্ত অভাব। অতএব তর্কবিতর্ক না করে সম্পূর্ণ নীরব হওয়াই নিরাপদ। ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩২

দাদা

৯৯

১৩ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যারা নিজেকে ধর্ম্মকর্ম্মের পুতুল করে তোলে তারাই আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের প্রতিদিন পুনরাবর্ত্তনের দ্বারা নিজের শূন্যতাকে ভরাট করে মনে করে জীবন সার্থক হোলো। যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মে বুদ্ধির অন্ধতা এবং হৃদয়ের জড়তা, সেই সমস্ত নিরর্থকতার জালে নিজেকে নিয়ত জড়িয়ে রাখা ভুলিয়ে রাখার মত দুর্গতি আর নেই। এই সমস্ত চিত্তহীন আচারে জীবন অসাড় হয়ে যায়; এই অসাড়তায় সুখ দুঃখের বোধকে কমিয়ে দেয় বলে অনেকে একে শান্তি বলে ভ্রম করে। কী হবে এই নির্জ্জীবতার শান্তি নিয়ে।

তুমি তোমার অতৃপ্ত হৃদয়কে পূর্ণতা দেবে বলে ঘুরে বেড়িয়েছ, আজও শান্তি পাও নি। যার মন সজীব, যে চিন্তা করতে পারে, ভালোবাসতে পারে, সে কি দিনের পর দিন অনুষ্ঠানের কলের চাকা ঘুরিয়ে বাঁচে। মনুষ্যত্বের বিচিত্র প্রবর্ত্তনাকে অন্ধ অভ্যাসে সঙ্কীর্ণ করে আনাকে অনেকে ধর্ম্মসাধনা বলে, মানবস্বভাবকে খর্ব্ব করা পঙ্গু করাকেই মনে করে সাধুতা। জীবনকে এমন অকৃতার্থ করাই যদি বিধাতার অভিপ্রেত হোত তবে তাঁর সৃষ্টিতে এত আয়োজন কেন? জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে বড়ো করে পাওয়ার মধ্যেই মুক্তি। জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের পরিধিকে ছেঁটে ছোটো করে আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রকে

অপ্রশস্ত করা আত্মহত্যার রূপান্তর। সংসারের খাঁচায় যারা কষ্ট পাচ্চে ধর্ম্মের খাঁচা বানিয়ে তারা নিষ্কৃতি পাবে এ কখনো হয় না— মাদকসেবীর মতো তারা অচেতনতার মধ্যে পালিয়ে রক্ষা পেতে চায়, অর্থাৎ তারা মরে' বাঁচতে ইচ্ছা করে। এক রকম আধমরা স্বভাব আছে তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব, কিন্তু যাদের হৃদয় বুদ্ধি সজীব সচল, নিজেকে বলপূর্ব্বক আড়ষ্ট করে' তারা কখনোই সুখী হতে পারে না। একদিন আশ্রমে তুমি আনন্দ পেয়েছিলে,— নিজেকে কৃত্রিম নিয়মশৃঙ্খলে বেঁধেছিলে বলে' সে আনন্দ নয় তোমার হৃদয় পূর্ণতার তৃপ্তি পেয়েছিল বলে'ই সে আনন্দ— সে একটা সত্য পদার্থ, সে বানানো জিনিষ নয়। তোমার সেই তৃপ্তির উৎসটাই আজ পাথরচাপা পড়েছে, তাই বলেই সেই পাথর নিয়েই তুমি বাঁচবে কি? যারা সেই রুদ্ধ উৎসকে ভুলে কেবল পাথরকে সিঁদুর মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে সময় কাটাতে অন্তরে বাধা পায় না, তারা তোমার অসন্তোষের চাঞ্চল্য দেখে তোমাকে অবজ্ঞা করে, বস্তুত তাদেরই সন্তোষের স্থাবরতা অবজ্ঞার বিষয়।

তোমার প্রশ্ন এই, কি করে জীবন সার্থক হবে। কি উত্তর দেব ভেবে পাই নে। আমাদের দেশে মেয়েদের জীবনক্ষেত্র বেড়া দিয়ে খাটো করা, তার মধ্যে মানুষের চিত্ত সব খোরাক পায় না, উপবাসী থাকে। সুবিধা এই, অধিকাংশ মানুষ সঙ্কীর্ণ সীমার উপযুক্ত হয়েই জন্মায়, যাদের ডানা নেই আকাশের অধিকার হারালেও তাদের চলে। ঘরকন্নার সঙ্কীর্ণতা বা ধর্ম্মাচরণের সঙ্কীর্ণতা সে সব মেয়েদের মনকে বঞ্চিত করে না। বরঞ্চ তারা

এই নিয়ে খেলাচ্ছলে একরকম আরাম পায়— তাদের কোনো নালিষ নেই। তোমার হৃদয় মনকে অত সহজে শিকল পরিয়ে তুমি দমিয়ে রাখতে পারচ না, তাই কষ্ট পাচ্চ। তোমার এই সঙ্কীর্ণ অবস্থায় থেকেও তুমি মুক্তির আস্বাদ পেতে পারতে যথেষ্ট পড়াশোনায়, এবং রচনার মধ্যে। বহির্জগতের স্বাধীনতা, যা তোমার নিজের ছেলের আছে, তা তোমার নেই,— মানুষের এই মস্ত অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত। কাজেই অন্তর্জগতের মধ্যে সঞ্চরণের স্থান প্রশস্ত করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে' সেটাকে সত্য করে তুলতে পারো যদি তবে তাতেই পাবে আনন্দ। নইলে খাঁচার শলাগুলোতে কেবলি ডানা ঝাপটা মেরে কী লাভ। —আমার কথা যদি বলো, সংসারে আমার দুঃখ শোক অভাব অতৃপ্তি কম নয়— কিন্তু জগতে চারদিক থেকে আমি খোরাক সংগ্রহের রাস্তা রেখেছি, আমার চিত্তের ঔৎসুক্য কোনোদিকেই বাধাগ্রস্ত হয় নি।—

তুমি একটি বিশেষ পথ দিয়ে হৃদয়ের চর্চ্চা করেছ —সেই পথটিই তোমার পক্ষে সহজ। সেই পথে তোমার প্রধান আশ্রয়কে হারিয়েচ। অন্য পথ তোমার অনভ্যস্ত, দুর্গম, হয়তো বা তোমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই মনে হয় যে সব বৈষ্ণবশাস্ত্রে তোমার মন রস পেতে পারে তার মধ্যে একান্তভাবে মগ্ন হতে পার কি ?

বারবার বলেচি গুরুর পদ আমার নয়। আমি কবি, নানাভাবে নানা দিকে আমার মন সঞ্চরণ করে— আমার স্বভাবের বৈচিত্র্যবশত নিজেকেও নিজে বুঝি নে, অন্যেও

আমাকে বোঝে না। আমার প্রধান সার্থকতা সব কিছু প্রকাশ করা— বাণীর দ্বারা করেচি, কর্ম্মের দ্বারাও করচি। মনে কোরো না, আরামে করতে পেরেছি, দিতে হয়েচে অনেক, কষ্ট ও অপমান সয়েচি যথেষ্ট, নিজেকে প্রায় নিঃস্ব করেছি— কিন্তু ছুটি পাব না কোনোদিন, কেননা এই আমার স্বভাব। ইতি
২২ আশ্বিন ১৩৩৯

দাদা

১০০

১৮ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এবারকার ছুটি আমার জন্যে অবকাশ নিয়ে আসে নি। নানা কাজে ও অকাজে দিনগুলো ঠাসা। তার উপরে, অনেক লোক যারা অন্যত্র ছুটি পেয়েচে তারা আমার ছুটির উপর এসে ভিড় করচে। এখান থেকে পালাব স্থির করেছি। কিন্তু প্রবাদ আছে ঢেঁকির স্বর্গপ্রাপ্তি হলেও তার ধান ভানারও গতি হয় তার সঙ্গে এক লোকে। জরুরি কাজ আছে অতএব একটু ফাঁকা কোথায় পাওয়া যায় খুঁজে বের করতেই হবে। এ চিঠিতে বলিদান কিম্বা অন্য কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নিয়ে তর্ক করতে চাই নে, কারণ সময় নেই। সংক্ষেপে কেবল এই কথা বলে রাখি মানুষ অনাচার করে বলেই দেবতার পরেও অনাচার আরোপ তার পক্ষে অন্যায় নয় এই যদি প্রশস্ত মত হয় তবে দেবতার পূজায় নিজেকেই পূজা করবার রূপান্তর করা হয়। মানুষের চেয়ে

দেবতা যদি বড়ো না হন, তাহলে দেবতায় কাজ নেই, মানুষই যথেষ্ট। থাক্ ও সব কথা।

যদি খড়দয় গিয়ে কিছুদিন আশ্রয় নিই তাহলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তো অসম্ভব হবে না। তোমাদের সঙ্গে আমার আচারের মিল নেই বলেই অন্তরের মিল হতে পারে না এমন আশঙ্কা করি নে। নিশ্চয় তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে যদি আচাব দিয়ে আমার যাচাই না করে হৃদয়ের দিকে আমার মূল্য নিরূপণ করো। বাইরের দিককার কৃত্রিম অভ্যাস ও ব্যবহারকেই প্রধান করে' যদি আমরা সত্যকার মনুষ্যত্বের মূল্য খর্ব্ব করি তাহলে কোনোদিন আমাদের বিরোধ মিট্‌বে না। মানুষ আচারের চেয়ে বড়ো, মুখোষের চেয়ে মুখ যেমন বড়ো, সংহিতাকারের চেয়ে বিধাতা যেমন বড়ো। ইতি ১ কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০১

২১ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার স্বভাবের অনুবর্ত্তন করে এসেচি বলেই আমার দেশ আমাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারচে না এই কথাই তোমার চিঠি থেকে বুঝতে পারি। পাঁচজনে আমাকে যে রকমটি হতে

বলে আমি যদি ঠিক সেই প্যাটার্ণে নিজেকে গড়তে পারি তবেই তারা আমাকে ধন্য বল্‌বে এ কথাটা একদিক থেকে এতই সহজ যে আমি তা বুঝতে পারি, আর একদিক থেকে তা এতই কঠিন যে আমি তা মানতে পারি নে। আমার বয়স যখন আঠারো, তখন আমি প্রচলিত পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামতো ছন্দে কবিতা লিখতে সুরু করেছিলুম। আমার সেই ছন্দের কাব্যকে তৎকালীন সাহিত্যের প্রবীণ মুরুব্বিরা "কাব্যি" বলে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছিলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই অবজ্ঞা চলেছিল। তখন আমি যদি

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে—

অথবা কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ

এই ছাঁদকে সামনে রেখে নিজের কবিতাকে ভদ্ররীতি দিতে পারতুম তাহলে নিজেকে আমি তখনকার সাধুসমাজে পছন্দসই করতে পারতুম। ভাগ্যক্রমে ইচ্ছে করলেও আমার দ্বারা সেটা সম্ভবপর হতেই পারত না। আমি যখন "স্বদেশী সমাজ" লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কন্‌গ্রেসওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। বিদেশী গবর্মেণ্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রফানিষ্পত্তির কাজকেই তাঁরা ভারতবাসীর মোক্ষসাধন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেছিলেন বেন্থাম প্রভৃতি পণ্ডিতরা স্টেট্ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন আমি অশিক্ষাবশত সেসব কিছুই জানিনে বলেই এমন কথা বলতে পেরেছি যে প্রজারা নিজেদের শাসনশক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে। আমি যদি ভালোমানুষের মত দেশের জন-

সাধারণকে বাদ দিয়ে ইংরেজিশিক্ষিত এবং ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের যুগলমিলন ঘটিয়ে তাই নিয়ে কন্‌গ্রেসের মঞ্চের উপর স্বেদ কম্প পুলক প্রভৃতি দশ দশার শাস্ত্রবিহিত লক্ষণ প্রকাশ করতে পারতুম, তাহলে তখনকার দিনে উঁচু চৌকিই পেতুম। সে সুযোগ গেল। কিন্তু আমার সেদিনকার কথার টুক্‌রো নিয়ে পরবর্ত্তী অনেক দেশাত্মবোধী তাঁদের বাণীরূপে ব্যবহার করেছেন এবং দেশে ধন্য হয়েছেন। বেঁচে থাক্‌তে থাকতে এও দেখেচি। তার পর যখন জালিয়ানবাগ ব্যাপারে আমি ছাড়া আর সকলেই নীরব ছিলেন,— দেশবন্ধু এবং মহাত্মাজিও— সে ঘটনাটাকে আমার সম্বন্ধে বিচার করবার হিসেব থেকে দেশের লোক বর্জ্জন করে বসে আছেন— বহুকাল থেকে এ কথা বলতে তারা কুণ্ঠিত হয় নি যে দেশের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে আমি কেবল বিদেশের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের জন্যে ব্যস্ত। তারা জানে অথবা জেনেও জানে না যে বিদেশের জনসভায় বিদেশী সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যা বলে থাকি তা একেবারেই শ্রুতিসুখকর নয়। দেশের যথার্থ কাজ বল্‌তে আমি যা বুঝি তার জন্যে আমি নিজের প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করেছি, কিন্তু যেহেতু দশজনের ফরমাস-মতো সে কাজ গড়া হয় নি, দেশাত্মবোধীরা কেউ তার ত্রিসীমানায় না এসেও দূর থেকে নিরন্তর তাকে নিন্দা করেছে অবজ্ঞা করেছে, বাধা দিয়েচে। তবুও আমার উপায় নেই। তাদের ছাঁচে ঢালাইকরা পুতুল বিক্রি করে বাজারে নাম করতে ইচ্ছা থাকলেও সেটা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার কাজ আমাকে করতেই হবে। সাহিত্যে আজও

আমার কাব্যতরণী চালাবার জন্য আমারি মনের উনপঞ্চাশ বায়ুর উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়, তার কোনো দমকা এসে আমার রচনাকে প্রচলিত ধারার বাইরে নতুন বাঁকে যদি নিয়ে যায় তো জানি তোমরা পাড়িতে দাঁড়িয়ে হয়তো কর্ণধারকে গাল পাড়বে। কিন্তু এরকম গাল অনেক খেয়েছি, ভালো লাগে নি, কিন্তু বাঁক বদল করি নি— আজও অন্য পন্থা আমার সামনে নেই তাতে বকশিষ পাই আর না পাই।

আমাকে তোমরা তোমাদের পছন্দসই হতে বলেচ, আর বলেচ তাতে বকশিষ মিল্‌বে। চেষ্টা হয়তো করতেও পারতুম যদি নিশ্চিত জানতুম তোমাদের পছন্দটাই টঁ্যাকসই, তাতে আমাকে কোনোদিন ঠক্‌তে হবে না। কি করে এত নিঃসংশয় হব বলো। অতএব নগদ বিদায়ের প্রত্যাশা ছেড়ে দিলুম। এমনি করেই সত্তর বছর যদি কেটে গেল তাহলে বাকি ক'টা দিনও কাটবে। আমি যা দিতে পারি তাই দেশকে দেব, তার পরে রাগ করে যদি ভাঙা কুলোয় আমার নামটা তোমরা বিদায় করো মৃত্যুর পরে সে আমাকে বাজবে না।

... ... যদি আমাকে চিঠি লিখ্‌তে চান নির্ভয়ে লিখ্‌তে বোলো আমি কখনো তাঁকে অসম্মান করব না। যাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল বা মনের মিল নেই তাঁদের সঙ্গে সেই অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক কারণবশত আমার ব্যবহারকে কলুষিত করতে আমি অক্ষম। অনেক সময় দেখ্‌তে পাই আমার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যের অভাব অহৈতুক, আমার অবাধ দাক্ষিণ্যসত্ত্বেও তা দূর হয় না। যেহেতু আমি অতিমানব নই সেই জন্যে সেটা

আমাকে বেদনা দেয় কিন্তু তাই বলে আমিও বেদনা দিয়ে তার শোধ নিতে গ্লানিবোধ করি। দৈবাৎ কখনো যদি আত্ম-বিস্মৃত হই তবে লজ্জা পাই।

কাজের ক্ষতি করেই তোমাকে এত বড়ো চিঠি লিখ্‌তে হোলো কেননা আমাকে ভুল বোঝা নিতান্তই সহজ। ইতি ৪ কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০২

২৮ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেয়ে দুঃখ বোধ করচি। তুমি কোনো অন্যায় করো নি অথচ তোমাকে অপমানিত হতে হোলো এ জন্য কাকে দায়ী করব জানি নে। কিন্তু এই সংশয় জালকে আর জটিল করে তুলো না। আমার অনেক কাজ আছে, অবকাশও অল্প। তোমাদের মত বিশ্বাস নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করতে পারি নে। তাতে তুমি এ পর্য্যন্ত দুঃখই পেয়েছ সান্ত্বনা পাও নি। অতএব এ রকম প্রশ্নোত্তর ক্ষান্ত করাই শ্রেয়।

তুমি যদি তোমার অবকাশকাল সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত করো তাহলে তোমার মন ভালো থাকবে, আর তোমার

স্বাভাবিক রচনাশক্তির যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যেও তার ফল ফলবে।

তোমরা আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১১ই কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০৩

৮ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

খড়দহ

কল্যাণীয়াসু

বিমলাকান্তর চিঠিখানি পড়ে সুখী হয়েছি, তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। তোমার মা আমাকে ভুল বুঝেচেন। অবশ্য ধর্ম্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি নে। তোমার মা আশঙ্কা করেছিলেন, খৃষ্টান মিশনারির মতো ব্রাহ্ম সমাজের আড়কাটির কাজে বুঝি আমার উৎসাহ। মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কেননা দল পুষ্টি করার ইচ্ছা মানুষের মনে প্রবল, তোমার মায়ের মনেও সে ইচ্ছা প্রবল বলেই তিনি সাম্প্রদায়িক লোক-সানের ভয়েই এত অত্যন্ত বেশি উত্তেজিত হয়েছেন— অন্যায় শাসনের দ্বারাও তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে কুণ্ঠিত হন নি। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ধর্ম্মই এই। ধর্ম্মের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই সকল কালেই দেখতে পাই সম্প্রদায় থেকে নির্গমনপথে নির্যাতনের

কাঁটার বেড়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সাম্প্রদায়িক অধিকার বৈষয়িক অধিকারেরই মতো— রাজার চেষ্টা প্রজাকে আপন শাসনে যেমন করে হোক ধরে রাখা, কেননা প্রজা যে রাজ্যের সম্পত্তি— সম্প্রদায়েরও তেমনি সম্পত্তির বোধ তীব্র। মানুষ সংসারআশ্রম থেকে মুক্তি কামনা করে সাম্প্রদায়িক আশ্রমে প্রবেশ করে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যে সাধুনামধারী বিষয়বুদ্ধি জাল পেতে আছে তার থেকে উদ্ধার করবে কে? ভূত ঝাড়াতে যে ওঝার শরণ নেয় তাকে যে আরো বড়ো ভূতে পেয়ে বসেচে।— যাই হোক্ আমি তোমার আর কোন্ অনিষ্ট করতে পারি জানি নে কিন্তু কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। কেননা আমি নিজেই যূথভ্রষ্ট, আমি ধর্ম্মসমাজের তক্‌মাপরা ছাপ-মারাদের মধ্যে কেউ নই,— রাজার দত্ত উপাধি আমি ত্যাগ করেছি সম্প্রদায়েয় দত্ত উপাধিও আমার নেই।

আগামী বৃহস্পতিবার সকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাচ্চি। ইতি ২২ কার্ত্তিক [১৩৩৯]

দাদা

১০৪

[শান্তিনিকেতন] ১৩ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কমলা লেকচারে নিযুক্ত হয়েছি। গাফিলি করবার জো নেই। বিষয়টা বিশেষ মনোযোগ করে লেখবার যোগ্য। সেই জন্যেই সম্প্রতি আর সমস্ত কর্তব্য পিছনে পড়ে গেছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, জোলো বাতাস বেগে বইচে পূব দিক থেকে, পাখীগুলো বিমর্ষ হয়ে আছে, সামনের ঐ শিউলি এবং টগর গাছে টুনটুনি পাখীদের লীলা দেখি রোজ, আজ তারা অনুপস্থিত— আমার উত্তর দিকের জানলার বাইরে পরিপুষ্ট ভ্যারেণ্ডা গাছটার শাখায় শাখায় খুব দোলাদুলি চল্‌চে, আর দোলা লেগেছে মালতীবেষ্টিত শিমুলগাছে, বিলিতি নিমগাছ থেকে শাদা শাদা ফুলগুলো ঝরে পড়চে রাস্তায়, আর টুপটাপ করে পড়চে গোলক-চাঁপা, আমার ঘরের সামনে অদূরে লাল মাটির রাস্তা চলে গেছে বোলপুর সহরে— আজ রবিবার হাটবার, গোরুর গাড়ি চলেছে মন্থর গমনে, খড়ের আঁঠি মাথায় নিয়ে চলেছে সাঁওতাল মেয়েরা, গোয়ালপাড়া গ্রামের দু চার জন গৃহস্থ মোটা চাদর গায়ে হাট করতে যাচ্চে ছাতা হাতে। ঐ এল অকস্মাৎ এক পসলা বৃষ্টি, মর্ম্মরিত হয়ে উঠল আমার মধুমঞ্জরীর লতামণ্ডপ— বৃষ্টিটা দ্রুত চলে গেল সাদা শাড়িতে ঢাকা প্রেতিনীর মতো মাঠের উপর দিয়ে পশ্চিম দিগন্তে। আজ প্রোফেসারি করবার দিন নয়-- কিন্তু দায় চেপেছে ঘাড়ে— আজ কলমের ভার গুরুভার মনে হচ্চে তবু

টেনে চল্‌তে হবে।— আমার গান তোমার ভালো লাগে শুনে খুসি হয়েছি। আমার নিজের মন সব চেয়ে আনন্দ করে আমার গানগুলো নিয়ে।

সজনীকান্ত তোমার জন্মদিনে যে কবিতা তোমাকে দিয়েচে সেটা পড়ে ভালো লাগল। আজ আর সময় নেই। ইতি ২৭ কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০৫

[শান্তিনিকেতন] ১৪ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি কি আজ পর্য্যন্ত কাউকে ভিতর থেকে আলো দিতে পেরেছি? আমি কি রকম জানো, যেন সূর্য্যরশ্মিতে উদ্দীপ্ত অগ্নিবর্ণ সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। সে আলো চোখে দেখতে পাবে, ভালো লাগ্‌বেও হয়তো,— কিন্তু রাত্রের অন্ধকার পথে চলবার জন্যে তার থেকে কেউ কি আলো সঞ্চয় করতে পারবে, কেউ কি জ্বালাতে পারবে আপন ঘরের প্রদীপ? বাহির থেকে দেখে মনে হতে পারে আমার কাছে চেয়ে নেবার জিনিষ কিছু আছে, যদি বা থাকে দেবার যোগ্যতা কই। যারা দেবার মানুষ তারা চুপ করে থাকেনা, তারা মানুষকে ডাক দিয়ে বলে, এসো আমার কাছে, নাও আমার হাত থেকে, না দিয়ে তাদের জো নেই। তারা সেই শ্রাবণের মেঘ, অজস্র বর্ষণ করেই যার মুক্তি।

আমার চিন্তাও হয়তো তাদের মতো কখনো কখনো আকাশে সঞ্চরণ করে, কিন্তু সে যেন শরতের মেঘ, কখনো কখনো দিগন্তে করে আনাগোনা— নানা রঙ লাগে তাতে, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তকে সে অভিনন্দন করে নানা সমারোহে, কিন্তু চাতক যখন বলে জল দাও তখন সে লজ্জিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। আমাকে আমার বিধাতা এই ফরমাসই করেচেন, তাঁর বিশ্বোৎসবে শোভাযাত্রায় সাজসজ্জার কাজে লাগব, শানাই বাজাব, পতাকা দোলাব, কখনো কখনো জগঝম্পও হয়তো বাজাতে পারি, কিন্তু দানদক্ষিণার ভার তাঁর যে বিভাগে সেখানে আমার অনধিকার। আমার উজ্জ্বল তক্‌মা দেখে লোকে হঠাৎ অনেক আশা করে আসে তার পরে যখন ফিরে যায় তখন তারা ভাবে আমি কৃপণ, গাল পাড়তে থাকে। আমি কৃপণ বলে দিই নে তা নয় আমার হাতে তহবিল নেই বলে দেওয়া অসম্ভব। যারা দেয় তাদের চারদিকে দলবল থাকে, দলবলের অভাবে আমি সকল কাজে অকৃতার্থ। ডাকব তাদের কী দিয়ে, খোরাক দেব কোথা থেকে ? যে রঙে চোখ ভোলে তাতে তো পেট ভরে না। এই জন্যেই আমার দেশে আমি প্রায় একাই কাটিয়ে দিলুম জীবনের শেষ বেলা পর্য্যন্ত। আমার কাজ আমার হোলো বোঝা। তবু কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে।

একটা কথা বলি তোমার কাছে, সেটা আশ্চর্য্য ঠেকে। পাশ্চাত্য দেশে এমন কথা অনেকের কাছেই শুনেচি, আমার বাণীতে আমি কেবল যে তাদের খুসি করেছি তা নয়, তারা জীবনের অন্ন পেয়েছে তার থেকে, যাত্রাপথের পাথেয়রূপে তারা

তার থেকে কিছু সংগ্রহ করেছে। এ কথা শুনে মনে হয়েছে আমার রচনার সাধনা সার্থক হোলো। সেই সঙ্গে এও ভেবেছি যে-ভাষায় দেশের লোককে কিছু পথ্য দিতে পারতুম সে ভাষা এবং উপযুক্ত ভঙ্গী আমার জানা নেই। মূককে বাচাল করে এমন শক্তি আছে, আবার বাচালকে মূক করে এমন বাধা আছে। আমার অনেক বাক্য আমার দেশে মূক হয়ে আছে আমার যে-ক্ষমতার অভাবে তার উপরে কি রাগ করা চলবে, সে কি আমার ইচ্ছাকৃত। তুমি অনেকবার আমাকে বলেচ, "তোমার নিজের মতো কথা না বলে আমাদের মতো কথা বলো তাহলে আদর পাবে।" চেষ্টা করতে গেলে আমার কথাও নষ্ট হোতো তোমাদের কথাও। অতএব এ যাত্রায় বেশি আশা করব না। তোমার অন্তর যে শান্তি যে সান্ত্বনা চায় আমি কেমন করে তা দিতে পারি? মনে বেদনা পাই, রোগী আত্মীয়কে দেখে আত্মীয় যেমন বেদনা পায়, কিন্তু হাতুড়ে হয়ে ডাক্তারি করব কোন্ সাহসে? তাই তোমাকে বলি আমার স্নেহ যদি গ্রহণযোগ্য হয় তো গ্রহণ কোরো কিন্তু শিক্ষা যদি চাও তবে মূক আমি।— তোমার নিজের মধ্যেই কল্পনাশক্তি আছে। যে গুরুকে ভৌতিকরাজ্য থেকে হারিয়েছ সেই গুরুকেই ভাবের রাজ্যে অমর করে পাবে, সেইখানেই তোমার শান্তি। তর্ক করে কি কখনো শান্তি দেওয়া যায়? ইতি ২৮ কার্ত্তিক ১৩৩৯

দাদা

১০৩

২৩ নভেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যে অনুভূতির মধ্যে কোনো একদিন তোমার আত্মা মগ্ন হয়েছিল, পরম আনন্দ পেয়েছিল, তার স্মৃতির প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা জন্মাতে ইচ্ছাও করি নে। অহঙ্কারের যে বন্ধনে আমরা নিজের ছোটো গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থেকে সংসারের প্রত্যেক তুচ্ছ জিনিষকে বড়ো করে তুলি, মানুষের স্তুতি নিন্দাকে একান্ত সত্য বলে কল্পনা করি তার থেকে যা তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে তাই তোমার পক্ষে শ্রেয়। অনেক সময় সংসার থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে ভোলাই যে নিষ্কৃতি পেয়েছি। সেই প্রমাদ যেন না ঘটে। সংসারের জাল থেকে মুক্তি পেয়েছি তার একমাত্র প্রমাণ হতে পারে সংসারেই। বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণের পথে উপদেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি তার সত্যকে নির্দ্দেশ করেছিলেন বিশ্বপ্রেমে। চরম সত্য যদি থাকেন সকলকে ব্যাপ্ত করে, তবে তাঁকে পাবার পন্থা সকলকে ত্যাগ করে নয়। সেই সত্যে যথার্থই অগ্রসর হয়েছি কিনা একদিকে তার প্রমাণ মন থেকে কলুষ কেটে যেতে থাকে যদি। আর দিকে প্রমাণ সকলের প্রতি প্রেম পূর্ণ হয়ে উঠল কিনা। কলুষ কেটে যদি থাকে তার প্রমাণ এই সংসারেই। আর প্রেম অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে তারও প্রমাণ এই সংসারে। কেননা মানুষের মধ্যে হাজার রকম বাধা আছে বলেই সেই

বাধা এবং তার কঠোর আঘাতকে অতিক্রম করতে পারলেই প্রেমের সার্থকতা। এই প্রেমের আনুষঙ্গিক যে সেবা সংসারেই তার বিশুদ্ধিতা প্রমাণ হয় শুধু তাই নয় সেই সেবায় সংসারেরই প্রয়োজন দেবতার নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেচেন দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রয়চ্ছেশ্বরে ধনং— দেবতা তো দরিদ্র নন, দরিদ্র যে মানুষ মানুষকে সত্য বস্তু দিতে পারলেই দেবতা স্বয়ং তা আদরে গ্রহণ করেন। তাই তোমাকে আমি বলি যে-সাধনায় তোমার চিত্তের পরিতৃপ্তি তাই তুমি একান্ত নিষ্ঠায় অনুসরণ কর— কিন্তু সেই সাধনার সার্থকতা যদি মানুষকে না দিতে পারো তাহলে তুমি যাই কল্পনা করো না দেবতা তা গ্রহণ করেন না। পৃথিবীতে মহাপুরুষ যে কেউ জন্মেছেন মানুষের কাছ থেকে দেবতা তাঁদের কেড়ে নেন নি— মানুষের কাছেই দেবতা তাঁদের প্রেরণ করেছেন। দেবতা আপন ভক্তকে পাঠান মানুষের কাছে। তাঁকে ভক্তি করেই ভক্তি ফুরিয়ে যায় না, সেই ভক্তি সত্য যদি হয় তবে তা প্রেমে অফুরান হয়ে মানুষের সংসারে দেবতার কৃপা নিয়ে আসে। তা যদি না হয় তাহলে দেবতাকে নিন্দা করব কৃপণ বলে। তিনি মানুষের ধনকে একলা নিজেই ভোগ করবেন মানুষকে কিছুই দেবেন না এতে তো তাঁর ঐশ্বর্য্য প্রমাণ হয় না। আমাদের কৃপণতা দেবতায় আরোপ করে তাঁকে ছোটো করি কেন? ইতি ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

দাদা

১০৭

[শান্তিনিকেতন] ৫ ডিসেম্বর ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সেই কমলা লেকচার লিখতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েচে। মানবের ধর্ম্ম বিষয়টা নিয়ে অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিয়েছিলুম, সেটা বই আকারে বেরিয়েচে। বাংলাভাষায় বক্তব্যটা সহজ করে তোলা সহজ নয়, চেষ্টা করতে হচ্চে খুব বেশি করে। অন্য কিছুতে মন বিক্ষিপ্ত করতে সাহস হচ্চে না। অথচ ইতিমধ্যে অনেক রকম অভ্যাঘাত ঘটেচে। এই শীতের সময় এখানে নানা দেশের নানা অতিথি সমাগম হয়। কয়েকজন জাপানী এসেছিলেন তাঁরা সারনাথে বুদ্ধমন্দির চিত্রালঙ্কৃত করতে চলেছিলেন। মালব্যজি এসেছিলেন তাঁকে নিয়ে দুদিন কাটল। তা ছাড়া এখানকার কর্ম্মের ধারা আছে।

কলকাতার কাজে আমাকে যেতে হবে আগামী দশই ডিসেম্বরে। প্রফুল্লজয়ন্তীর সভানেতৃত্ব অনেক চেষ্টাতেও এড়াতে পারলুম না। তার তারিখ এগারই। বারোই তারিখে স্বদেশী ভাণ্ডারের আরম্ভ কর্ম্ম। সেইদিনই অপরাহ্নে জাপানীদের এক সভায় আমার আমন্ত্রণ। তার পরে কবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা এখনো নিশ্চিত জানিনে। এটা কমলা লেকচার নয়। আমার প্রোফেসারি পদের প্রথম অভিভাষণ। তার পরে আরো বক্তৃতা পর্য্যায় ক্রমে চালাতে হবে। মনে করতে পীড়া বোধ হয়, ছুটির জন্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ এ কথাও সত্য যে নিতান্ত দায়ে না পড়লে আমার কুঁড়েমির তালা ভাঙে না।

অক্সফোর্ডেও যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তা বিস্তর পীড়াপীড়ির পরে। না দিলে আমার বলবার কথা অনুক্ত থাকৃত। কমলা লেকচারেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে লিখতে হোলো, অথচ দায়ে পড়ে যদি না লিখতুম তাহলে সেটা আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য হোত। বারে বারে আমার এই রকমই ঘটে থাকে। আমার অবস্থাটা ব্যস্ত, আমার স্বভাবটা কুঁড়ে— কেবলি দ্বন্দ্ব বাধে কিন্তু অবস্থারই জিৎ হয়। ছেলেবেলা থেকে আমি স্বভাবতই কুণো অথচ আমি যত দেশে-বিদেশে মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়িয়েছি এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আজ সমস্ত পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। বিশ্রামের জন্যে ছুটির জন্যে আমার অকর্ম্মণ্য মন নিরতিশয় উৎসুক অথচ আমাকে যত প্রভূত পরিমাণে কাজ করতে হয়েচে, এমন ঘোরতর কেজো লোককেও না। সাধ্যমতে স্বদেশকে নানা-প্রকারে সেবা থেকে আমি বঞ্চিত করি নি অথচ আনন্দের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে অব্যাঘাতে নির্ম্মমভাবে দেশের লোক আমাকে যত গাল দিয়েচে বাংলাদেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেউ নেই। এই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আমার জীবনে।

তোমার ইংরেজি লেখা দেখলুম। প্রকাশ করবার শক্তি তোমার স্বভাবতই আছে। বাল্যকাল থেকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজির চর্চ্চা করতে তাহলে ভালো লিখ্‌তে পারতে। তাতে লাভ কি হোত। যে লেখা শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা সরস্বতী অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন সে লেখা বাঙালীর কলমের মুখে প্রসন্ন হয়ে বিকাশ পায় না। বই পড়ার রাস্তায় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগসাধনটাই প্রশস্ত। সে কম লাভ নয়।

তুমি যদি দুই তিন বছর এই অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকো তাহলে তোমার বাধা কেটে যাবে। তাতে তোমার প্রকাশের উপকরণও অনেক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া সাহিত্যের বিচারশক্তিও প্রাদেশিকতা কাটিয়ে উদার হয়ে উঠবে। আমাদের মন আমাদের স্বদেশের, কিন্তু আমাদের কাল স্বদেশের নয়। দুইয়ের মিল করতে না পারলে পিছিয়ে থাকতে হবে। কালকে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেননা কালোহি বলবত্তরঃ— তোমার চেয়ে তার জোর বেশি— তার সঙ্গে রফা করতেই হবে। ইতি
৫ ডিসেম্বর ১৯৩২

দাদা

১০৮

[শান্তিনিকেতন] ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দেহ মন ক্লান্ত। ভিতরের আলো যেন নিবে আসচে বলে মনে হয়। সমস্ত অন্তঃকরণ কর্ম্ম থেকে বিরত হয়ে বিশ্রাম চায় কিন্তু আমার প্রতি কারো করুণা নেই, নিজের নিজের অতি ছোটো ছোটো কাজও আমার কাছ থেকে আদায় করবার দাবী করে। কাল বুধবারে পরের দায়ে কলকাতায় যেতে হবে। যাওয়াটা আমার শরীরের পক্ষে কত ক্লান্তিকর কেউ অনুমান করতে পারেনা। করলেও কেউ যে নিষ্কৃতি দেবে তার আশা ছেড়ে দিয়েচি অতএব শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলবে। আমার

জন্যে উদ্বেগ মনে রাখা বৃথা। আমার বয়সে দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন শেষ করবার সময় এসেচে। যৌবনে যে নৌকো মাঝদরিয়ায় তারই জন্যে ভাবনা করলে সেটা মানায়— যে এসে পৌঁছল ঘাটের কাছে তার তলায় ফুটো হলেই বা কি আসে যায়। ইতি ২ ফাল্গুন ১৩৩৯

দাদা

১০৯

২৯ মার্চ ১৯৩৩

ওঁ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

পাছে বিনা অপরাধে তোমাকে লাঞ্ছিত হতে হয় সেই জন্য চিঠি লিখি নে। আমার স্নেহ থেকে তুমি যে বঞ্চিত এমন আশঙ্কা কোরোনা।

শাপমোচন-এর পালা নিয়ে কলকাতায় এসেছি, অর্থের সন্ধানে। দুঃসময়। বিশেষ ফল পাব মনে করি নে তবু যা পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট।

"দুই বোন" বইখানি তোমাকে পাঠাব। এই অভিনয় থেকে ছুটি পাওয়ার অপেক্ষা করচি।

আজ এখনি রঙ্গমঞ্চ অভিমুখে রওনা হব। তোমার ছেলে মেয়েকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ২৯ মার্চ্চ ১৯৩৩

দাদা

তোমার চিঠি পড়তে আমার ভালো লাগে, তুমি জানো।

১১০

[শান্তিনিকেতন] ১৪ এপ্রিল ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আগে কাজের কথাটা শেষ করি। তোমার সেই মাতৃমূর্ত্তি-রচনার সঙ্কল্প জানিয়ে চিঠি যখন লিখেছিলে তখন ছিলেম বরানগরে, ভেবেছিলেম অবনের সঙ্গে দেখা হলে প্রস্তাবটা তাঁকে জানাব। দেখা হয় নি। যথাসময়ে যদি স্মরণ করিয়ে দাও কলকাতায় গিয়ে ওটাকে পুনরুত্থাপন করব।

আজ প্রাতে এখানে নববর্ষের উপাসনা হয়ে গেল। আশ্রমে এটা একটা বিশেষ দিন। সম্বৎসরে আমাদের ব্রতপালন-পথের পাথেয়সঞ্চয়ে যা ক্ষয় হয়েছে ক্ষতি হয়েছে আজ তাই পূরণ করে নেবার চেষ্টা করি।

ঘোর ঘনঘটা করে এলো বৃষ্টি। মাঠ ভেসে গেল জলে। নিবিড় ধারাবর্ষণের আবরণে আমার ঘরের সামনেকার গাছ-গুলি অবগুণ্ঠিত, আর্দ্র বাতাস বইচে বেগে, বৃষ্টির আঘাতে গোলক-চাঁপাগুলি ঝরে পড়চে মাটিতে, তালগাছের ছাঁটা ডালে কাক বসে আছে পাতার নীচে, অনতিদূরে কোথা থেকে ডেকে উঠ্‌চে একটা গোরু, বোধ করি বন্ধনমোচনের আবেদন জানিয়ে; আমার নিভৃত ঘর ছায়াচ্ছন্ন, আসর জমাবার মতো লোক নেই। আগেকার মতো দায়িত্ববিহীন অবকাশ যদি থাক্‌ত তাহলে বাতুলে সুর দিয়ে গান তৈরি করতুম, কিম্বা লিখতুম ছোটো গল্প।

আজ এখানে অধ্যাপকদের মধ্যে একটা বিয়ে আছে। সকালে গায়ে হলুদ হয়ে গেল— অত্যন্ত বেসুরো গ্রাম্য সানাই বর্ব্বর তারস্বরে আজ প্রাতঃকালের মেঘমেদুর আকাশকে যেন ক্ষতবিক্ষত করেছে এতক্ষণে ধারাপতনের তরল কল্লোলে তার শুশ্রূষা সমাধা হোলো।

নববর্ষের শুভকামনা জানিয়ে শেষ করি এই পত্র। ইতি
১ বৈশাখ ১৩৪০

দাদা

১১১

১৩ মে ১৯৩৩

ওঁ

Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

আশ্রয় নিয়েছি শৈলশৃঙ্গে। কিন্তু নিয়তি এখানেও এসে পৌঁছয়, তাঁর গাড়িভাড়া লাগে না। নানা কাজের দাবি, নানা লোকের নানা অনুরোধ, পূর্ব্বারব্ধ কর্ম্মের অনুস্মৃতি সমস্তই আমার দরজা পর্য্যন্ত পথ করে নিয়েছে। মাঝখানে এই ভিড় জমে উঠেছে, বিশ্রামের প্রত্যাশা রইল পড়ে তার পরপারে। কলকাতার মতো জায়গায় তার অসঙ্গতি হয় না কিন্তু এখানে তার পক্ষে অস্থান বলেই পীড়নটা লাগে বেশি।

আমাকে উপহার দেবার জন্যে উদ্বিগ্ন হোয়ো না। তোমার

আন্তরিক অভিনন্দন অনায়াসেই পৌঁছয় আমার অন্তরে। তার মূল্য তো কোনো প্রত্যক্ষ সামগ্রীর চেয়ে কম নয়। আমার জন্যে রঙীন মাটির হাঁড়ি আর শিকে কিনে রেখেচ। কাজে লাগবে। একদা আমার ঘরে কড়ি থেকে শিকেয় বদ্ধ হাঁড়ি আমার ডেস্কের উপর ঝোলানো থাকত— তার মধ্যে থাকত কালী কলম ইত্যাদি লেখ্যসামগ্রী। সন্দেশ যদি দাও আগে তার যথোচিত সৎকার করে তার পরে তাকে সাহিত্যিক ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা দেখতে পারি।

এখানে বাজারে ফুলকফি যথেষ্ট আছে, কমলানেবুর আমদানি এখনো স্বরু হয় নি— চেষ্টা করলে আম পাওয়া যায়। কিন্তু এ বৎসর দৈবদুর্য্যোগে আমবাগানের উপর অত্যাচার হয়ে গেছে, তাই ফলাহারের আশা সঙ্কীর্ণ। এখানে শাকসবজির অভাব নেই। এ বৎসরটা এখানে শীতটা আশাতীত, মাঝে মাঝে শিলবৃষ্টির সহায়তায় তার স্পর্দ্ধা বেড়ে উঠচে। রৌদ্র বিরল-দর্শন, ঘন সজল মেঘে আস্তীর্ণ আকাশের প্রাঙ্গণ।

১৫শে বৈশাখে সব প্রথমে সৌরভী ফুলের গুচ্ছ পেয়েছিলুম ইংরেজিতে যাকে বলে "সুইট্ পীজ্", সেটাকে যদি তোমার দান বলে স্বীকার করো তবে আমিও তাই স্বীকার করে নেবো।

অনেক পত্র উত্তর প্রত্যাশায় জমা হয়ে রয়েচে। তার মধ্যে একটা আছে তোমার রুচির। অতএব এই উপলক্ষ্যে বাসন্তীকে আশীর্ব্বাদ করে ছুটি নিলেম। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৪০

দাদা

১১২

[দার্জিলিং] ১৭ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর ভালো না থাকাতে এখান থেকে নেমে যাচ্চি। সোমবারে হয় তো গাড়ি পাওয়া যাবে। তাহলে মঙ্গলবারে জোড়াসাঁকোয় পৌঁছবার কথা।

তুমি আমার কাছে কাপড় প্রভৃতি যা প্রার্থনা করে নিয়েছ তাতে যদি তোমার প্রয়োজন না ছিল, যদি সেগুলো এত দেশ থাকতে তোমার প্রতিবেশীকেই দিয়ে ফেলা স্থির করলে তাহলে নিলে কেন আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারলুম না। তুমি যখন আমার চিঠিগুলি ··· ··· ··· ··কে দেখাতে ও দিতে আরম্ভ করেছিলে তখনি আমার মনে সঙ্কোচ বোধ হয়েচে— তার পরে আমার দান বলে যা তুমি গ্রহণ করলে তাও যখন তারই হাতে গিয়ে পৌঁছল তখন স্বভাবতই আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হোলো। যা হোক এখন আর ফিরে তাকাব না— কিন্তু কেন তুমি আমার অমর্য্যাদা করতে সঙ্কোচ বোধ করলে না জানিনে। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৪০

দাদা

১১৩

[দার্জিলিং] ১৯ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা পিছিয়ে গেল। আপাতত আগামী শুক্রবারে কলকাতায় রওনা হবার কথা চলচে— অর্থাৎ গাড়ি প্রভৃতির জোগাড় হলে শনিবারে জোড়াসাঁকোয় আমার আবির্ভাব হবে।

অনিন্দিতা দেবী পুরুষবিদ্বেষী। তিনি যত কিছু প্রবন্ধ লিখেচেন তাতে পুরুষের বিরুদ্ধে অন্তহীন নালিশ দেখতে পাই। তাই তিনি যত দোষ চাপিয়েছেন শশাঙ্কের স্কন্ধে। দোষ প্রকৃতি মায়াবিনীর— মানুষের চলবার পথে তিনি চোরা ফাঁদ পেতে রাখেন— বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে হঠাৎ সে পড়ে যায় গর্ত্তে। শশাঙ্কের সংসারযাত্রার রাস্তাটা পাকা রাস্তা ছিল না, হতভাগা একদিন ঘাড়মোড় ভেঙে পড়বার পূর্ব্বে সে কথাটা সকলেরই অগোচর ছিল— দিন চলছিল ভালোই কিন্তু তলায় ছিল ফাঁকা। নিশ্চিন্ত মনে হাসতে হাসতে এক মুহূর্ত্তে হাসি গেল থেমে। শশাঙ্কে শর্ম্মিলায় জোড় মেলে নি — হঠাৎ একদিন বাইরে থেকে চাড় লাগবার আগে সে কথা কি সবাই জানতে পায়— যখন জানা গেছে তখন তো কপাল ভেঙেচে। নীতিবিদরা বলবে, ফাটা কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ভালো-মানুষের মতো আবার সাবেক রাস্তায় উঁচোট খেতে খেতে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে চলা কর্ত্তব্য। তাই সে চল্‌ত। কিন্তু শর্ম্মিলা বললে তেমন চলায় কোনো পক্ষেই সুখ নেই। সে তাই কোনো

একরকম করে স্বহস্তে ভাগ্যকে সংশোধন করবার প্রস্তাব করলে। কিন্তু ভাগ্যের উপর কলম চালানো এত সহজ নয়। সেটা বুঝেছিল উর্ম্মিমালা— ভূমিকম্পের কেন্দ্রের উপরে কাঁচা মসলায় তৈরি নড়নড়ে বাসায় সে আশ্রয় নিতে নারাজ হোলো — দিলে দৌড়। ঠিক তার পরে কী ঘটলো তা কে বলবে। কালক্রমে কাটার দাগটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু ব্যথা ? ব্যথা যারা পায় তাদেরই আমরা বিচার করি— কিন্তু সব সময়ে ব্যথা ঘটাবার দায়িক কি তারাই ? বজ্রাঘাতে মোলো মানুষটা, তুমি বললে কিনা ওরি পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল। ওটাতে কেবল দোষ দেবার অন্ধ ইচ্ছের প্রমাণ হয় দোষের প্রমাণ হয় না। ইতি ১৯ জুন ১৯৩৩

দাদা

১১৪

[দার্জিলিং। ২৩ জুন ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। সজনীকান্তের সঙ্গে তোমাদের আলাপ পরিচয় হওয়াতে আমি লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হই নি। যে ঘটনাতে আমাকে হঠাৎ বিস্মিত করেচে সেটা এই— আমি কোনো কোনো লোকের চিঠিতে এই প্রশ্ন পেলুম যে, ⋯ ⋯কে আমি আমার একখানি বহির্ব্বাস ও কলম উপহার দিয়েছি এ কথা সত্য কি না ? অন্তত সে এই কথা অনেককে বলেচে ও

জিনিষগুলো প্রমাণস্বরূপ দেখিয়েচে।— শুনে ভাবলুম সেই জিনিষগুলো অনাদরে তুমি তাকে দান করেচ এবং এই রকম গুজোব রটাবার অবকাশ দিয়েচ। সজনীকান্তকে কলম প্রভৃতি দান করা আমার দ্বারা অসম্ভব হোত না, চাইলেই আমি নিঃসঙ্কোচে দিতে পারতুম। কিন্তু কথাটা অসত্য— এবং তুমি যে আমার কোনো দান তার কাছে ফেলে রাখবে এইটেই আমার কাছে অসঙ্গত লেগেছিল। তোমার চিঠি পেয়ে বোঝা গেল আমার দান তুমি তাকে দান করো নি— বাস্ কথাটা শেষ হোলো। কিন্তু তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, ··· ··· র সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব আমার কাছে অপ্রিয় এমন কথা কল্পনা কোরো না— যদি করো তবে সেটা আমার প্রতি অশ্রদ্ধার নিদর্শন হবে। আজ সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব। ব্যস্ত আছি। ইতি শুক্রবার

দাদা

কচির সমস্ত খবর পেয়ে খুসি হলুম।

১১৫

[কলিকাতা] ২৪ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

একটা কথা মনে রেখো— আমার উপর যে যতই অত্যাচার করুক কারো উপর রাগ পোষণ করে থাকা আমার ধাতে নেই।

আমি তাতে লজ্জা পাই। অতএব সজনীকান্ত সম্বন্ধে কোনো সঙ্কোচ কোরো না— তার সঙ্গে তোমাদের যে সম্বন্ধ হয়েচে সেটা রক্ষা কোরো তাতে আমি কোনোই অপরাধ নেব না। সজনীর চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো লোক আমাকে নিরন্তর আঘাত করেচে— যথা দ্বিজু রায়, চিত্তরঞ্জন, সুরেশ সমাজপতি— তারা যে আমার চেয়ে হিন্দুসমাজের দরদ বেশি বাঁচিয়ে চলত তা নয়, তাদের আহার বিহারের খবর সকলেরই জানা আছে— সজনীও নিজের আচারে হিন্দুসমাজের মান রক্ষা করে চলে তারও কোনো প্রমাণ নেই। অতএব এই কথাটা মানতে হবে যে অহৈতুক অনুরাগের মতোই অহৈতুক বিদ্বেষও আছে— ওটা প্রকৃতিসিদ্ধ। আমি কোনোদিন এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করি নি— এবং ভোলবারই চেষ্টা করেছি।

তোমার উপরে রাগ করেচি এই আশঙ্কা সকলের চেয়ে অসঙ্গত। যখন এই সংশয় মনে এল যে আমার দান তুমি অনাদরে বর্জ্জন করেচ তখন ক্ষণকালের জন্যে বিস্ময়ের ব্যথা অনুভব করেছি। যদি ব্যাপারটা সত্যই হোত তাহলে মনে করতুম, তুমি নিরাসক্ত,— সঞ্চয় করতে চাও না কিছুই। তাতেই বা দোষ কী।

আজ এসেছি কলকাতায়। ক্লান্ত। ও দিকে অমিয় অসুস্থ হয়ে দূরে আছে। কাজের বোঝা একা আমারই ঘাড়ে। চিঠি-পত্র লেখার সম্বন্ধে এবার সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দেবার সময় এলো। মাঝিকে তো প্রায়ই ডেকে বলি— "তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।" চেঁচিয়ে গলা ভাঙল—

কিন্তু মাঝি থাকে কোন্ পাড়ায় ? সাড়া তো মিলল না। ইতি
১০ আষাঢ় ১৩৪০

দাদা

১১৬

২৫ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার ঘরে তোমার আমসন্দেশের ভোগ চলচে। হাঁড়িগুলি বড়ো সুন্দর— আমার গৃহসজ্জায় কাজে লাগবে। আমাদের সাধারণ লোকের রঙের দৃষ্টি অনিন্দনীয়— পৃথিবীতে তার খ্যাতি আছে। আমাদের দেশে— লেখাপড়া করে যেই, সে হতভাগা গাড়িঘোড়াতেও চড়ে না, তার উপরে তার স্বাভাবিক শিল্পরুচিতেও ঘুণ ধরে যায়। শান্তিনিকেতনে আমরা পটারি অর্থাৎ পাত্র-শিল্পের প্রবর্ত্তন করেছি। তোমার এই হাঁড়িসরাগুলি কাজে লাগবে।

আমার মেজাজ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকো। আমি রাগী স্বভাবের লোক নই— বরঞ্চ কিছু পরিমাণে বিরাগী হতে পারি। নিবিড় আসক্তিপ্রবণতা সাহিত্যের ক্ষতি করে। কাছে থেকেও দূরত্ব না রাখতে পারলে স্পষ্টদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। সকল সাধনাতেই এই কথা খাটে। ইতি রথযাত্রা
[১১ আষাঢ়] ১৩৪০

দাদা

১১৭

[জুন ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সম্প্রতি নির্জ্জীবকুমারের আখ্যা আমাতেই খাটে। মন ও দেহ উভয়েই কর্ম্মের প্রতি বিমুখ। ছুটির কামনা করচি। কিছুদিনের মতো কলকাতায় আবদ্ধ আছি— সেটা আমার পক্ষে প্রীতিকর নয়। ইতি

দাদা

১১৮

১৩ জুলাই ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

নিতান্তই চুপচাপ করে থাকব পণ করে ছিলুম। চারদিকের ছোটোখাটো দাবী চারদিক থেকে ঠেলা মেরে আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি সানুনয়ে সবার কাছ থেকে ছুটি চেয়েছি। অনেক কাল দশের ফরমাস জুগিয়ে হয়রান হলুম, যে কয়টা দিন বাকি আছে নিজের খেয়ালের রাজ্যে স্বেচ্ছায় সঞ্চরণ করে সময় কাটাব এইটে দাবী করবার অধিকার আমি অর্জ্জন করেছি। কিন্তু ভিড়ের ধাক্কা এখনো ঘাড়ের উপর এসে পড়ে। একটু ফাঁকা পেলে বাঁচি, পাই নে। প্রথম বয়সে জীবনে এই

ফাঁকা ছিল, সেই ছিল বাল্যলীলার ক্ষেত্র; মাঝবয়সে ডাক পড়ল কর্ম্মশালায়, ফাঁকি দিই নি। আজ দিনাবসানে তারার আলোয় বড়ো করে আসন বিছিয়ে বসতে হবে,— কিছুই না করবার সেই আয়োজনও প্রশস্ত জায়গা চায়। ঠেলাঠেলির মধ্যে খেলাও হয় না বিরামও হয় না।

কলকাতায় একদিন আমার অনুপস্থিতিকালে তোমার প্রেরিত মিষ্টান্ন পেয়েছিলুম— এখানে এসে তার ভোগ সমাধা হোলো। তোমার সেই মেলায় কেনা চিত্রিত হাঁড়িগুলো আমার টেবিলের উপর নৈষ্কর্ম্যে বিরাজমান। আমার চেয়ে তাদের ভাগ্য ভালো— রান্নাঘরে কেউ তাদের টানাটানি করবে না, রঙীন অবকাশ ভোগ করচে তারা। ইতি ২৯ আষাঢ় ১৩৪০

দাদা

১১৯

২৪ জুলাই ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনিন্দিতার চিঠি ফেরৎ পাঠাই। "দুই বোন" নিয়ে তাঁরই সঙ্গে যে তোমার পত্রালাপ ঘটেছিল সে কথা কাউকে বলি নি বলবার সুদূর আশঙ্কাও নেই।

সমাজ যেখানে সম্পূর্ণ অকারণে অন্যায় উৎপীড়ন করবার অধিকার কোনো এক পক্ষকে দিয়ে থাকে তখন সেটাকে বিনা

বিদ্রোহে সহ্য করা দুঃসহ। কিন্তু বিদ্রোহের দ্বারা যেখানে আত্ম-সম্মানের লাঘব হয় এবং অন্যায়ের প্রতিকার না করে তাকে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয় সেখানে সহিষ্ণু হয়ে যে স্থির থাকতে পারে আসলে তারই জয় হয়। তুমি শান্তভাবে সেই জয়ই লাভ করো। তোমার স্নায়ু পীড়িত বলেই তোমার পক্ষে এই শান্তি দুরূহ। তবু দুঃসাধ্য সাধনই করতে হবে, কারণ অন্য রকম বিপ্লবে তোমার সেই পীড়িত স্নায়ুকে আরো ক্ষুব্ধ করে তুলবে। তোমার সমস্ত সম্পদকে অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত করে তাকে তোমাকে আধ্যাত্মিক আনন্দের সহায় করে তুলো। ইতি
২৪ জুলাই ১৯৩৩

দাদা

১২০

[সেপ্টেম্বর ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দুঃসহ ক্লান্তিতে অভিভূত। এখনি চলেছি বরানগরে। দুচার দিন থাকতে হবে— একটা কাজ আছে।

আয়া ও হলা মালি সম্বন্ধে যা লিখেচ আমারো মনের কথা তাই। হলামালীর স্বদেশীয় একটি সেবক আমার আছে— সে যদি উড়ে মিশোলো ভাঙা বাংলায় কথা কইতো, তার কাছ থেকে আমার শিক্ষা হোতো— কিন্তু সে কথা কয় বিশুদ্ধ গৌড়ীয়

রীতিতে। পুরোণো আয়ার পরিচয় আছে— তার নাম ভজিয়া, আমার ছেলেমেয়েদের কাছে ছিল। তার ভাষায় খোট্টাই ছিলো না, ছিলো সুরে— সেটা বইয়ে প্রকাশ করা যায় না। অসংশোধিত কোনো আয়াকে চিনি নে— সম্প্রতি একজন ছিল আমার ঘরে তার ভাষা হিন্দুস্থানী— ব্যবহার করতে হলে সঙ্গে ব্যাখ্যাপুস্তকের প্রয়োজন হোত। তবু মালী ও আয়ার ভাষা গল্পের বইয়ে বাঁকা করতে পারলে মানানসই হোত। যখন খুসি চিঠি লিখো— দেখা যদি করো খুসিই হব।

দাদা

১২১

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ।

ডাকাতকে ভয় করবার মতো অবস্থা আমার এখন নেই। যদি ভ্রমক্রমে কেউ ঘরে পদার্পণ করে তবে চাঁদা তুলে তাকে নৈরাশ্য দুঃখ থেকে রক্ষা করতে হবে।

তোমার খাতাখানি শেষ করেছি। যেখানে বর্ণনা করেছ গল্প করেচ বেশ লাগল পড়তে। যেখানে তর্ক করেচ সেখানটা আমার কাছে ব্যর্থ হয়েছে। মনের প্রবল আক্ষেপে তুমি আমার অনেক কথা ভুল বোঝো। তোমাদের হিঁদুয়ানিতে অত্যন্ত

বেশি আধুনিক ঝাঁজ — তাতে সাবেক কালের পরিণতির মোলায়েম রঙ লাগেনি। মিশনারিদের মতোই ভঙ্গী তোমাদের। যেন হিঁদুয়ানির মোল্লা মৌলবী। গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়। যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড়-বেরকরা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ— আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ— সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্যদ্বারাই চিরশুচি,— সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ।— তোমাকে কিছু বই দিতে চাই— রেজেষ্ট্রি না করলে পূজোর বাজারে বই গিয়ে পেঁছয় ডাকবিভাগের অন্তঃপুরে— কোন্ ঠিকানায় পাঠানো চলবে জানিয়ো। বিজয়াদশমী
[১২ আশ্বিন] ১৩৪০

দাদা

১২২

৪ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শরৎকালের আলোয় ছুটির আমন্ত্রণ আকাশে আকাশে। কোনো কাজ না করবার মতো মেজাজে আছি, অথচ কাজ এসেচে ভিড় করে। মন ক্লান্ত হয়ে আছে অথচ কলমের বিশ্রাম নেই।

আমি মাটির মানুষ, তার মানে এ নয় যে ভালোমানুষ আমি। তার মানে এই যে ধরণীর মাটির পাত্র থেকেই আমি অমৃত পান করি— জলস্থল আকাশে আমার মনের খেলাঘর। মেয়েরা শ্বশুরঘরের উপর বিরক্ত হলেই বাপের ঘরে চলে যায়। তেমনিতরো মনের ভাব নিয়েই মানুষ দৌড় মারতে চায় বৈকুণ্ঠের দিকে— এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর উপর আমার যদি তেমন বিতৃষ্ণা হোতো আমিও তাহলে বৈকুণ্ঠের প্রতি বিশ্বাসকে আঁক্ড়ে ধরতুম। দরকার হয়নি বলে কল্পনাও করি নে। আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি— আমার কাছে এই মর্ত্ত্যের রূপই আনন্দ-রূপ অমৃতরূপ— একে অবজ্ঞা করি এত বড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। এর চেয়ে আরো কিছু উঁচু আছে বলে যে মনে করে, তার নিজের চোখে দোষ আছে! আমার এই উত্তরের দিকের জানলা দিয়ে নীল আকাশ ঢেলে দিচ্চে তার আলোকসুধা, পূর্ব্বদিকের খোলা দরজার সামনে উদার পৃথিবী তার শ্যামল আমন্ত্রণ প্রসারিত করে ধরেছে— আমি এই সোনার ধারা সবুজ ধারার মোহানায় বসে দুই চক্ষুকে ছাড়া দিয়েচি, বেলা যাচ্চে কেটে— আর কি চাই আমার— বুঝতেই পারি নে যতসব হযবরল মন্ত্র। এতবড়ো সুস্পষ্টতার মধ্যেও উপলব্ধি যদি না হয় তবে কিছুতেই হবে না। ইতি ৪ অক্টোবর ১৯৩৩

ভজনপূজনহীন দাদা

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি তো মুক্তিকামী বিলাসী মাটির পৌত্তলিক নই। মর্ত্যের মধ্যে অতিমর্ত্যকে যদি না উপলব্ধি করতুম তাহলে স্বর্গকামী ভিক্ষুবৃত্তি করে কি বাঁচতুম? জগৎ অসম্পূর্ণ, তাই বলেই কি একেবারে সংসার ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে? বীণাটার তার ঠিকমতো বাঁধা হয় নি, তাই বলেই কি নারদের বীণার খোঁজ করতে হবে? যারা তাই করে তারা সুর বাঁধার দায়িত্ব নেয় না। এই অপূর্ণতাতেই শুদ্ধ সুরের আদর্শ আছে সেই জন্যেই এত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে সুর বাঁধতে লেগেছেন — যথার্থ আনন্দ তাতেই। বৈকুণ্ঠপুরী যদি সত্যই কোথাও থাকে তাহলে সেখানে মর্ত্যের মানুষ টিঁকতে পারবে না। এই পৃথিবীর মাটি দিয়েই আমাদের নিজের বৈকুণ্ঠ নিজেদেরই সৃষ্টি করতে হবে। সেইজন্যেই মানবসংসারে দ্বৈত আছে — যেমন আছে অপূর্ণতা তেমনিই আছে পূর্ণতার আদর্শ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

এই বস্তুগত জগতেই আত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিজের শক্তির দ্বারাই জয় করে নিতে হবে — শাস্ত্রের সংযম নিয়ে, স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় করবে না। চিরভোগ্যবস্তুরা নয় চিরবোধ্য বস্তুরা। এই বস্তুগুলোকে নিজের শক্তি দিয়েই উদ্ধার করতে হবে। তোমরা জানো কেবলই লক্ষ্মীকে ডাকলে লক্ষ্মী আসেন না — যাঁরা নিজের সাহসে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করে আটকে রাখে দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁরাই তো লক্ষ্মীকে পান। —

তোমাকে বিচিত্রার খাতা পাঠিয়ে দিলুম — কাগজখানার দামের মধ্যে স্বাক্ষরের দাম আছে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পাই নি। ইতি ১১ অক্টোবর ১৯৩১

দাদা

১২৩

১১ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি তো মৃত্তিকাবিলাসী মাটির পৌত্তলিক নই। মর্ত্ত্যের মধ্যেই অতিমর্ত্ত্যকে যদি না উপলব্ধি করতুম তাহলে গর্ত্তবাসী কীটবৃত্তি করে কি বাঁচতুম? জগৎ অসম্পূর্ণ, তাই বলেই কি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সান্ত্বনা পেতে হবে? বীণাটার তার ঠিকমতো বাঁধা হয় নি, তাই বলেই কি নারদের বীণার ধ্যান করতে হবে? যারা তাই করে তারা সুর বাঁধবার দায়িত্ব নেয় না। এই মর্ত্ত্যবীণাতেই শুদ্ধসুরের আদর্শ আছে সেই জন্যেই এত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে সুর বাঁধতে লেগেছেন— যথার্থ আনন্দ তাতেই। বৈকুণ্ঠপুরী যদি সত্যই কোথাও থাকে তাহলে সেখানে মর্ত্ত্যের মানুষ টিঁকতে পারে না। এই পৃথিবীর মাটি নিয়েই আমাদের নিজের বৈকুণ্ঠ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে। সেই জন্যেই মানবসংসারে দ্বৈত আছে— যেমন আছে অপূর্ণতা তেমনিই আছে পূর্ণতার আদর্শ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ এই বস্তুগত জগতেই আত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিজের শক্তির দ্বারাই জয় করে নিতে হবে— পাণ্ডার শরণ নিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির আশা করব না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা নয় বীরযোগ্যা বসুন্ধরা। এই বসুন্ধরাকে নিজের বীর্য্য দিয়েই উদ্ধার করতে হবে। তোমরা আল্পনা কেটে লক্ষ্মীকে ডাকো লক্ষ্মী আসেন না— যাঁরা বীর্য্যের সহায়ে লক্ষ্মীকে আহ্বান করেন আজকের পৃথিবীতে তাঁরাই তো লক্ষ্মীকে পান।—

তোমাকে বিচিত্রিতা পাঠিয়েছিলুম— কালুঘোষের দরোয়ানের স্বাক্ষরিত রসিদ আছে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পাই নি। ইতি ১১ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

১২৪

১৬ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি নিজেকে অত্যন্ত মিথ্যা পীড়ন কর। তোমার প্রতি আমার লেশমাত্র রোষ বা অবজ্ঞার ভাব নেই সে তুমি নিশ্চয় জানো তবু থেকে থেকে নিজের মধ্যে একটা বিপ্লব বাধিয়ে তোলো। তোমাকে উপলক্ষ্য করে আমি অনেক কথা বলি কিন্তু তোমাকে বলি নে। দেশের অসীম দুর্গতির কথায় মন যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তখন চুপ করে থাকতে পারি নে। ধর্ম্মে ও নিরর্থক আচারে হিন্দুকে শতধা বিভক্ত করে রেখেচে, বিদেশীর হাতে তাই পরাভবের পর পরাভব ভোগ করে আসচি। অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রুর হাতে মার খেয়ে খেয়ে আমাদের হাড় জীর্ণ। মুসলমান, ধর্ম্মে এক, আচারে এক, বাংলার মুসলমান, মাদ্রাজের মুসলমান, পাঞ্জাবের মুসলমান এবং ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমান সমাজে সবাই এক, বিপদে আপদে সবাই এক হয়ে দাঁড়াতে পারে এদের সঙ্গে ভাঙাচুরো হিন্দুজাত পারবে না। আরো একবার আফগানিস্থানের পাঠানদের হাতে কানমলা

খাবার দিন ঘনিয়ে আসচে। পি, সি, রায় অরণ্যে রোদন করচেন, বলচেন বাঙালীর অন্ন পরের হাতে যাচ্চে। কিন্তু বাংলার মুসলমানরা পিছয় নি— দেশে বিদেশে তাদের দেখেচি জীবিকা উপার্জ্জনে— কেননা বিধিনিষেধের নাগপাশ তাদের হাজার পাকে জড়িয়ে রাখে নি। মজ্জাগত অনৈক্যজনিত দুর্ব্বলতা এবং সহস্রবিধ বিধিনিষেধের বোঝা ঘাড়ে করে এই জাত বাঁচবে কী করে? সামাজিক অসম্মান থেকে বাঁচবার জন্যে প্রতিদিন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান এবং খৃষ্টান হতে চলেচে— কিন্তু ভাটপাড়ার চৈতন্য নেই। একদা ঐ তর্করত্নদের প্রপৌত্রমণ্ডলীকে মুসলমান যখন জোর করে কলমা পড়াবে তখন পরিতাপ করবারও সময় থাকবে না।

এই সব মনের দুঃখ তোমার কাছে মাঝে মাঝে ভাষায় প্রকাশ করি তাতে ক্ষতি হয়েচে কি? দেশের কথা চিন্তা করে যে কঠিন আঘাত আমাকে বাজচে সেটা তুমি ভেবে দেখ না কেন? দেশের জন্যে আমি তোমাকেও ভাবাতে চাই— তুমি কি দেশের মেয়ে নও? ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে বেদনা দিতে আমার একটুও ভালো লাগে না— কিন্তু বিধাতার অভিসম্পাতে যে বেদনা প্রায় বিশকোটি হিন্দুর প্রাপ্য চোখ বুজে নিজেকে ভুলিয়ে তুমি তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে কী করে? এ সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক নয়— এ সমস্ত দুর্ভাবনা চতুর্দ্দিকব্যাপী সুকঠোর বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রিক অধিকারের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে আলোচনা চল্‌চে আজকাল— যেন লঙ্কাভাগ করতে বসেচি অথচ সমস্ত লঙ্কাই যাচ্চে তলিয়ে। তুমি তো সন্তানের জননী,

হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ তোমার ছেলেমেয়েদের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে একদিন তুমি চলে যাবে। কিন্তু সে কী ভবিষ্যৎ, ভেবে দেখো।

আমার এই সমস্ত কথা শুনে কখনো মনে কোরো না তোমার প্রতি আমি নির্ম্মম। তোমার আচার বিচার যেমনি হোক্ না কেন তোমাকে আমি স্নেহ করতে পারব না আমার হৃদয় এত কৃপণ নয়। আমার প্রতি বিশ্বাস রেখো এবং ভুল বুঝে নিজেকে পীড়ন কোরো না। ইতি ১৬ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

১২৫

২২ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীরটা ভালো নেই। ভাবচি বোটে করে গঙ্গাযাত্রা করব। খড়দহের সামনে বোট বাঁধা আছে। যদি যাওয়া নিশ্চিত স্থির করি কলকাতা হয়ে যেতে হবে তখন তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। মতামত নিয়ে তোমার সঙ্গে আর বাদানুবাদ করব না মনে করি, স্বভাবদোষে হঠাৎ বকুনির উদ্ভব হয়। তুমিও চুপ করে সহ্য করবার মেয়ে নও, তাই দ্বন্দ্ব বাধে। ওর চেয়ে, তুমি যে খিচুড়ি রাঁধবার প্রণালী লিখে পাঠিয়েছ সেটা অনেক বেশি উপাদেয়। আমাদের এখানে একজন রন্ধনপটু ভোজনবিলাসী মানুষ আছে সে তোমার ডাল ও খিচুড়ির স্বাদ গন্ধ কল্পনা করে

পুলকিত, আমাকে যথাবিধি রেঁধে খাওয়াতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। এমনি করে পরোক্ষে তোমার ভোজের নিমন্ত্রণ মাঝে মাঝে আমার ভাগ্যে জুটবে এমন একটা পন্থা পাওয়া গেল। সেই মানুষটা কিছুদিন থেকে নূতন প্রণালীর মোচার ঘণ্ট কোথা থেকে আবিষ্কার করে উত্তেজিত হয়ে আছে। একদা পদ্মার চরে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র কিছুকাল আমার অতিথি ছিলেন — প্রতিদিন তাঁর জন্যে নূতন একটা করে ভোজ্য আমি উদ্ভাবন করেছি— সেটা প্রস্তুত করবার ভার ছিল যাঁর পরে তাঁরও কিছু কৃতিত্ব তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এসব তিনি লিখে রেখেছিলেন খাতায়, সেই খাতা দখল করেছিল আমার বড়ো মেয়ে— সেও নেই, খাতাও অদৃশ্য— গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে ভোগ খাদ্য নিরবধি, তার উপায় রইল না, অথচ রইল কতকগুলো কবিতা। ইতি ২২ অক্টোবর ১৯৩৩

দাদা

১২৬

৫ নভেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার বয়সের নিশ্চিত খবর আমার কাছে জানতে চেয়েচ। আমি ত্রিকালজ্ঞ নই তবু ধ্যানযোগে যেটুকু জানলুম তাতে বোধ হচ্চে তোমার বয়স একশো দেড়শোর কম হবে না— দাশরথী রায়ের চেয়ে বোধ করি কিছু ছোটো হবে। ষাট বছর পূর্ব্বে

আধুনিক কালের প্রথম যুগে রবি ঠাকুর যে সব ছড়া রচনা করত সেগুলো স্বভাবতই তোমার প্রাচীন বয়সের মনঃপূত ছিল। বর্ত্তমান যুগের নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা রচনা করে তার অর্থ বোঝবার মতো বয়স তোমার অনেককাল হোলো পেরিয়ে গেছে— বোধ করি রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার পূর্ব্বেই। তোমার আগামী জন্মদিনে তোমাকে শিবায়ন মনসামঙ্গল কিনে পাঠিয়ে দেব— পড়ে খুসি হবে, ভূষণের মাকেও পড়ে শোনাতে পারবে— কিন্তু খুকুকে শোনাবার চেষ্টা করলে অশান্তির কারণ ঘটবে বলে আশঙ্কা করি।

আমার এখানে সুধাকান্ত রায় চৌধুরী নামে একটি ভদ্রলোক আছে রন্ধন ব্যাপারেই তার সব চেয়ে উৎসাহ। তোমার পূর্ব্ব পত্রের এক অংশ শুনে তার ঔৎসুক্য প্রবল হয়েছিল। তোমার এবারকার চিঠির ত্রয়োদশপদী মোচার ঘন্টর তালিকা দেখিয়ে তার উল্লাসবর্দ্ধন করব এই আমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু সেটা মীরা নিয়ে গেল বলপূর্ব্বক। তারও রাঁধবার শক্তিও আছে অনুরাগও আছে। তার সকলের চেয়ে বড়ো সখ বাগানে। তার বাড়িটি ঘিরে যে বাগান বানিয়েছে যে দেখে সেই বিস্মিত হয়।

তোমাকে পুরো বহরের চিঠি লিখ্‌তে পারব না। দুর্ব্বল শরীর নিয়ে গিয়েছিলুম বোটে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংগ্রহ করে দুর্ব্বল-তর অবস্থায় ফিরে এসেছি— কিছুকাল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন।

সেই যে পথিক ভদ্রলোকটির মাথায় বৃক্ষবৃষ্টির দ্বারা

কল্যাণীয়াসু

তোমার বয়সের হিসেবে খবর আমার কাছে ফাঁকাতে বসেছে। আমি নিকাশের এই তবু হিসাবমতো যেটুকু জানলুম তাতে বোধ হচ্ছে তোমার বয়স একাশি তেরাশির কম হবে না – দাশরথী রায়ের চেয়ে বোধ করি কিছু ছোটো হবে। ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক কালের প্রথম যুগে রবি ঠাকুর যে সব ছড়া রচনা করত সেগুলো স্বভাবতই তোমার প্রাচীন বয়সের মনঃপূত ছিল। বর্তমান যুগের নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা রচনা করে তার অর্থ বোঝবার মতো বয়স তোমার সাবেককালে হোলো নাকি, লোকে বোধ করে রবীন্দ্রনাথ সম্মানার্হ প্রাচীন। তোমার আগামী জন্মদিনে তোমাকে শিশুদের মনোরঞ্জন কিছু পাঠিয়ে দেব – পড়ে খুসি হবে, দুচোখের মধ্যেও যার দোলাতে পারবে – কিন্তু খুকুকে বোঝাবার চেষ্টা করলে

অশান্তির কারণ ঘটবে বলে আশঙ্কা করি।

আমার এখানে সুধীরকান্ত রায় চৌধুরী নামে একটি ভদ্রলোক আছেন তাঁর ব্যাপারেই তার সব চেয়ে উৎসাহ। তোমার পুস্তিকার এক অংশে খুব তাঁর ঔৎসুক্য প্রবল হয়েছিল। তোমার এবারকার চিঠির প্রত্যক্ষসাক্ষী মোহান্ত ঘটনার তালিকা দেখিয়ে তার উল্লাসবর্দ্ধন করব এই আমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু সেটা মীরা নিয়ে গেল বলপূর্ব্বক। তারও উৎসাহ শক্তিও আছে অনুরাগও আছে। তার সকলের চেয়ে বড়ো সখ বাগানে। তার বাড়িটি ঘিরে যে বাগান বানিয়েছে যে দেখে সেই বিস্মিত হয়।

তোমাকে পুরো ওজনের চিঠি লিখতে পারব না। দুর্ব্বল শরীর নিয়ে গিয়েছিলুম কাশী, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সংগ্রহ করে দুর্ব্বলতর অবস্থায় ফিরে এসেছি — কিছুকাল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন। সেই যে পথিক ভদ্রলোকটির মাথায় বৃহস্পতির দ্বারা অলৌকিক সাহিত্যজ্ঞতা সঞ্চারের সুযোগ ঘটিয়েছিলে তাঁর হাল অবস্থা জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত আছি। তাঁর গৃহিণী অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশে কী রকম বাক্যবৃষ্টি করেন সেটাও জানবার যোগ্য। ইতি ৩ নবেম্বর ১৯৩৩ দাদা

তরোরিব সহিষ্ণুতা সাধনার সুযোগ ঘটিয়েছিলে তাঁর হাল অবস্থা জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত আছি। তাঁর বাড়ির গৃহিণী অনির্দ্দিষ্টার উদ্দেশে কী রকম বাক্যবৃষ্টি করচেন সেটাও জানবার যোগ্য। ইতি ৫ নবেম্বর ১৯৩৩

দাদা

১২৭

[নভেম্বর ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার প্রাচীনতা নিয়ে উপহাস করেছিলুম। সেটা ফেরৎ নিতে চাই। এবারকার চিঠির সঙ্গে যে কবিতা পাঠিয়েছ সেইটেই যথোচিত উত্তর হয়েছে। দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক আধুনিক তরুণ কবির কাব্যরস অন্তরে ও লেখনীমুখে গ্রহণ করতে পেরেছ। যদি তোমার সম্মতি পাই তবে ওটা কোনো একটা কাগজে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি। তোমার নাম প্রকাশ করা হয়তো তোমার অভিপ্রেত হবে না— অনাম্নীভাবেই চালানো যেতে পারে।

শরীর ভালো নেই। আগামী ২১ নবেম্বর বোম্বাই যাত্রা করতে বাধ্য। কর্ম্মবন্ধনের ফাঁস লাগিয়ে অনিচ্ছুককে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে। বোলপুর থেকেই যাত্রা করব। ফিরতে বোধ করি ১৫ ডিসেম্বর।

তোমার চিঠিতে মাঝে মাঝে তোমার ইচ্ছাময়ী কন্যার

যে ছবি পাই আমার খুব ভালো লাগে। তোমার প্ল্যানমতো ওর মনটাকে ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা কোরো না— ও নিজের ভিতর থেকে আপনাকে আপনি ঠিকমতোই উদ্ভাবিত করে তুলবে সেইটেতেই ওকে রমণীয় করবে সন্দেহ নেই। ওর যে স্বাতন্ত্র্য আছে সেটা মূল্যবান জিনিষ।

আজ আর আমার কলম চলচে না— ছুটি নিই। ইতি

দাদা

১২৮

[বোম্বাই] ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ে এসেছি বোধহয় খবরের কাগজে পড়ে থাকবে। ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। বাংলাদেশের লোকের মতো এরা আমাকে অত্যন্ত বেশি জানে না, তাই আমাকে অত্যন্ত বেশি শ্রদ্ধা করে। তাই অভ্যর্থনার বিরাট পর্ব্বের পালা চলচে। এতটা আমার সয় না। এখান থেকে কাল যাত্রা করব ওয়াল্‌টেয়রে, সুদীর্ঘ পথ। সেখানে পৌঁছিয়েই বক্তৃতার পর্য্যায় আরম্ভ হবে। তার সঙ্গে অভিনন্দন ইত্যাদি। তার পরে খুব সম্ভব ১২ কিম্বা ১৩ই ডিসেম্বরে সেখান থেকে যাত্রা করে কলকাতায় গিয়ে হাজির হব ১৪ই কিম্বা ১৫ই। সেখানেও কিছু কাজ আছে— জোড়াসাঁকোয় দুই একদিন থেকেই বরা-নগরে আশ্রয় নিতে হবে— কলকাতায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

অবশেষে শান্তিনিকেতন। এখানকার লোকদের খুসি করতে পেরেচি কারণ বাঙালীর মতো এরা নিরতিশয় বুদ্ধিমান নয়।

অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছিলুম এখানে ভালো আছি। ইতি
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৩

দাদা

১২৯

৪ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অকস্মাৎ তোমার চিঠিতে অত্যন্ত ক্ষোভের ভাষা দেখে আমি কারণ কিছুই ভেবে পেলুম না। তুমি লিখেছ সাহিত্য আশ্রয় করে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছি— কোথায় করেছি অনেক ভেবে স্থির করতে পারি নি— অর্থাৎ আমার কোন্ লেখার কোন্ অংশে এমন কিছু আছে যার থেকে তুমি কল্পনাও করতে পারো যে আমি তোমাকেই লক্ষ্য করে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছি আমি তা অনুমান করতে পারলুম না। এমনতরো প্রচ্ছন্ন আঘাত আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করতে পারি এও তুমি কী করে চিন্তামাত্র করতে পারো এই আমার কাছে নিরতিশয় বিস্ময়কর মনে হচ্চে। আমার স্বভাবে এ রকম হীনতা নেই এ তুমি নিশ্চয় জেনো। এর থেকে এইটুকুই ধরে নিচ্চি যে আমার স্বভাব তুমি কিছুই জানো না।

আমি কোনো দিন তোমাকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে করি নি।

ধর্ম্ম এবং আচার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মূলগত প্রভেদ আছে সেই দিক থেকে তোমাকে যদি পীড়া দিয়ে থাকি সে অনিবার্য্য— সে তোমার প্রতি নির্মমতাবশতঃ নয়। যাই হোক তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

আশঙ্কা করেছ তোমার চিঠিপত্রে চাপল্য প্রকাশ করে তুমি আমার গৌরবহানি করেছ। গৌরবের প্রতি আমার লেশমাত্র লোভ নেই। আমাকে তোমাদের সমান ক্ষেত্রে আপন বলে স্বীকার করে নিয়েছ, আমার সঙ্গে সাধারণভাবে গল্প করতে হাস্যালাপ করতে সঙ্কোচ বোধ কর না এতে আমি খুসি থাকি— তোমার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা শুনতে আমার ভালোই লাগে। তোমাকে গাম্ভীর্য্যের দ্বারা অভিভূত করা আমার স্বভাবসিদ্ধ নয়।

কচিকে অনেক দিন পরে দেখে ভালো লাগল। তোমাকে নিয়ে একদিন আসবে বলেছিল— বোধ হয় সুযোগ হয় নি। ইতি ৪ জানুয়ারি ১৯৩৪

দাদা

১৩০

৭ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর খারাপ, ভালো করে লিখতে পারবনা। তোমার চিঠি পড়ে মনে বেদনা পেলুম। আমি যদি তোমার

দুঃখের কোনো কারণ ঘটিয়ে থাকি সে আমার জ্ঞানকৃত নয়— ইচ্ছাকৃত হতেই পারে না।

তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেচ তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি যা কিছু আলোচনা করেচি সে তোমার বুদ্ধিকে স্পর্শ করে থাকবে কিন্তু তোমার সংস্কারকে পরাভূত করতে পারে নি। যে পথে তোমার পূজাবৃত্তি এতকাল তৃপ্তি পেয়েছে সেই পথেই তোমার হৃদয় স্বভাবতই ছুটতে চায়। তোমার বুদ্ধিশক্তি আজ তাকে বাধা দিয়েছে কিন্তু বিমুখ করতে পারে নি। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে তোমার স্বভাব আজ পীড়িত। এই ব্যথা তোমাকে আমি দিয়েচি— গভীরতর ভাবে তাতে তোমার ক্ষতি হয়েচে বলে মনে করি নে। ভক্তিকে বুদ্ধি থেকে ভ্রষ্ট করলে তার মূল্যহানি করা হয়— তাতে নিজের মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটে।

যাই হোক সম্প্রতি তুমি নিজেকে যে কাল্পনিক দুঃখে উদ্‌ভ্রান্ত করেছ সেটাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। আর যাই হোক আমার প্রতি অবিচার করা তোমার উচিত হয় না। আমি তোমার প্রতি কোনো নির্ম্মমতা করি নি— করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইতি ৭ জানুয়ারি ১৯৩৪

দাদা

১৩১

[শান্তিনিকেতন] ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় যেতে বোধ করি আরো কিছুকাল দেরি হবে। পনেরোই মাঘ নাগাদ সেখানে আমার যাবার সম্ভাবনা।

গেলবার কলকাতায় থাকতে তোমরা আমাকে মিষ্টান্নের ডালি পাঠিয়েছিলে। তার প্রাপ্তিসংবাদ দিতে কেন ভুল হোলো সে কথাটা খুলে বলি। যেদিন উপহার পাওয়া গেল তার পরদিনেই আমার বোলপুরযাত্রা ছিল স্থির। তাই সেই ভোজ্যগুলি পূর্ব্বেই পাঠিয়ে দিয়ে বসেছিলুম। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল অনেকগুলি পরদেশিনী মেয়ে সেই ট্রেনেই চলেচেন শান্তিনিকেতন দেখতে। এঁরা ভারতের নানা প্রদেশ থেকে এসেছিলেন নিখিলভারত নারীসম্মেলন সভায়। আমার তখন মন ক্লান্ত ছিল তাই ভয় পেয়ে গিয়ে যাত্রা পিছিয়ে দিলুম। আমার মিষ্টালাপের পরিবর্ত্তে মিষ্টান্নগুলি সেই অতিথিদের ভোগে লেগেছিল। শুনেছি তাঁরা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গেই সেগুলি নিঃশেষে সমাধা করেচেন। এই পুণ্যের ভাগী কে হবে সে প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। তাঁদের প্রতি এ আমার ইচ্ছাকৃত আতিথ্য ছিল না, তাঁদের প্রতি তোমারও এ ইচ্ছাকৃত দান নয়। যা হোক এখন অন্তত নিজের মনের লোভ ও দাবী দূর করে দিয়ে তাঁদের ভুক্ত দ্রব্য মনে মনে তাঁদেরই কাছে উৎসর্গ করি। তোমার পুণ্য এই, তুমি অজ্ঞানত আমার অতিথিসেবায় সহায়তা

করেছ, এখন তাতে তোমার সজ্ঞান সম্মতির যোগ দিয়ো। রথী এখানে ছিলেন তিনি অংশ পেয়েছেন এবং আয়োজনের উপাদেয়তাসম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসা করেচেন। ইতি ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪

দাদা

১৩২

২২ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পিঠে রচনাপ্রণালীর তালিকা বৌমাকে দিয়েছি— আশা করি দেওয়াটা সার্থক হবে। ইতিমধ্যে প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে রবিঠাকুর পিঠের নৈবেদ্য মাঝে মাঝে পেয়েছেন।

সেদিন ভূমিকম্প যখন ঘটল সেই সময় চৌকিতে বসে আমার ডেস্কটাকে আবর্জ্জনামুক্ত করছিলুম। ডেস্ক এবং চৌকি একসঙ্গেই মাথা নাড়লে, সেটাকে আমি দৈবসঙ্কেত বলে মনে করি নি। প্রাকৃতিক উৎপাতের জন্যে মানুষের পাপপুণ্যকে দায়ী করবার মতো মনোভাব আমার নয়, অন্ধ নির্ম্মম প্রকৃতি আমাদের কৃত্য অকৃত্যের হিসাব রাখে না, তার হিসাব জড়শক্তির ঘাত প্রতিঘাত নিয়ে।

এখানে আমার কাজ আছে ২৩শে মাঘ পর্য্যন্ত। তার পরে কলকাতার প্রতি মনোযোগ করবার অবকাশ হবে। হয়তো ২৫

তারিখে কলকাতায় যাব। সেখানে আমাদের ঘরকন্নার ব্যবস্থা যথোচিত নেই তাই আশ্রয় নিতে হবে বরানগরে। বরানগরের ঘাটে আমাদের বোট আছে সেখানেও কদাচিৎ দিনযাপন করব। কচিকে বোলো কোনো এক সময়ে তোমাকে নিয়ে আসবে তাহলে দেখা হতে পারবে। শীত খুব প্রবল সেটাও আমার বিশ্বাস সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোনো একটা বোঝাপড়া নিয়ে— পূর্ব্বজন্মে তুমি দর্জ্জির দেনা শোধ করতে ভুলেছিলে বলে নিশ্চয়ই নয়। ইতি ৮ মাঘ ১৩৪০

দাদা

১৩৩

২৭ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে যখন তুমি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করো তখন বুঝতে পারি সেটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার শিক্ষা আমার হয় নি, কিন্তু তোমার পিঠে প্রস্তুতের প্রকরণ পড়লে পরীক্ষার পূর্ব্বেই বুঝতে পারি সেগুলো শ্রদ্ধার যোগ্য। এমন কি বৌমা তোমার রচিত পৈষ্টকী সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন— শাস্ত্র অনুসারে তোমার এই লেখা-গুলিকে কাব্য বলা যেতে পারে কেননা সাহিত্যদর্পণ বলেচেন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।— তোমার চিঠিতে ভূমিকম্পকে

আমাদের পাপের ফল বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলে। মনে আছে এর আগে বাংলাদেশে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তারি কিছু-কাল পরে জাহাজে করে কটকে যাচ্ছিলুম। শুন্‌তে পেলুম আমার চৌকির কাছাকাছি বসে একটি বাঙালি মেয়ে তার সঙ্গিনীকে কানে কানে বলছিল, হবে না ভাই? দেখলি তো আমাদের পাড়ায় অমুক ইত্যাদি।— তোমার মুখেও ঐ ধরণের কথা শুনেচি। তার পরে কাল খবরের কাগজে পড়ে দেখলুম মহাত্মাজিও ঐ ধরণের কথা বলেছেন, জানিয়েচেন অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচারের ফলে ভূমিকম্প ঘটচে তার থেকে বুঝলুম যে আমাদের দেশে অনেক মেয়েই পুরুষের দেহে অবতীর্ণ। এর পরে ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মন্ত্র তোমার কাছেই আমাকে নিতে হবে দেখ্‌চি। বিধাতা তাঁর পুণ্যের জোরে সৃষ্টি করেন, আমরা পাপের জোরে তা ভেঙে চুরে দিতে পারি এ তো কম অহঙ্কারের কথা নয়। জীবনে অনাচার অত্যাচার অনেক করেচি ভয় হচ্চে কোন্ দিন সকালে উঠেই দেখব সূর্য্য গেছে নিবে আর রান্না চড়িয়ে দেখা যাবে উনন থেকে জলের ফোয়ারা উঠচে। যতদূর পারি ভালো ছেলে হবার চেষ্টা করব। ১৩ মাঘ ১৩৪০

দাদা

[শান্তিনিকেতন] ১ মার্চ ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইতিমধ্যে তোমাকে চিঠি লেখার ব্যাঘাত কেন ঘটেচে তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলি। যেদিন তোমার চিঠি পাই সেই দিনই শান্তিনিকেতনে ফিরতে হোলো এখানে বসন্ত উৎসবের আয়োজন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এখানে পৌঁছবার পরদিনই হিন্দুস্থান কোঅপরেটিভ ইন্‌সুরেন্স্ আমাকে বারে বারে টেলিগ্রাম বর্ষণ করতে সুরু করলে— ওদের পঁচিশ বৎসরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে গার্ডন্ পার্টি, আমি না গেলে নয়। প্রথমে করলুম অস্বীকার— কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে ভালো মানুষদের হার হয়। এখান থেকে বর্দ্ধমান, তার পরে বর্দ্ধমান থেকে তাদের মোটরে করে কলকাতায় গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করলুম আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে। তার পর দিনে কলকাতায় আর এক নিমন্ত্রণে জড়িয়ে পড়লুম, কোনো আত্মীয়ের বিবাহসাম্বৎসরিক। এড়ানো অসম্ভব হোলো। পরদিন প্রাতেই ইন্‌সুরেন্সের মোটরে চড়ে বর্দ্ধমান, এবং বর্দ্ধমান থেকে এখানে পৌঁছলুম অপরাহ্ণে। তার পর থেকে উৎসবের ব্যবস্থা। আজ উৎসবের দিন। সকাল বেলার পালা সেরে এসে তোমার চিঠি পেলুম। চার দিকে আজ অভ্যাগত আগন্তুকের ভিড়। কোনোমতে সময় করে নিয়ে তোমাকে এই আশ্বাসবাণী জানাচ্চি, এখনো বেঁচে আছি। আজকের দিনের কাজ শেষ করে কালও বোধ হয় টিঁকে থাকব। তুমি নিরুদ্বিগ্ন

চিত্তে নিজের চিকিৎসায় মন দিয়ো, ওষুধ এবং পথ্য সম্বন্ধে নিয়মপালনে ঔদাসীন্য কোরো না। তোমার শরীরে কোনো রোগ নেই সে আমি পূর্ব্বেই নিশ্চিত জানতুম— নিজের মনের প্রতি তুমি নির্ম্মম, কল্পনার যোগে তাকে কারণে অকারণে নিয়তই পীড়ন করা তোমার অভ্যস্ত হয়ে এসেচে। তোমার কল্পনাকাশে উনপঞ্চাশ বায়ু এলোমেলো ভাবে বইতে থাকে, সোজা জিনিষকে বাঁকিয়ে দেয়, আস্ত জিনিষকে ভেঙে ফেলে। সেই বায়ুকে শান্ত করবার কোনো ওষুধ যদি কবিরাজের ঝুলিতে থাকে তাহলেই তুমি শান্তি পাবে। আমার কাছ থেকে যদি চিঠি না পাও তাহলে নিশ্চয় জেনো তার কারণটা নিতান্ত বাহ্যিক এবং উপেক্ষার যোগ্য— কখনো থাকি ক্লান্ত, কখনো থাকি ব্যস্ত, কখনো থাকি অন্যমনস্ক, তাছাড়া আলস্য আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আমার মজ্জায় সঞ্চার করে দিয়েছেন— তাঁর অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে হার মানতেই হয়। ইতি দোলপূর্ণিমা [১৭ ফাল্গুন] ১৩৪০

দাদা

১৩৫

৮ মার্চ ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাসন্তী ফুলের খবর জানতে চেয়েছ। ভাষায় বর্ণনা করে জানাবার উপায় নেই। একটি ফুল চিঠির মধ্যে পাঠালুম— কিন্তু ডাকঘরের দলনে পিষ্ট হয়ে যখন তোমার হাতে পৌঁছবে

তখন নিষ্ঠুর শাশুড়ীর পীড়নে অবসন্ন নববধূর মতো ওর পরিচয় ক্লিষ্ট হয়ে যথার্থ আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। বসন্তের প্রথম সমাগমের আমন্ত্রণে এই ফুল আমার বাগানে গাছ ভরে ফুটে উঠেছে— এর কচি পাতাগুলি সিঁদূরে বরণ, তারি স্তরে স্তরে সোনার রঙের অজস্র ফুল যেন বসন্তের বীণায় বাহার রাগিণীর ঝঙ্কার লাগিয়েছে, বাতাসে দিয়েছে সুগন্ধের মীড়। এই সময়-টাতেই আর এক জাতের শাদা ফুল গোল গোল মঞ্জরীতে শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এখানকার লোকের কাছে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলে বুনো ফুল নাম জানা নেই। আমরা সেই অনাদৃত জঙ্গল থেকে আনিয়ে কিছুকাল আগে বাগানে লাগিয়েছিলুম এখন তার পুরস্কার পাচ্চি। সৌন্দর্য্যে ও সৌগন্ধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতা বিস্তার করেছে। আমি এর নাম দিয়েছি বনপুলক। এর গুচ্ছ কতকটা রঙন ফুলের মতো, কিন্তু এ অন্য জাতের— এর গন্ধ কোমল অথচ ব্যাপক। এরা বসন্তের প্রথম দূতী, ঋতুরাজের আগমন ঘোষণা করেই রঙ্গভূমি ত্যাগ করে নেপথ্যে চলে যায়। এরা যেন নাটকের নান্দীর মতো— দুটি একটি শ্লোকেই কাজ সেরে এরা বিদায় গ্রহণ করে। এদের আর একটি সহচরী আছে, সে মাধবী। দেখা দেয় শাখায় শাখায় মঞ্জরিত হয়ে, বেশি দিন থাকে না, বধূ যেন শ্বশুর বাড়িতে এসেই বাপের বাড়িতে ফেরবার জন্যে উতলা হয়ে ওঠে। আর একটি ফুল শীত ফুরোতে না ফুরোতে আমার বাগানে দেখা দিয়েছে, সে কাঞ্চন। তার প্রগল্‌ভতার অন্ত নেই, সমস্ত গাছ যেন মুখরিত করে সে খিল্-

খিল্ করে হেসে উঠেছে। বনভূমিতে সকলের আগে সেই চোখে পড়ে। আমাদের শালবীথিকা দেয় বসন্তের শেষ বিদায় অঞ্জলি, তরুতল বিকীর্ণ করে দেয় ঝরা পাপড়িতে, দক্ষিণ বাতাসের পথে প্রসারিত করে দেয় সৌরভের আস্তরণ। আর এই সঙ্গে আছে আমের মুকুল, তার তর সয় না, মাঘের সুরু থেকেই সে অভিসার আরম্ভ করে। এবারে শিলবৃষ্টিতে আর কুয়াশায় সে মুহ্যমান হয়ে গেছে, মৌমাছিদের নিমন্ত্রণের আসর জম্‌ল না।

রথী ও বৌমা ভুবনেশ্বর থেকে ফিরেছেন। সেখানে ভালো ছিলেন। আমিও যাব সঙ্কল্প করেছিলুম, হয়ে উঠল না। বহুকাল পূর্ব্বে একবার গিয়েছিলুম, খুব ভালো লেগেছিল— পুরীর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। ইতি ৮ মার্চ্চ ১৯৩৪

দাদা

রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার লোক পেয়েছ শুনে ভীত হলুম— সেরকম লোক কলকাতায় আছে বলে জানিনে। বিকৃত করে শেখাবে। তোমার মেয়েকে এখানে পাঠিয়ে দাও, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ওস্তাদ করে দেব। কিন্তু নজরুলের গান আমরা জানিনে।

১৩৬

২৯ মার্চ ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেকখানি কুঁড়েমি এবং কিয়ৎপরিমাণ কাজ নিয়ে আমার সমস্ত সময় জোড়া ছিল। বসন্তের আসর বেশ সরগরম হয়ে

উঠেছে— এখন সামনের ঐ দোলায়মান পুষ্পিত লতামণ্ডপের দিকে তাকিয়ে যা ইচ্ছে তাই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে কেদারা জুড়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। লেখবার ডেস্ক থেকে দূরে থাকি— উঠে গিয়ে কর্ত্তব্য সমাধা করি শরীরে মনে এতটা উদ্যম নেই। অলস মনটা পায়চারি করে বেড়ায় দূর অতীত কালে যখন বয়সের সঙ্গে বসন্তের সহযোগিতা ছিল।

সম্ভবত আগামী সোম কিম্বা মঙ্গলবারে কলকাতা অভিমুখে যাব। সেখানে আমার আত্মীয়বর্গ রক্তকরবী অভিনয়ে প্রবৃত্ত, তাদেরি আহ্বানে আমাকে যেতে হচ্চে। কর্ত্তব্য সমাধা হলেই ফিরে আসতে হবে। কলকাতায় থাকবার উপযুক্ত সময় এখন নয়। ইতি ২৯ মার্চ্চ ১৯৩৪

দাদা

১৩৭

২ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আগামী বুধবার সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় পৌঁছব। এবার জোড়াসাঁকোতেই অল্প কয়েকদিন কাটাবার সম্ভাবনা আছে। যদি পারো, দেখা করতে এসো, খুসি হব। বসন্তের প্রতাপ ক্রমশ কিছু উগ্র হয়ে উঠচে— নিদাঘকে এরই মধ্যে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হোলো বলেই অনুভব করচি। গ্রীষ্ম আমার

জন্মঋতু, তার বিরুদ্ধে কখনো নালিশ করি নে। আমার অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল গরমের দিনে, এবং বর্ষায়। শীতের মাসগুলো কর্ম্মের মাস— যত দায়িত্বের বোঝা তখন কাঁধে এসে চাপে। আমার মনের স্বরাজ হচ্চে গরমের দিনে। আমার কাব্যে রুদ্র-দেবের এত বেশি অবতারণা দেখতে পাও তার কারণ রৌদ্রেই আমার চিত্তের অভিষেক— রুদ্রের তাপতপ্ত ললাটের তৃতীয় নেত্ররই দীপ্তি বিগলিত করেছে আমার কাব্যধারাকে। ইতি ২ এপ্রেল ১৯৩৪

দাদা

১৩৮

[কলিকাতা] ৭ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল রক্তকরবী অভিনয় থেকে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে জোড়াসাঁকোয় ফিরে তোমার প্রেরিত ফল ও মিষ্টান্নের অর্ঘ্য দেখে খুসি হয়েছি— আজ প্রাতঃকাল থেকে একাধিকবার ওগুলি আমার ভোগে লেগেছে— আরো একাধিকবার লাগবে এমন সম্বল এখনো অবশিষ্ট আছে। ভালো না লাগলে ভোজের এমন পুনরাবৃত্তি ঘটত না। তোমার চিঠিখানি থেকে অনেকদিন পরে একটা রহস্যের উদ্ভেদ হোলো। একটা টিফিনবাহিনী হঠাৎ আমার তৈজসপত্রের অন্তর্গত হয়ে বিরাজ করচে দেখা গেল, যাকেই জিজ্ঞাসা করি কেউ তার মালেকের খবর বল্‌তে পারে না—

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আছি ; কী করে দায়মুক্ত হতে পারব সে চিন্তা অনেক করেছি কিন্তু কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভবপর না হওয়াতে এই টিফিনবাহিনী সম্বন্ধে পর-জন্মের একটা দুর্গতির কারণ সৃষ্টি করে বসে আছি। এবার দায়মোচনের উপায় হোলো। যদি বলো কালুঘোষের লেনে লোক মারফৎ পাঠাতে পারি— অথবা তুমি স্বয়ং যদি কোনো সদুপায়ে তোমার সম্পত্তি উদ্ধারের পথ করতে পারো, আমার পক্ষ থেকে বাধা পাবে না।

আগামী কল্য প্রাতে এখান থেকে বরানগরে প্রস্থান করব। দুচারদিন পরেই ফিরব শান্তিনিকেতনে। তার পরে হপ্তাকয়েক বাদে যাত্রা করব সিংহলে। তুমি মেয়েকে নিয়ে যাবে গৌরীপুরে — খুকুর কথা চিন্তা করে আমি মনে বেদনা বোধ করি। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ৭ এপ্রেল ১৯৩৪

দাদা

১৩৯

১১ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

চলে এসেছি স্বস্থানে। পথে বৃষ্টিধারা আমার অনুসরণ করেছে। এখানে এসে দেখি গাছে গাছে কবির অভ্যর্থনা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, ঝল্‌মল্ করচে পাতাগুলি। বৃষ্টির আশা এখনো দিগন্তে পুঞ্জিত হয়ে আছে।

আমরা সিংহল বিজয়ে যাত্রা করব ২২।২৩শে বৈশাখে। এবারে আমার জন্মদিন দেখা দেবে সমুদ্রে। চিরদিনই আমি পারের যাত্রী, কোনো শান-বাঁধানো ঘাটে আমি কখনো নৌকা বেঁধে দিন কাটাই নি, অতএব সমুদ্রপথেই আমার জন্মদিন সার্থক। বার বার পথে পথে আমার জন্মদিনের আবির্ভাব হয়েছে, কোনো একটা পথপ্রান্তেই বোধ করি তার সমাপন হবে।

মালঞ্চ এখনো হাতে পাই নি, পেলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। আমার উপর দেশের দুর্গতি মোচনের ভারার্পণ করে যে ফর্দ্দ পাঠিয়েছ, দেখে আমার হৃৎকম্প হোলো। আমি সামান্য কবি মাত্র, সংস্কারক নই। স্বদেশের উপকার করবার যোগ্যতা থাকলে লাইন মিলিয়ে ছড়া লিখে বয়স কাটিয়ে দিতুম না। ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতার বই লিখেছি, তার সময় পেতেম কোথায়। আশা করি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে ক্ষমা করবেন— কারণ আমাকে তিনি তাঁর নিজেরই মতো দায়িত্ববিহীন কাজে নিযুক্ত করেছেন। ইতি ১১ এপ্রেল ১৯৩৪

দাদা

তোমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ হোক এই প্রার্থনা করি। খুকুকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।

১৪০

১৭ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে "পুনশ্চ" বইখানি আমি দিই নি তার কারণ মনে ভয় ছিল পাছে এর সৃষ্টিছাড়া আধুনিকতায় তোমার মন বিগড়িয়ে যায়। অনেক গণ্যমান্য লোকও এটাকে নিয়ে হাস্য পরিহাস করেছে এবং বলেছে তারা তাদের প্রতিদিনের বাক্যালাপে আজন্মকাল এই "পুনশ্চ" কাব্যই রচনা করে আসচে। অথচ একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইদানীং আমার অন্য বইয়ের চেয়ে "পুনশ্চ"র কাটতি বেশি। এরই মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হচ্চে।

Sabot একরকম কাঠের তলা দেওয়া জুতো— য়ুরোপের অনেক দেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে চলিত আছে। এ কথাটা তোমার ডিক্‌সনারিতে পাও নি সে জন্যে সঙ্কলনকারীকে দণ্ডনীয় করা চলবে না— কেননা ও কথাটার প্রয়োগ ইংরেজি সাহিত্যে বিরল। "অনুবাদচর্চ্চা" বলে আমার দুখণ্ড বই আছে, একটা ইংরেজি একটা বাংলা, সেই দুটো অবলম্বন করে তুমি এবং খুকু প্রত্যহ যদি তর্জ্জমা অভ্যাস করে যাও তাহলে ইংরেজি শেখার কাজে লাগবে। বইখানা হাতের কাছে থাকলে তোমাকে পাঠিয়ে দিতুম। মূল্য সামান্য কিন্তু তার উপযোগিতা তার চেয়ে অনেক বেশি— দোষ নিয়োনা, নিজের কীর্ত্তি ঘোষণা করার প্রয়োজন হলে সেটা করা কর্ত্তব্য।— কৃষ্ণপক্ষের অবসান কালে ঝড়বৃষ্টি

হয়ে গেছে, শুক্লপক্ষে রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠল— অতএব এখন দ্বীপান্তর শ্রেয়, চল্‌লুম সিংহলে— তোমরা গৌরীপুরে পল্লিলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ হস্তের শুশ্রূষা ভোগ করোগে। ৪ বৈশাখ ১৩৪১

দাদা

এইখানে আর একটা কথা বলে নিই। বঙ্গশ্রীতে তুমি আমার লেখা দেখে বিস্মিত হয়েছ। ওর কারণটা এই, এখন অন্নাভাব। লেখা বিক্রয় করা ছাড়া জীবিকার অন্য সাধু উপায় জানি নে। শ্রুত ছিলেম যে উদয়ন ও বঙ্গশ্রী কাগজের মালেকরা ধনশালী, লেখার মূল্য দাবী করলে সেটা ব্যর্থ হয় না। তাই সজনীকে লেখা হয়েছিল ১০০ টাকার পরিবর্ত্তে আমার একটা প্রবন্ধ যদি ইচ্ছা করে তবে পেতে পারে। উদয়ন অনুরূপ প্রস্তাবে দ্বিধামাত্র করে নি। সজনীর সঙ্গে যখন দেখা হোলো তখন সে বল্‌লে কর্ত্তারা আশা করেছিলেন, দু তিন সংখ্যার মতো খোরাক তাঁরা পাবেন— অতএব অন্তত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার জন্যে আর একটা কিছু দিলে মনিব অর্থহানির জন্যে সান্ত্বনা পেতে পারেন। হায়রে রবীন্দ্রনাথ— বাজারে কোন্ দরে তোমার মূল্য যাচাই হচ্চে সেটা জেনে দর্পহারী মধুসূদনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে "আমার বঙ্গভূমি" থেকে এবার বিদায় গ্রহণ করো। এ নিয়ে তকরার করলে মর্য্যাদাহানি হয়, বল্‌লুম জ্যৈষ্ঠের জন্যে একটা কবিতা লিখে দেব। ঐখানেই শেষ। উদয়ন উৎসাহিত হয়ে আছে এক সংখ্যার প্রবন্ধর জন্যে একশো টাকাটাকে অপব্যয় বলে গণ্য করে নি। রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পরে তার স্মরণ

সাংবাৎসরিকে যখন তোমরা কবিসম্রাটের গুণকীর্ত্তনে মুখর হয়ে উঠবে সেই অবসরে বিধাতার দরবারে সকরুণ দরখাস্ত পেশ করব অন্য কোনো ভূখণ্ডে জন্মান্তর মঞ্জুর করে নেবার জন্যে।

দাদা

১৪১

২৪ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল সন্ধ্যার সময় একলা অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছি: আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; দক্ষিণের বাতাস বইচে বেগে। হেনকালে নানাবিধ অর্ঘ্যভার বহন করে ঝগড়ু বেহারার অপ্রত্যাশিত অভ্যাগমে বিস্মিত হয়ে উঠলুম। তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই বুঝলেম এ তোমার কাছ থেকেই আসচে। আসন্ন বিদায়কালে তোমার হাত থেকে এই সব ভোজ্য সামগ্রীর উপহার আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল, ইচ্ছা করতে লাগল সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে কিছু দিই যাকে তুমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারো। মনে পড়ল পুনশ্চ বইখানা। কেননা ও বই তোমার ভালো লেগেছে। সেটাকে পুনশ্চ দিতে গেলে তোমার মনে হতে পারে অলমতি বিস্তরেণ। সে কথাটা বর্ত্তমানে কেন সম্পূর্ণ খাটে না, তা বুঝিয়ে বলি। এই দ্বিতীয় সংস্করণে কতকগুলি নতুন লেখা যোগ করা হয়েছে। তা ছাড়া কতকগুলি মিলহীন

কবিতা পরিশেষ থেকে খসিয়ে নিয়ে এর মধ্যে ভর্ত্তি করেছি। যথোপযুক্ত কবিতা দিয়ে পরিশেষ-এর ক্ষতিপূরণ করে দেব। তার বিলম্ব আছে, কেননা পরিশেষের পরিশেষ হবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমি একান্ত ইচ্ছা করচি এবং আশা করচি গৌরীপুরে গিয়ে তুমি আনন্দে থাকবে। দেখবার ক্ষুধা তোমার দুই চক্ষু পূর্ণ করে আছে, তুমি দেখতে জানো। পল্লিশ্রীর আহ্বান তোমার মনকে উৎসুক করে তুলবে। নিশ্চয় তোমার আসন পড়বে কোনো একটা খোলা জানলার কাছে। সেখান থেকে কী দেখতে পাবে সে আমার কল্পনাদৃষ্টির সামনে নেই। পুঞ্জীভূত শ্যামলতার একটা আভাস আমার মনে আসে। কোনো গাছে নতুন পাতা ওঠবার সময় এখনো আছে কোনো গাছের পরিণত পাতায় গাঢ় রং ধরেছে। আমার মনে পড়ে আমাদের শিলাইদহের কুঠি-বাড়ি। আমি থাকতুম তেতলার ঘরে। দূরপ্রসারিত তরঙ্গায়িত সবুজের মাথা পেরিয়ে দেখা যেত দূর পদ্মার একটি ক্ষীণ রেখা; নৌকোগুলো তটের তলায় প্রচ্ছন্ন থাকত, কেবল মাস্তুলের চূড়া-সংলগ্ন স্ফীত পালের কিয়দংশ শরতের বৃষ্টিরিক্ত অলস মেঘের মতো নীল আকাশের গায়ে গায়ে চলত ভেসে। আর কখনো বা উজানের মুখে ডাঙা বেয়ে চলত গুণ কাঁধে নিয়ে নতদেহ মাল্লার দল। সেই নদীরেখার ও পারে দেখা যেত পাণ্ডুবর্ণ বালু-চরের বিস্তার, আকাশের নীলিমার সঙ্গে আপন গৌরিমার যুগলতা প্রকাশ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। বৈশাখে শস্যশূন্য মাঠের ধূসরতার মাঝে মাঝে তরুচ্ছায়ায় আবিষ্ট এক একটি গ্রাম— পিণ্ডীকৃত গাছগুলোর নিবিড় আবেষ্টন ভেদ করে এক

একটা তালজাতীয় গাছ আপন স্বাতন্ত্র্য উচ্ছ্রিত করেচে মেঘ-লোকে। আমাদের বাগানে বিলম্বে ফলবার আমগাছে তখন বোল ধরেচে, দখিন বাতাসের বেগে দূরের থেকে তার গন্ধ মৃদু হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করচে। হঠাৎ কখনো ব্যর্থ সন্ধানে কোনো একটা ভ্রমর ভন্ ভন্ করতে করতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। নদীর ধার দিয়ে একটা বাঁকাচোরা পথ গ্রামগুলির সামনে দিয়ে কোনো একটা বড়ো রাস্তার সঙ্গে মিলন লক্ষ্য করে চলেচে। এই গ্রামের রাস্তার দুই ধারে আম জাম কাঁঠাল আমার আমলে আমার হুকুমে লাগানো হয়েচে। রাস্তার বাঁকের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাঁকা ভঙ্গী উপর থেকে দেখতে পেতুম। বাংলা দেশের এই সুকোমল শুশ্রূষার পরিবেষ্টনের মধ্যে থেকে আমি তখন সাধনার জন্যে গল্প লিখচি প্রবন্ধ লিখচি, লিখচি ক্ষণিকা চিত্রা আরো কত কি। তারি ফাঁকে ফাঁকে বাংলা পল্লিগ্রামের যে স্পর্শ আছে তা আমার পাঠকেরা ঠিক বুঝতে পারবে না। আমার সেই সেদিনকার কল্পনা তোমাদের গৌরী-পুরের উপরে আরোপ করচি। ঠিক মিলবে না বোধ করি। ওখানকার পল্লী বোধ করি ঐশ্বর্য্যের সোনার শৃঙ্খলে বন্দিনী। তা হোক্ মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়বার অবকাশ আছে হয়তো। বুঝতেই পারিনে অর্থহীন সংস্কার নিজে সৃষ্টি করে কঠিন উৎপীড়নের জাল বিস্তার করাকে মানুষ কেন যে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা বলে কল্পনা করে। নিজেকে নানা বিচিত্র বন্ধনে আষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ করতে যারা অভ্যস্ত, তারা কোনো কালে কোনো বন্ধন

থেকে নিজেকে মুক্তি দেবার অধ্যবসায়কে উদ্‌বুদ্ধ করবে কোন্‌ বুদ্ধিতে ? আপনার লোককে যারা বেঁধেছে পরের হাতের বাঁধন তাদের খুল্‌বে না। থাক্‌গে ওসব তর্ক। আপাতত নিজের শরীরটাকে সুস্থ করে তোলবার সাধনা সম্পূর্ণ মন দিয়ে গ্রহণ কোরো। যে শরীরটাকে অযাচিত দানরূপে পেয়েছ সেটার সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে তোমার দায়িত্ব আছে।

তোমার পত্রোত্তরে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, খ্যাতি অর্জ্জন করবার জন্যে কোনো দিন আমি কোনো রকম উদ্যোগ করি নি। জয়ন্তী প্রভৃতি ব্যাপারে আমি আরাম বোধ করি নি এ কথা নিশ্চিত জেনো। আমি জনতার সমাদর কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি বলেই আমি জনপ্রিয় হতে পারি নে। মানুষকে খুসি করতে পেরেচি এবং তারা আমাকে খুসি করতে চায় এর প্রমাণ পেলে নিঃসন্দেহ আমার আনন্দ হয়। কিন্তু সেটা চেষ্টাকৃত যদি হয় যদি অকৃত্রিম না হয় তবে তার চেয়ে বিতৃষ্ণাজনক কিছু হতে পারে না। কবির সত্যকার দণ্ড পুরস্কার কালের হাতে। মৃত্যুর ওপার পর্য্যন্ত তার জন্যে সবুর করতে হয়—অসময়ে সেটাকে ছিনিয়ে নেবার মতো বেহায়াগিরি আর কিছু নেই। বিধাতার দান অমনিই অনেক পেয়েছি, আরো নাই বা পেলুম। ইতি ১১ বৈশাখ ১৩৪১

দাদা

১৪২

২১ মে ১৯৩৪

ওঁ পানাদোরা

কল্যাণীয়াসু

সিংহলে এসেছি সে খবর তোমাদের জানা। কিছু কাজ করতে পেরেছি— সে জন্যে ওরা খুসি এবং কৃতজ্ঞ। অনেক দিন থেকে য়ুরোপের সংসর্গে ওরা আপনার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিল। আধুনিকদের মধ্যে একদল সে জন্যে পীড়া বোধ করতে আরম্ভ করেছে। এরাই আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। যা ফল পেয়েছে তা ওদের প্রত্যাশাকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। স্বাজাত্যকে ফিরে পাবার প্রেরণা এদের মনে ইংরেজি শিক্ষা থেকেই এসেছে। এরা বৌদ্ধ অথচ অনেককাল থেকেই এদের শিক্ষিত সম্প্রদায় সে ধর্ম্মকে ভুলে বসেছিল। Leadbeater নামে একজন ইংরেজ এ সম্বন্ধে এদের সব প্রথমে জাগিয়ে তোলে। শিল্পকলা নিয়ে আমাদের দেশে ঠিক সেই দশা ঘটেছিল। স্বদেশীয় শিল্পরীতি নিয়ে দেশের লোকে যখন হয় উদাসীন নয় অট্টহাস্যমুখর তখন হ্যাভেল উড্রফ প্রভৃতি কয়জন ইংরেজ তাকে শ্রদ্ধা ও উৎসাহের দ্বারা উদ্বোধিত করেন। মনে রেখো আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে একদা আমাদের মূঢ়তা যখন অগাধ ছিল তখন ম্যাক্সমূলর এবং জর্ম্মানীর পণ্ডিতেরা সেই শাস্ত্রের বিচিত্র দুর্গম পথ আলোকিত করেছিলেন। আজও এ শাস্ত্র তাঁরা যেমন জানেন আমরা তেমন জানি নে।—

তুমি ব্যাকরণের বন্ধুর পথে ইংরেজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত। আমি

এ পথ কোনোদিন পেরোই নি। আমি প্রায় প্রথম থেকেই সাহিত্যের পথেই ইংরেজি ভাষার পরিচয় পেয়েছিলুম। আমি কোনো কোনো মেয়েকে ইংরেজি শিখিয়েছি— একেবারে গোড়া থেকেই বই পড়াতে সুরু করেছিলুম। প্রথম প্রথম চার পাঁচ লাইনের বেশি এগোতো না ছ মাসের পর অভিধান মিলিয়ে নিজেরা তাঁরা গল্পের বই পড়েছেন।

কলম্বো সহর থেকে ১৬ মাইল দূরে এসেছি। জানলা থেকে চেয়ে দেখচি সম্মুখে নারিকেলের ছায়া বিছানো তীর পেরিয়ে সমুদ্র ফেনিল তরঙ্গে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করচে। বাতাস বইচে স্নিগ্ধ সুমন্দ— নারিকেলের চঞ্চল শাখা মর্ম্মর শব্দে আন্দোলিত।— বাসন্তীকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ২১ মে ১৯৩৪

দাদা

১৪৩

৫ জুলাই ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি হাত দেখিয়ে গ্রহবিচার করিয়ে আমার চরিত্র এবং জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে অনেক খবর পেয়ে থাকো, কেন এ সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারলে না যে আমি কিছুকাল থেকে নানাবিধ কর্ম্মে, রচনায়, আতিথ্যসৎকারে, দুশ্চিন্তায়, দৈহিক দুর্ব্বলতায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছি। এই জন্যে অনেককাল কাজের চিঠি ছাড়া অন্য সকল চিঠি লেখাই বন্ধ হয়ে আছে। শুধু কাজের

ভিড়ের কৈফিয়ৎই যথেষ্ট নয়, বস্তুত আমার দেহ এখন কর্ম্মবিমুখ হয়ে উঠেছে, সামান্য কর্ত্তব্যকেও গুরুভার বলে মনে হয়। সম্পূর্ণ ছুটির জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। আমি চতুরাশ্রমে জীবনের ভাগকে বিশ্বাস করি— আমার বানপ্রস্থ্যের বয়স হয়েচে— কিন্তু এ যুগে তার ব্যবস্থা নেই। ঘরের মধ্যেই যথাসম্ভব বানপ্রস্থ্য রচনা করতে হয়। আমার বানপ্রস্থ্য দায়িত্ববিহীন অকাজের মধ্যে— যে কাজে কোনো কৈফিয়ৎ নেই— যাতে বিশ্বের বা নিজের হিতও হবে না অহিতও হবে না— যাতে হৃৎপিণ্ডেও ধাক্কা লাগে না, মস্তিষ্কেও আলোড়ন চলে না— অর্থাৎ যা প্রাচীন বয়সের শৈশবতা। সাহিত্যে একটা খ্যাতি পেয়েছি তার কাছে আমার দায় আছে, সে দায় বাঁচিয়ে চলতে হয়— কিন্তু যদি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে একটা ছবি আঁকতে থাকি— তাহলে যা তা আঁকতে দ্বিধা করি নে। লোকে যদি বলে আমি ছবি আঁকতে পারি নে, তবে তাতে সঞ্চিত যশের অপচয় ঘটে না। তাই যখন কর্ত্তব্যের দায়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন মানুষের কাছ থেকে অকারণ বৈরিতায় মন ব্যথিত হয়ে থাকে, তখন সেই অবসাদের সময় চিঠিপত্র লিখতে চেষ্টা করলে লেখনীকে গুরুভার বলে মনে হয়। তখন যেমন তেমন করে ছবি আঁকতে আমার বাধে না। তাই আমার জীবযাত্রাপথের শেষ প্রান্তে যখন আলো ম্লান হয়ে এসেছে তখন ইচ্ছা করে ছবি এঁকে সময় নষ্ট করি। সময় নষ্ট করবার অধিকার আমার হয়েচে। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাদ্দের অনেক বেশি কাজ করেছি— এখন যদি কর্ম্মশালার দ্বার বন্ধ করি তাহলে বেতন কাটা যাবে না।

তোমার কোনো একটা পত্রে জনশ্রুতির কথা লিখেচ যে, আমি সীতার নিন্দা করেচি। এমন অদ্ভুত অপবাদ বাংলা দেশেই সম্ভব। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সন্দীপ [সন্দীপ] বলে একটা মানুষ খাড়া করেছিলুম তার চরিত্রে ভদ্রতার আদর্শ নেই। সীতার সম্বন্ধে সে যদি এমন কিছু বলে থাকে যা সীতার পক্ষে সম্মানকর নয় তাহলে সেটাকে রবীন্দ্রনাথের বাণী বলা মূঢ়তা। দ্রৌপদীকে কীচক নিঃসন্দেহ অপমান করেছিল, দুঃশাসন সভাস্থলে তাঁর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেছিল এ কথাও মহাভারতে পড়েছি, বেদব্যাসকে সে জন্যে বাঙালী সমালোচকও নিন্দা করে নি, আমার বেলাতেই তাদের বুদ্ধি যে যায় বিগড়ে তার কারণ তুমি জিজ্ঞাসা কোরো আমার জন্মনক্ষত্রকে। আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেচি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর অন্তিম নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলা দেশে আমার জন্ম না হয়— এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন— আমি ব্রাত্য, আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্ম্মসম্মত।

সিংহলে লোকেরা আমাকে পেয়ে খুসি হয়েছিল। আনন্দ দিয়েছি আনন্দ পেয়েছি। কবির পুরস্কার এইটুকুই। বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো, বোলো অলিখিত পত্রোত্তরের জন্যে তার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাকে কিছুমাত্র যেন পীড়ন না করে। আমি জানি এই তার ত্রুটি ঔদাস্যবশত নয়, চিঠি লেখায় তার হাত পাকা হয় নি সেই সঙ্কোচেই। জীবনে অনেক চিঠি লিখেছি। কিন্তু আমার চিঠি লেখার শক্তি প্রায় বাসন্তীর কাছাকাছি এসে

ভিড়ের কৈফিয়ৎই যথেষ্ট নয়, বস্তুত আমার দেহ এখন কর্ম্মবিমুখ হয়ে উঠেছে, সামান্য কর্ত্তব্যকেও গুরুভার বলে মনে হয়। সম্পূর্ণ ছুটির জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। আমি চতুরাশ্রমে জীবনের ভাগকে বিশ্বাস করি— আমার বানপ্রস্থ্যের বয়স হয়েচে— কিন্তু এ যুগে তার ব্যবস্থা নেই। ঘরের মধ্যেই যথাসম্ভব বানপ্রস্থ্য রচনা করতে হয়। আমার বানপ্রস্থ্য দায়িত্ববিহীন অকাজের মধ্যে— যে কাজে কোনো কৈফিয়ৎ নেই— যাতে বিশ্বের বা নিজের হিতও হবে না অহিতও হবে না— যাতে হৃৎপিণ্ডেও ধাক্কা লাগে না, মস্তিষ্কেও আলোড়ন চলে না— অর্থাৎ যা প্রাচীন বয়সের শৈশবতা। সাহিত্যে একটা খ্যাতি পেয়েছি তার কাছে আমার দায় আছে, সে দায় বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়— কিন্তু যদি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে একটা ছবি আঁকতে থাকি— তাহলে যা তা আঁকতে দ্বিধা করি নে। লোকে যদি বলে আমি ছবি আঁকতে পারি নে, তবে তাতে সঞ্চিত যশের অপচয় ঘটে না। তাই যখন কর্ত্তব্যের দায়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন মানুষের কাছ থেকে অকারণ বৈরিতায় মন ব্যথিত হয়ে থাকে, তখন সেই অবসাদের সময় চিঠিপত্র লিখতে চেষ্টা করলে লেখনীকে গুরুভার বলে মনে হয়। তখন যেমন তেমন করে ছবি আঁকতে আমার বাধে না। তাই আমার জীবযাত্রাপথের শেষ প্রান্তে যখন আলো ম্লান হয়ে এসেছে তখন ইচ্ছা করে ছবি এঁকে সময় নষ্ট করি। সময় নষ্ট করবার অধিকার আমার হয়েচে। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত বরাদ্দের অনেক বেশি কাজ করেছি— এখন যদি কর্ম্মশালার দ্বার বন্ধ করি তাহলে বেতন কাটা যাবে না।

তোমার কোনো একটা পত্রে জনশ্রুতির কথা লিখেচ যে, আমি সীতার নিন্দা করেচি। এমন অদ্ভুত অপবাদ বাংলা দেশেই সম্ভব। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সঞ্জীব [সন্দীপ] বলে একটা মানুষ খাড়া করেছিলুম তার চরিত্রে ভদ্রতার আদর্শ নেই। সীতার সম্বন্ধে সে যদি এমন কিছু বলে থাকে যা সীতার পক্ষে সম্মানকর নয় তাহলে সেটাকে রবীন্দ্রনাথের বাণী বলা মূঢ়তা। দ্রৌপদীকে কীচক নিঃসন্দেহ অপমান করেছিল, দুঃশাসন সভাস্থলে তাঁর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেছিল এ কথাও মহাভারতে পড়েছি, বেদব্যাসকে সে জন্যে বাঙালী সমালোচকও নিন্দা করে নি, আমার বেলাতেই তাদের বুদ্ধি যে যায় বিগড়ে তার কারণ তুমি জিজ্ঞাসা কোরো আমার জন্মনক্ষত্রকে। আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেচি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর অন্তিম নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলা দেশে আমার জন্ম না হয়— এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন— আমি ব্রাত্য, আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্ম্মসম্মত।

সিংহলে লোকেরা আমাকে পেয়ে খুসি হয়েছিল। আনন্দ দিয়েছি আনন্দ পেয়েছি। কবির পুরস্কার এইটুকুই। বাসন্তীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো, বোলো অলিখিত পত্রোত্তরের জন্যে তার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাকে কিছুমাত্র যেন পীড়ন না করে। আমি জানি এই তার ত্রুটি ঔদাস্যবশত নয়, চিঠি লেখায় তার হাত পাকা হয় নি সেই সঙ্কোচেই। জীবনে অনেক চিঠি লিখেচি। কিন্তু আমার চিঠি লেখার শক্তি প্রায় বাসন্তীর কাছাকাছি এসে

পৌঁচেছে— এই জন্যেই চিঠি লেখা সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্যবোধ প্রতিদিন শিথিল হয়ে আসছে। ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৪১

দাদা

১৪৪

১২ জুলাই ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার চিঠির ভাষার থেকে মাঝে মাঝে তুমি কল্পনা করে বসো যে তোমার উপর আমি রাগ করেচি। কিন্তু কখনোই তোমার উপর রাগ করতে পারি নে। আমাদের দেশাচারের বিরুদ্ধে অনেক সময় ধিক্কার হয়, কিন্তু তুমিই যে তার প্রতীক তা তো নয়, তুমি তার দ্বারা আহত। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে পীড়া দিয়েছি, সে জন্যে মনে অনুশোচনা জন্মেচে। তোমার প্রতি আমার করুণা সুগভীর সে কথা নিশ্চিত জেনো। তোমার স্বভাবে অসামান্যতা আছে যা নানা বাহ্য আঘাতে পরিণতি লাভ করতে পারে নি ; যা মিশিয়ে রয়েছে এমন সব অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে যা তোমার মনকে মুক্তি দেবার প্রতিবন্ধকতা করেছে। তোমার মধ্যে তোমার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি ও অভ্যাসগত নিরর্থকতার একটা দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। সকল বিষয়েই চোখ বুজে বশ মানবার মতো মন তোমার নয় সেই জন্যেই তুমি আপনাকে আপনি পীড়ন করো, আমার বিশ্বাস এই পীড়ন থেকে তুমি

বাঁচতে যদি যথেষ্ট বিদ্যালোচনার দ্বারা তোমার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির সমর্থন পাবার সুযোগ তোমার ঘটত। তা হোক, মতে ও আচারে আমার সঙ্গে তোমার যতই পার্থক্য থাক তবু কখনো তোমাকে অশ্রদ্ধা করি নে। সেই পার্থক্যের পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে তুমি তোমার মত ও বিশ্বাস নিয়ে তোমার চিঠিতে যে সব আলোচনা করো, এবং যে সব ভাষাচিত্র পাঠাও সে আমার বিশেষ ভালো লাগে। তার একটা কারণ আমি অনেক কথা জানতে পারি যা আমার জানবার উপায় নেই— কিন্তু তার চেয়ে আর বড়ো কথা, তোমার লেখার মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিকতা ও উজ্জ্বলতা আছে যা দুর্লভ— স্বত-উৎসারিত সাহিত্যরসে সে আমাকে আনন্দ দেয়। সুসংলগ্ন করে বিস্তারিত করে লেখবার সাধনা যদি তোমার পাকা হোতো তাহলে সাহিত্যে তুমি কৃতিত্ব লাভ করতে পারতে। বিশেষত মেয়েরা বাংলা ভাষায় যে সব লেখা আজকাল লেখে তা এমনি দুর্ব্বল, বানানো, নকল করা জিনিষ যে তোমার লেখবার স্বাভাবিক শক্তি ও সাহস দেখে দুঃখ হয় তুমি সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারো নি। প্রবেশ করলে তোমার প্রতিভার সাহসিকতা দেখে অনেকেই তোমাকে অজস্র গাল দিত; কিন্তু অযোগ্য নিন্দুকদের গালের দ্বারাই তোমার যথার্থ বিচার হোতো। তোমার বুদ্ধি ও শক্তি ভূমিকম্পে বিদীর্ণ উর্ব্বরা ভূমি— জোড়া লাগবার সুযোগ পেল না। যা হোক তোমার চিঠি থেকে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি— সে চিঠি প্রকাশ হতে পারবে না এইটেই আক্ষেপের বিষয়।

কিছুদিন হোলো তোমার চিঠিতে অত্যন্ত অদ্ভুত যে সংশয়

প্রকাশ করেছিলে যে তোমাকেই লক্ষ্য করে বাঁশরীতে আমি কিছু বক্রোক্তি করেছি সেইটেতে আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল— আমার দ্বারা এমন অন্যায় যে সম্ভব হতে পারে এ কথা তুমি মনে করলে কী করে। এর থেকে তোমার পীড়িত বিকল চিত্তের লক্ষণ দেখতে পাই।

আমি যেমন ছবি আঁকি তুমি তেমনি গান লেখো সে ভালোই। কোনোটা ভাল হবে কোনোটা হবে না— কারো কাছে সে জন্যে জবাবদিহী নেই। আমাকে যদি পাঠাতে চাও পাঠিয়ো— চুপ করে থাকি যদি কিছু মনে কোরো না। কিন্তু গানের প্রধান অংশ সুর— সে জন্যে খুকুর শরণ নিয়ো। তার বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুন্‌লুম। পাত্রটির নাম জানি, তার বেশি পরিচয় জানি নে। সকল পাত্রেই নিজেকে মিশিয়ে নেবার শক্তি মেয়েদের স্বভাবে প্রচুর পরিমাণে আছে। না যদি থাকত তাহলে স্ত্রীহত্যা-পাতকে প্রতিদিন বিধাতাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হোতো। ইতি
২৭ শ্রাবণ [আষাঢ়] ১৩৪১

দাদা

পর্শু অর্থাৎ ২৯শে তারিখে কলকাতায় যাব, পয়লা শ্রাবণ তারিখে ফিরব।

১৮ জুলাই ১৯৩৪ ॐ কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় কাজে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার দায় ছিল— বিষয়টা "সাহিত্যের তাৎপর্য"। তোমার চিঠিতেও দেখি তুমি সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা করেছ। আমার লেখাটা যখন বের হবে তোমার মতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবে। সাহিত্য জিনিষটা বুদ্‌বুদ নয় অর্থাৎ শূন্যগর্ভ গোলকের উপর সূর্য্য-রশ্মির সাত রঙের খেলামাত্র নয়। তেমনতরো বাক্যের বুদ্‌বুদ একেবারে হয় না তা বলতে পারি নে কিন্তু সেগুলোর দাম নেই। ভিতরটাতে হৃদয় থাকলে তবে তার নিবিড় আস্বাদ পাওয়া যায়। তোমার চিঠিতে যদি সাহিত্যরস থাকে তবে সেটা হৃদয়সম্পর্কশূন্য নয় বলেই উপভোগ্য হয়ে থাকে।

আজ সন্ধ্যার দিকে মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই কর্ত্তব্যটা সমাধা করেই কাল শান্তিনিকেতনে ফিরব। মহাত্মাজি বাংলাদেশের স্থায়ী ও মর্ম্মান্তিক অনিষ্ট করেচেন এই কারণে তাঁকে যথোচিত সমাদর করা বাঙালীর পক্ষে কঠিন হয়েচে— আমারও মন কুণ্ঠিত আছে। আমি বোধ হয় পাঁচ দশ মিনিটের মত দু চার কথা বলেই ছুটি নেব।

শ্রাবণ এলো— বর্ষা এবার যথোচিত সমারোহে দেখা দিয়েছে। আশ্রমে গিয়ে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করতে হবে। কিন্তু মনের মধ্যে তেমন উৎসাহ বোধ করচি নে। জগৎ জুড়ে দুঃখ দারিদ্র্য নানা আকারেই দেখা দিয়েচে। এমন দেশ নেই

যেখানে মানুষ নানা রকমে মার না খাচ্চে। মনে হয় যেন একটা যুগান্তের পরে যুগান্তরের সূচনা। নূতনের অভ্যুদয় যখন হয় তখন নাড়িছেঁড়া দুঃখই আনে তাকে আবাহন করে। পূর্ব্ব যুগের ভুল চুক ত্রুটি আপন ভাঙনের বিদারণরেখার উপর দিয়েই নবযুগের রথযাত্রার পথ রচনা করে। সেই পথ রচনার কাজে মানুষ ঢেলে দিচ্চে তার হৃদয়শোণিত। আমি মনে মনে ভাবচি আমার এ জন্মের প্রান্তভাগটা মিলে গেছে এই যুগেরই রক্তরশ্মিদীপ্ত দিগন্তরেখায়। সমস্ত যুগাবসানের বেদনা আমার মনের মধ্যে আজ ছায়াপাত করেচে। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩৪১

দাদা

১৪৬

৭ অগস্ট্ ১৯৩৪ ॐ

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। বিবিধ রকম কাজে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলুম, তার মধ্যে সাহিত্যিক কাজও কিছু ছিল —কিছু ছিল এখানকার ছাত্রদের প্রতি কর্ত্তব্যপালন, কিছু ছিল নানা লোকের নানা খুচ্রো দাবী মেটানো, সেগুলো যেন গাছের মধ্যে আগাছার জঙ্গল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তৃণশ্যামল বিস্তীর্ণ প্রান্তরসীমায় ঘন বনশ্রেণীর নীল রেখা, আমার অলিন্দের তিন কোণে তিনটি রাধাচূড়ার গাছ পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে বাতাসে আন্দোলিত, তার পিছনে বড়ো শিমূলগাছকে বিজড়িত করে উঠেছে মালতীলতা, দিনরাত কাঁকরবিছানো পথে টুপ্ টুপ্ করে মালতী ঝরে পড়চে, কদম্বকেশর ঝরার দিন শেষ হয়ে

গেল, দুটি একটি অসময়ের বেল ফুল দেখা দেয় তারা ক্লান্ত হয়ে এল বলে। আমার সামনেই পলাশ সোঁদাল হিমঝুরি সোনাঝুরি কদম জারুলের বীথিকা সোজা চলে গিয়ে সদর রাস্তায় উত্তীর্ণ হয়েচে। তাদের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে রাঙামাটির পথের এক টুক্‌রো দেখা যায়।— আমার ইচ্ছে করে সব দায়িত্ব ফেলে দিয়ে এই ছায়াবৃত দিনে সামনে তাকিয়ে বসে ভাবি আপন মনে। এই দানটুকু শুনতে সুলভ কিন্তু ভাগ্যে খুব অল্পই জোটে — বন্দী আমি কর্ত্তব্যের সশ্রম কারাবাসে।

তোমার চিঠি পড়ি, তোমার কথা ভাবি। একটা কথা বার বার মনে আসে তোমার চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মমত ও আচার থেকে আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করি নি বিক্ষিপ্ত করেছি। তাই নিয়ে তোমার নিরন্তর দ্বন্দ্ব চল্‌চে— অথচ এ দুঃখ আমি কোনোদিন তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি নি। কারো মত নিয়ে আমার কোনো জেদ নেই, ধর্ম্মবিশ্বাসের পার্থক্য নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কারো প্রতি আমার মনের বিরুদ্ধতা জাগে না। কেবল গোঁড়া মুসলমানদের মতো যারা ধর্ম্মান্ধ তাদের প্রতি মনকে শান্ত রাখা আমার পক্ষে কঠিন হয়। তোমার নিষ্ঠাভক্তির মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে সেটাকে আমি যে কেবলমাত্র শ্রদ্ধা করতে পারি তা নয় তার সৌন্দর্য্যে আনন্দিত হতে পারি। আমার বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ মিল হতে পারে না, এমন কি তার মধ্যে হয়‑তো অনেক কিছু থাকতে পারে যেটা আমার মতে আমাদের দেশের কল্যাণের অন্তরায়। কিন্তু মতের সঙ্গে মতান্তরের সংঘাত যতই হোক তাতে মানুষের প্রতি আমার সৌহার্দ্দ্যকে ক্ষুণ্ণ করে

না। আমার এতদিনকার অভিজ্ঞতায় এটা আমি দেখলুম, আমার রচনায় বা কর্ম্মে দেশের জন্যে যা কিছু করে থাকি নে কেন, আমার শক্তিকে স্বীকার করেও দেশ আমাকে ভালো-বাস্‌তে পারে নি। এই জন্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আমাকে কুৎসিত নিন্দা করতে নিন্দুক শুধু যে সাহস পায় তা নয় সে নিন্দা নিয়ে লাভের ব্যবসা সম্ভব হতে পারে। তাতে সাধারণের মনে সে পরিমাণে আঘাত লাগে না বলেই এমনটা হতে বাধা পেল না। তোমাদের গভীর অন্তরে এর বিরুদ্ধে তোমাদের ঘৃণা নেই করুণা নেই— হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেও তোমাদের মনের অবচেতন রাজ্যে এর সমর্থন এমন কি আনন্দ আছে। এ কথাটা আমি বুঝে নিয়েছি, স্বীকার করে নিয়েছি, দেশের কাছ থেকে এর বেশি আশা করি নে। প্রতিবাদস্বরূপে অনেকে বলেন দুই এক জনের অপরাধ সকলের পরে আরোপ করা উচিত হয় না— আমার উত্তর এই, যে-হিংস্রতাকে সকলেই বিনা আপত্তিতে মেনে নেয় সে হিংস্রতায় সকলেরই ভাগ আছে। ব্যবসায়ে একজাতীয় ভাগীদার আছে যাকে ইংরেজিতে বলে Sleeping partner— অর্থাৎ ঘুমন্ত সরিক, তারা ব্যবসায়ের পরিচালনায় হাত দেয় না, লাভের অংশ অক্রিয়-ভাবে পায়। দেশে আমার নিন্দাব্যবসায়ের ঘুমন্ত সরিক তোমরা সবাই। একদিন এ কথা আমার মনে সুস্পষ্ট হয়েছিল যখন তুমি আমার ব্যবহারসামগ্রী সহজেই এমন কাউকে দান করতে পারলে যাঁর লেখনী আমার প্রতি কটূক্তিতে সর্ব্বদা বিষাক্ত। মনে কোরো না এই ঘটনায় তোমার থেকে আমার

স্নেহ স্খলিত হয়েছে। আমি কেবল এইটুকু বুঝে নিয়েছি অন্তরতর ভাবে তোমরা আমাকে আপন করে নিতে পারো না। আমার গুণের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু ব্যক্তির প্রতি মমতা নেই। তাই নিন্দার শরবিদ্ধ হয়ে আজ ৩৪ বৎসর দেশের জন্যেই নিজেকে প্রায় দেউলে করে দিয়ে দেশের কাজ একলা করেছি— অহৈতুক বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে নিঃসহায় চলতে হয়েচে। দেশের বড়ো ছোটো অনেকেই তাঁদের নিজের কাজের প্রয়োজন হলে আমার কাছ থেকে সাহায্য আদায় করতে কুণ্ঠিত হন নি কিন্তু এক দিনের জন্যেও মনে করেন নি আমারো সাহায্যের প্রয়োজন আছে, সাহায্যের না হোক্ অনুকম্পারও দাবী করতে পারি। কঠোর সত্যকে অবিচলিত চিত্তে স্বীকার করে নিতে একান্ত ইচ্ছা করি, এক এক সময়ে বেদনা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই অসহিষ্ণুতার জন্যে লজ্জিত হই। ইতি ৭ অগস্ট ১৯৩৪

দাদা

১৪৭

১৭ অগস্ট ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার যথার্থ পরিচয় কখনো তোমার কাছে স্পষ্ট হবে না। সেই জন্যেই এত বড়ো ধিক্কারের কথা মনে করতে পারলে যে সজনীকান্তের সঙ্গে তোমার সৌহৃদ্য ভেঙে দেবার জন্যে

আমার দরবার আছে। এমনতরো ভাঙাভাঙির চেষ্টাকে আমি পুরুষোচিত মনে করি নে— এটা লজ্জাকর। ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণের উপর সব সময়ে বন্ধুত্ব নির্ভর করে না। ভালোবাসতে পারি কারো স্বভাবের ত্রুটি সত্ত্বেও। এ নিয়ে লেশমাত্র আপত্তি করা আমার অযোগ্য। দেশের অধিকাংশ লোকে আমাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না, এবং আমার আঘাতে অপমানে যথেষ্ট ব্যথিত হয় না, এই সত্যকে আমি স্বীকার করে নিয়েছি— বুঝেছি দেশের মধ্যে তার স্বাভাবিক কারণ রয়েচে। যদি দেখা যায় সকল চেষ্টা সত্ত্বেও আমার বাগানের মাটিতে আমের মধ্যে কীট জন্মায় তবে মনে আক্ষেপ হতে পারে কিন্তু আবহাওয়ার সঙ্গে রাগারাগি করতে গেলে ছেলেমানুষি হবে। তোমাকে আমি দোষ দিই নে। মনের অনেক ক্রিয়া স্বভাবের গূঢ় প্রবর্ত্তনায় আমাদের অগোচরেই ঘটে, তার উপরে সচেতন চিত্তের কর্তৃত্ব খাটে না। আমি কখনো তোমার কাছে কোনো দাবী করি নি যা তুমি নিজের থেকে স্বীকার না করেচ। তোমার কাছে আমার পরিচয় ও স্বীকৃতি তোমার নানা গভীর সংস্কার শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের দ্বারা অনুরঞ্জিত হতে বাধ্য। তার অনেক মাল মসলা তোমার স্বকৃত। এক দিকে তোমার আপন হাতে গড়া এই মূর্ত্তিকে যেটুকু পরিমাণে সম্মান দাও তার মধ্যে হয়তো অতিশয়তা আছে— অন্য দিকে তাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে পরিমাণে খর্ব্ব করো তাও হয়তো বিধাতার আপন মাপের সঙ্গে মেলে না। দেশের যে মনোবৃত্তির সঙ্গে সহজেই তোমার মন মেলে তার অনেকাংশ আমার বিরুদ্ধ এটা অপরি-

হার্য্য। দোহাই তোমার আমার সন্তোষ কল্পনা করে সজনীকান্তের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের লেশমাত্র ব্যত্যয় ঘটতে দিয়ো না, যদি দাও তবে তাতেই তুমি আমাকে খাটো করবে। তোমাদের সমাজের দিক থেকে আমি ব্রাত্য, আমি একঘরে, আমি অস্পৃশ্য। এই বর্জ্জন আমার জীবনে দেবতার বরের মতো কাজ করেছে, এতে মানুষের অভিশাপ যদি লাগে, তবে তাতে সাপের নিঃশ্বাস লাগবে মাত্র বিষ লাগবে না। যে বিধাতা আমাকে পৃথক করে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার বন্ধু। এই সামাজিক অস্পৃশ্যতা পার হবার সময় কিছু পরিমাণ ঘৃণা মনে না নিয়ে আসতে পারো না। সেটাকে অতিক্রম করেও যদি আমাকে শ্রদ্ধা করে থাক সেটা কম কথা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে এমন অসম্ভব আবদার করব কোন্ দাবীতে। তুমি লিখেচ আমার কতকগুলো বইয়ের কতকগুলো কবিতা বাদ দিয়ে তোমার কোনো কোনো কবিতা ভালো লাগে। এ কথা বলবার কি কোনো প্রয়োজন আছে। আমার কবিতা বুঝতে পারে না এমন পুরুষ ও মেয়ে সংসারে অনেক আছে তাদের আমি খুবই ভালোবাসি— আমি তাদের কবি নাই হলুম আমি তাদের প্রিয়জন। আমার কবিতার কথাটা তোমাদের মুখে একেবারেই অবান্তর। তোমার মেয়ে হয়তো আমার কবিতার চেয়ে নজরুলের কবিতা ঢের বেশি পছন্দ করে সে কারণে আমি তাকে কিছুমাত্র কম স্নেহ করিনে।

স্বদেশের বাইরে আমার জন্যে সুপ্রশস্ত ও স্থায়ী আসন আছে— যখন জীবলোক থেকে বিদায় নিয়ে যাব তখন আমার ভাগ্যবিধাতাকে অক্ষুণ্ণ প্রণাম নিবেদন করে যেতে পারব— তিনি

আমাকে অনেক দিয়েচেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই মিনতি জানিয়ে যাব যে বাংলাদেশে আর নয়। ইতি ৩২ শ্রাবণ ১৩৪১

দাদা

১৪৮

২৩ অগস্ট ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে পরামর্শ দিয়েচ আমি যেন ঝগড়া না করি। তোমার কথা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব যেহেতু আমি ঝগড়া করিই নে। বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করে অবধি গালি ও নিন্দা আমি নিরন্তর পেয়েছি কিন্তু একবারও তার প্রত্যুত্তর দিই নি, প্রতিবাদ করি নি। আমার যে প্রবন্ধ নিয়ে দিলীপ ও শরৎ চাটুজ্জে ছেঁড়াছেঁড়ি করেচেন সেটা তাঁদের কোনো রচনার বিরুদ্ধে লিখিত নয়। তার কারণ এই, দিলীপের রচনা ভালো লাগে না বলে দু চার পাতা ছাড়া তাঁর কোনো বই আমি পড়তে পারি নি। শরৎ চাটুজ্জের গোড়াকার বই পড়ে আনন্দ পেয়েছি তাঁর চরিত্রহীনা [চরিত্রহীন] বই ভালো লাগল না বলে তাঁর হাল আমলের কোনো বই আমি পড়ি নি। তাঁরা গায়ে পড়ে ধরে নিয়েছেন যে তাঁদেরই লক্ষ্য করে আমি লিখেছি। ঝগড়া তাঁরাই করেছেন তাল ঠুকে, আমি চুপ করে আছি। এই চুপ করে থাকার চেয়ে আরো বেশি কী করতে পারি সেই পরামর্শ আমাকে

দিয়ো। যদি বলো কোনো লেখাই না লিখে নীরবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়, সেটা আমি স্বীকার করে নেব। কিন্তু এই পরামর্শ আরো ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে পেলেই সুখের হোতো— এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। যদি বলো কেবলমাত্র সেই লেখাই যেন লিখি যাতে কোনো মানুষের সঙ্গে মতের ভেদ না হয়, তবে সেই কোনো মানুষরা কারা জানতে চাই। এমন মানুষেরও সন্ধান মেলে যারা আমার মতকে শ্রদ্ধা করে। তুমি কি বল্‌বে কেবল তাদেরই সঙ্গে যেন আমার ঝগড়া বাধে এদের সঙ্গে নয়? তোমাকে আমার এই অনুরোধ, দ্বিজু রায় কাব্যবিশারদ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক সজনীকান্ত ও রমাপ্রসাদ চন্দ পর্য্যন্ত কার সঙ্গে ঝগড়া করে আমি একটা লাইনও লিখেচি, সেটা আবিষ্কার করে আমাকে দেখিয়ে দিয়ো, তাহলে স্বভাব সংশোধন করবার চেষ্টা করব। একতরফা গাল খাওয়াকে যদি ঝগড়াটের লক্ষণ বলো তাহলে সে সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য কী, আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ো। তুমি লিখেছ অল্প যে কটা দিন আমার মেয়াদ আছে বিবাদে যেন প্রবৃত্ত না হই। এ অনুরোধ রাখা কঠিন হবে না। প্রায় বছর পঞ্চাশেক যা না করেছি আরো দু চার বছর তা না করে থাকতে পারব। তোমারই প্রশ্নের উত্তরে একদা আমাদের দেশাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলুম। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করচি বলে সন্দেহ করি নি। সম্প্রতি তাও ছেড়ে দিয়েছি। আমার মতো লেখকের পক্ষে সম্পূর্ণ মৌনব্রতই যদি একমাত্র সাধুপথ হয় তবে সে পথ আসন্ন হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হতে

পারো— যে চতুরানন একদিন আমার মুখে ভাষা দিয়েছিলেন, তিনিই সে ভাষা সংহরণ করে নেবার জন্যে দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ইতি ৬ ভাদ্র ১৩৪১

দাদা

১৪৯

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

গোটাকতক ইংরেজি লেখার দায় আমার কাঁধে চেপেছে। তাই ছুটি পাচ্চি নে। আমার পক্ষে ইংরেজি সরস্বতীর মহল বিমাতার মহল। তবু সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা আছে। হলেও ও মহলে সহজে চলাফেরার অভ্যাস এখনো হয় নি। ইংরেজি কেন, আজকাল বাংলা লেখাতেও কলম কুঁড়েমি করে। চিরপরিচিত পথেও পা বেধে যায়— সে পথের দোষ নয়, পায়েরই দুর্ব্বলতা। এমন অবস্থায় আঙিনার বাইরে পা বাড়ানোই ভালো নয়। কিন্তু ওজর খাটে না— এত দীর্ঘকাল আমারই পদক্ষেপের চাপে যে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে, তাকে পরিহারের উপযুক্ত কোনো কৈফিয়ৎই কেউ মঞ্জুর করতে চায় না।

তোমার চিঠি পড়ে আমার বিস্ময় বোধ হয়। সব কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তি তোমার মধ্যে যেমন প্রবল আমাদের দেশে এমন অল্প লোকেরই মধ্যে দেখেচি। তোমার

ইন্দ্রিয়বোধের খোলা জানলায় তোমার মন সর্ব্বদা উৎসুক হয়েই আছে। এই উদাসীন আধেক কাণা আধেক কালার দেশে বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে এমন জাগরূক চৈতন্য কোথা থেকে পেলে? আমাদের দেশের হাল আমলের ধর্ম্মসাধনা এই জিনিষটাকে কম্বল চাপা দিয়ে রাখে, বিশ্ববিষয়ের প্রতি এই উপেক্ষাকেই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে স্থির করে রেখেছে। এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টির ক্ষীণতা যে মানসিক জড়ত্বের লক্ষণ তা তারা মানতে চায় না। তোমার মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক উৎসাহ আছে— তুমি সব জিনিষকে স্পষ্ট দেখ্‌তে চাও— তোমার নিজেকেও তুমি খুব স্পষ্ট করে দেখে থাকো, তুমি আপনার কাছে আপনাকে ভোলাও না। এইখানেই তোমার প্রকৃতিগত আধুনিকতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অদৃষ্টক্রমে তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ— শুধু যে কেবল সামাজিক আবরণ তোমাকে বেষ্টন করে রেখেছে তা নয়, আজন্মকাল শিক্ষার অভাবও কঠিন জেনেনা, তার দেয়ালে ফাঁক অল্পই। তোমার বুদ্ধি তোমার অশিক্ষার অন্তরাল ভেদ ক'রে কিছু কিছু দেখে শুনে নেয়— কিন্তু জানা ও না-জানার মিশ্রণে তোমার অনেক ধারণা উপছায়ার আশ্রয় হয়ে উঠেছে। তোমার স্বাভাবিক শক্তি বাধাগ্রস্ত হয়ে যে এমনতরো ব্যর্থ হয়ে রইল এ কথা মনে করে দুঃখ বোধ করি।

ক'দিন দুঃসহ গরম গিয়েছে— অদৃশ্য বাষ্পের আস্তরণের নীচে পৃথিবী দিনরাত হাঁপিয়ে ঘেমে মরছিল। কাল হঠাৎ ঘনঘোর মেঘ এসে সমস্ত আকাশ থেকে জ্বরের তাপ সরিয়ে

দিয়েছে। বাতাসে প্রফুল্লতা, আলোকে প্রসন্নতা; গাছের কম্পিত ডালপালা ঝলমল করচে, শরতের আশ্বাসবাণী জলস্থল আকাশে মন্দ্রিত হোলো। ইতি ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

দাদা

১৫০

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ব্যস্ত ছিলুম, এখনো ব্যস্ত আছি। অন্য নানা কাজ তো আছেই তার উপরে আমার বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব এসেচেন— তাঁর আতিথ্যে ও আলাপ আলোচনায় অনেকটা সময় দিতে হচ্চে। তাঁর মত বন্ধু আমার দ্বিতীয় আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর বন্ধুত্ব বলিষ্ঠ প্রকৃতির বন্ধুত্ব— শুধু ভাবাকুল বন্ধুত্ব নয় ত্যাগপ্রবণ বন্ধুত্ব, আমার জন্যে সব করতে পারেন তিনি। এ রকম ভালোবাসা দুর্লভ।

মুখভারকরা চাপা নিবিড় রাগ হঠাৎ কান্নাকাটি বকাবকিতে আলোড়িত হয়ে উঠ্‌লে যেমন হয় তেমনি হয়েছে এখানকার আকাশের ভাবখানা। গুমটের আবরণ ছিন্ন করে ঝোড়ো বাদলা প্রবল হয়ে উঠেচে। আমার সামনের গাছগুলো খুব মাথা-ঝাঁকানি দিচ্চে আর সেই সঙ্গে মুখর মর্ম্মরে ডাল নাড়ানাড়ি। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে পাণ্ডুর আকাশের ভ্রূকুটি দেখা যাচ্চে দিগন্তে

পরিস্ফীত মেঘস্তূপে। উত্তাপ নেই, আন্দোলন আছে আমাদের দেশের মধ্যমপন্থী রাষ্ট্রনায়কদের নকল দেখা যাচ্চে আজ দেব-সভায়। মেঘের গর্জ্জন নেই বিদ্যুৎ নেই, কেবল অজস্র অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের পালা। চাষীরা তাকিয়ে ছিল এই বৃষ্টির আশায়। কচি ধানগুলো শুকিয়ে আসছিল সেই সঙ্গে চাষীদের মুখ। মর্ত্ত্যলোকে ওদের আছে মহাজন, আকাশে আছেন পর্জ্জন্য দেব, — উপরওয়ালা বর্ষণ না করলে নিচেরওয়ালাও বর্ষণ বন্ধ করে। আর ওরাই বহন করচে কূর্ম্মের মতো আমাদের সবাইকে, জমিদারকে উকিলকে ডাক্তারকে পণ্ডিতমশায়কে। অথচ ওরাই অস্পৃশ্য উপেক্ষিত অশিক্ষিত, আধপেটা, আধমরা।

কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যেতে হচ্চে। দিন চার পাঁচ রাজধানীতে কাটবে। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

দাদা

১৫১

[বরানগর] ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল থেকে নির্ব্বাসনে আছি। আমার শান্তিনিকেতনের নীড় ছেড়ে চলে এসেচি রাজধানীপাড়ায়। শরৎশ্রী সেখানে দেখা দিয়েছে তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে। শিউলি ফুলে বিছিয়ে দিয়েচে বনতল— কচিধানের ক্ষেতের আলের কাছে বিকশিত হয়েছে কাশের গুচ্ছ, বৃষ্টিধৌত কাঞ্চনের চঞ্চল পাতা থেকে

বিচ্ছুরিত হচ্চে প্রভাতের সূর্য্যকিরণ, চেয়ে চেয়ে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। সেখানে আকাশ অবারিত, দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টির অধিকার— আমার চোখের ছুটি মনের ছুটি দ্যুলোকে ভূলোকে। বরানগরের যে কোণে আশ্রয় নিয়েছি এখানেও বিশ্বপ্রকৃতির আতিথ্য পাওয়া যায়। চোখ মেলে দেখতে পাই বাংলা পল্লী-শ্রীকে। জানলা থেকে সামনে দেখা যায় পুকুরের একটা প্রান্ত কলমি শাকে ঢাকা, নারকেল সুপুরি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সব গাছকে ছাড়িয়ে— আম কাঁঠাল জামরুল বাতাবিলেবুর ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছে গাছে আকাশকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করেছে। কিছু দূরে আল্‌সেহীন দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে সাড়ি ঝুলচে— গাছপালার অন্তরালে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে গ্রামোফোনের খেলো সুর শোনা যাচ্চে, বাড়ির পিছন থেকে লিচুগাছের কোন্ প্রচ্ছন্ন ডালের থেকে ডাকচে "চোখ গেল"। প্রথম শরতের ঈষৎ স্নিগ্ধ বাতাস দিয়েছে রৌদ্রে ঝিলমিল করতে করতে দুলচে নারকেলের ডালগুলি। ইতি ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

দাদা

১৫২

৯ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার প্রেরিত ফলের ঝুড়ি এই মাত্র এসে পৌঁছল। তার ভোগও আরম্ভ হয়েছে। রেলযাত্রায় ও পরস্পরের পেষণে

ফলগুলি বেশি ক্লিষ্ট হয় নি। প্রায় সবগুলিই প্রসন্ন আছে। শীতলপাটিও ব্যবহারে লাগ্‌বে। আজ থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের এই প্রান্তরের বাসা শূন্য হতে আরম্ভ হোলো। পর্শু দিনের মধ্যে মানবজাতীয় নানা পক্ষীর প্রায় সকলেই দশ-দিকেতে অন্তর্ধান করবে। বাকি থাকবে আমাদের গাছপালা আর ডানাওয়ালা পাখীগুলি। এই সময়টি এখানে অত্যন্ত মনোরম— এক মুহূর্ত্তের জন্যে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, এবং কাজকর্ম্ম করতেও মন যায় না। দেবতারা যে আলস্যপাত্র পূর্ণ করে নন্দনবনে সুধাপান করে থাকেন সেই পাত্রটি চুরি করে আনতে ইচ্ছে করে। তাঁদের কারো কাছে কোনো জবাব-দিহি নেই। আমরা কর্তব্যবিরত হলেই নীতিজ্ঞ সাধুজনেরা তর্জ্জনী তুলে ভর্ৎসনা করতে আসেন। বিপদ এই, সেই নীতিজ্ঞ যে কেবল বাইরেই আছেন তা নয়, তিনি ভিতরেও কোথাও এক কোণে বাসা নিয়েছেন— অন্যমনস্ক হলেই তাঁর সাড়া পাওয়া যায়, ধড়ফড় করে চমকে উঠতে হয়। অতএব এখানকার পালা শেষ করে দেবলোকে যদি আমার গতি হয় তবেই স্বর্গীয় অবকাশের অধিকার নিঃসঙ্কোচে দাবী করতে পারব— অমরা-বতীতে কবির প্রয়োজন থাকতেও পারে এই আমার একমাত্র আশা। আমি বাসন্তীর জন্যে আমাদের বর্ষামঙ্গলের একটা প্রোগ্রাম পাঠাচ্ছি। গান শুন্‌লে নাচ দেখলে নিশ্চয় সে খুসি হোতো— কল্পনায় প্রত্যক্ষতার অভাব যতটা পারে পূরণ করে নিতে বোলো। সঞ্চয়িতার ২য় সংস্করণ তোমার জন্যে পাঠাই— ওতে অনেক বেশি কবিতা আছে। ১৯ অক্টোবরে এখান থেকে

মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করব। ফিরতে ঐ মাসের শেষ। ইতি
৯ অক্টোবর ১৯৩৪

দাদা

১৫৩

১৩ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সঙ্গীয় চিঠিখানি কিছু কাল পূর্ব্বে তোমাকে লিখেচি। কর্ম্মচারীকে বলে দিয়েছিলুম লেফাফায় তোমার ঠিকানা লিখে পাঠাতে। সে গৌরীপুর আসাম লেখাতে অমিয়র বাবার ঠিকানায় পৌঁছয়। তিনি আমার ভাষা দেখে চিঠিখানি নিশ্চয়ই আমার লেখা ঠাউরে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই সঙ্গে দুখানা বই পাঠিয়েছিলুম তার কী গতি হোলো জানি নে। পারি তো উদ্ধার করে পাঠাব।

আজ দু দিন থেকে ঝড় বৃষ্টি চল্‌চে। মনে আছে বাল্যকালে সপ্তমী পূজোর দিন একবার প্রচণ্ড ঝড় নেমেছিল। এবারে আকাশের মুখখানা সেই রকমের অপ্রসন্ন। থেকে থেকে কালো, থেকে থেকে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠচে— চঞ্চল গাছপালার উপর একটা আভা পড়েচে সে যেন উদ্বেগের আভা। ছেঁড়া ছেঁড়া বৃষ্টি প্রবল পূবে হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্চে। আজ পূজোর সকালে পাখীগুলোর উপোষ। দুটো একটা শালিখ ভোরের দিকে আহারের চেষ্টায় বেরিয়েছিল, ঝড়ের প্রকোপে অনতিকালের

মধ্যে মন খারাপ করে চলে গেছে। মাদ্রাজ যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত আছি। ইতি ১৬ অক্টোবর ১৯৩৪

দাদা

১৫৪

৩১ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বই দুখানা পেয়েছ খবর পেয়ে খুসি হয়েছি। আর যাই করো অযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে দান কোরো না।

আমাদের এখানে আজ শাপমোচনের পালার শেষ দিন। ফেরবার পথে ওয়াল্‌টেয়রে বিজিয়নগ্রামের মহারাণীর কাছে নিমন্ত্রণ পেয়েছি— সেখানে অভিনয়টা শেষ করে তার পরে ছুটি পাব।

প্রবল বৃষ্টিতে এখানকার সহরটা উভচর হয়ে উঠেছিল। রাজপথ জলপথ হলে সেটাতে পথের কাজ চলে না। সেইজন্যে অভিনয়ের প্রথম দুদিন আমাদের পক্ষে ফাঁড়া গেছে। কাল বৃষ্টি ছিল না— থিয়েটরে ফাঁকা জায়গা ছিল না অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল— আজও ভিড় হবে।

আশ্রমে শরৎশ্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। একটা শুক্ল পক্ষ কেটে গেল— লক্ষ্মীপূর্ণিমার আবির্ভাব হয়েছিল এই মাদ্রাজে, কিন্তু মুখ ঢেকে।

যে জায়গায় আতিথ্য পেয়েছি এখানটা খুব সুন্দর। অদূরে

সমুদ্র, চারি দিকে বড়ো বড়ো প্রাচীন বনস্পতির ছায়া। ছায়ালোকখচিত অরণ্যবীথিকার স্নিগ্ধ শান্তি গিয়ে পেঁীচেছে তরঙ্গমুখর সমুদ্রের চঞ্চলতায়। এ বাড়ি সহর থেকে দশ মাইল দূরে। নইলে দর্শনার্থীর সংখ্যা দুঃসহ হয়ে উঠ্‌ত।

সময় সঙ্কীর্ণ। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩৪

দাদা

১৫৫

৮ নভেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াস্থ

আমার নামে অসংখ্য অসত্যের প্রচার হয়ে থাকে তার মধ্যে আরো একটা তোমার কাছে শোনা গেল। সে হচ্চে আমার ব্লাড প্রেশরের জনশ্রুতি। মৃত্যুর সহস্র দ্বার খোলা রয়েছে কিন্তু রক্তের উত্তেজনায় আমি মরব না সে সংবাদ আমার ভালো করেই জানা আছে। য়ুরোপে এবং এ দেশে বড় বড় ডাক্তার আমার রক্তবেগ পরীক্ষা করে দেখেচেন, তাঁরা বলেন আমার নাড়ী চৌত্রিশ বছর বয়সের নাড়ী। এমন কি, তাঁদের মতে আমার কোনো দেহযন্ত্রেই ক্ষয় বা বিকৃতি ঘটে নি। আমার শরীরের একমাত্র অপরাধ তার দুর্ব্বলতা। তাকে অতিপরিমাণে ক্লান্ত করা হয়েছে। তার প্রতিকার, যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম। কিন্তু চারদিকের সকলের সম্মতি না থাকলে বিশ্রাম অসম্ভব। দায় দাবীর অন্ত নেই— বাজে কাজের মহাকায় দানব প্রত্যহই

কাঁধে চড়ে মেরুদণ্ডের উপর তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকে। বাঙালী অভিমানী জাত— বড়ো ছোটো সকলেরই সকল প্রকার অনুরোধই সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাই মরণের উপরেই অন্তিম ভার, তিনিই আছেন আমার বিশ্রামের আয়োজন সাজিয়ে।

মাদ্রাজের পালা শেষ করে এলেম। ফেরবার পথে ওয়ালটেয়রে ভিজিয়নগ্রমের মহারাণীর অতিথি ছিলুম। কিন্তু সে তো আতিথ্য নয়, ষোড়শোপচারে পূজা। এরোপ্লেনে করে মাদ্রাজ বাঙ্গালোর থেকে প্রতিদিন ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল আসত— আমার চলবার পথ ঢাকা পড়ত গোলাপের স্তূপে। দেবতার নৈবেদ্য অসঙ্কোচে গ্রহণ করবার মতো স্পর্দ্ধা আমার নেই— কিন্তু মহারাণীর অকৃত্রিম ও সুমধুর ভক্তিই আমার লজ্জা দূর করে দিত। মনে জানতুম এর মূল্য আমার নয়, সে ঐ ভক্তিরই। প্রস্রবণ যেমন পাথরের মধ্যে দিয়ে আপনার পথ আপনিই খনন করে চলে, নারীহৃদয়ের পূজাউৎসও তেমনি আপন গতিবেগেই আপন তটের সৃষ্টি করে— তার মধ্যে প্রবাহিত সেই ধারারই জয়। মহারাণীর একটি মেয়ে আছে, সুন্দর দেখতে, তার নাম উর্ম্মিলা। স্টেশনে আমাকে মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। প্রথমেই আমাকে পরিচয় দিলে আমি আপনার নাৎনী। ওরা দাদামশায়কে বলে নানা। বস্তুত আমার দাদামশায়ের পদটা “নানা” বিশেষণ পাবারই উপযুক্ত হয়েছে।

অনেকদিন পরে স্বস্থানে ফিরে এসে ভালো লাগচে। ইতিমধ্যে শরৎকে ঠেলে দিয়ে শীত চড়ে বসেচে সিংহাসনে। শিউলিশাখায় বীজ ধরে গেছে— চামেলি দুটো একটা ফুটচে কিন্তু মালতী চলে

গেছে নেপথ্যে। এখন আসর জমিয়েছে হিমঝুরি ফুল। ও নামটা আমারই দেওয়া নাম, ফুল তোমার চেনা কিনা জানি নে। পশ্চিমে এ গাছের খুব প্রাদুর্ভাব। লম্বাবৃন্তওয়ালা শাদা শাদা ফুল— কেবলি ঝরে ঝরে পড়চে গাছতলায়। দীর্ঘ উঁচু গাছ, নিমের মত পাতা, ফুলে শাদা হয়ে গেছে তার শিখর, আমার মাথার মতো। গন্ধটি সুমিষ্ট। উত্তর দিক থেকে হাওয়া দিচ্চে, কোনো কোনো গাছের পাতা ঝরে পড়তে সুরু হোলো। দিন যত এগোতে থাকে মর্ম্মরিত বনভূমির মধ্যে রৌদ্রের লীলা ততই লাগে ভালো। এই অবারিত প্রান্তরের মধ্যে শীতের মধ্যাহ্ন আমার কাজ ভুলিয়ে দেয়— দিকপ্রান্তের নীলিমার মধ্যে আমার মুগ্ধদৃষ্টি হারিয়ে যায়। ইতি ২২ কার্ত্তিক ১৩৪১

দাদা

১৫৬

২১ নভেম্বর ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার সঙ্গে অনেকদিন তর্ক করি নি আজ করব। আমাকে বিজয়নগ্রমের মহারাণী ভক্তি নিবেদন করেছিলেন, সেই ভক্তির সঙ্গে পাণ্ডার পা পূজোর সমমূল্যতা অবধারণ করেছ। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কী সেটা বলা আবশ্যক। আমাকে ভক্তি করার মধ্যে ঐহিক বা পারত্রিক কোনো ফললাভের প্রলোভন নেই। বোধ করি মহারাণী আমার মধ্যে ভক্তিযোগ্য কোনো মহত্ত্ব

কল্পনা করেছিলেন, সেটা তাঁর ভুল হতে পারে কিন্তু মহত্ত্বকে ভক্তি করা অহৈতুক, সেটা বিশুদ্ধ ভক্তি। কিন্তু তোমাদের যে সব মেয়েরা স্বর্গফলের লোভে ঘটা করে দেবতার পূজো দেন এবং সেই ফলকে সমাপ্তি দেবার জন্যে পাণ্ডার পা দেন মোহরে ঢেকে তাঁদের এই মনোবৃত্তিকে যদি ভক্তি নাম দাও, তাহলে বৈষয়িক ফৌজদারী মকদ্দমার অনুকূলে দারোগাকে যে ঘুষ দেওয়া হয় সেও তো ভক্তি বলে গণ্য হতে পারে। এমনতরো বিকৃতিকেও তোমরা ভক্তি নাম দিতে পারো সে আমাদের দেশের আব-হাওয়ারই দোষে। এই মনোভাবের থেকেই তোমাদের পণ্ডিত তর্ক করেন যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন অক্ষৌহিণী সৈন্য নাশ করতে পেরেছেন তখন পূজা উপলক্ষ্যে শত সহস্র পাঁঠা মহিষ বলি দিতে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ভগবানকে বারে বারে জন্ম নিতে হয় এই কথা গীতায় আছে। ধর্ম্মযুদ্ধে অনিবার্য্য নিধনকার্য্য নিরাসক্ত মনেই করা যেতে পারে কিন্তু দেবী যে প্রত্যহ পাঁঠার রক্ত পান করে থাকেন তারা কি দুষ্কৃতের দলে— যারা তাদের বধ করে তাদের চেয়েও কি তারা দুষ্কৃত। মহাভারতের বকাসুর রোজ একটা করে মানুষ খেত— ভারতের পূজামন্দিরে দেবীও মহামাংস-নৈবেদ্যকে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য বলে গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ আছে, উক্ত অসুরের লোভের সঙ্গে এই লোভের প্রভেদ কি? পাঁঠার রক্তলোভও সেই জাতেরই। পুরাণ কাহিনীতে আছে চণ্ডী কোনো এক যুগে মহিষ নামধারী দানবকে বধ করেছিলেন— দানব যদি দুষ্টস্বভাব হয় তবে দেবী ভালোই

করেছিলেন, কিন্তু হতভাগা মহিষ পশুটা কী দোষ করেছে? কিন্তু মহিষের রক্তে দেবী প্রসন্ন হন এই কল্পনা করে যারা পূজা করে তাদের পূজা কি পূজা, না দেবতার অবমাননা? বোলপুরের কাছে কঙ্কালীতলা বলে এক তীর্থে বৎসরে একবার বিশেষ পরবে নানা ভক্তের মানৎরূপে বহু শত পাঁঠার বলিদান হয়, নিকটের জলাশয় রক্তে লাল হয়ে ওঠে। এই লুব্ধ হিংস্রতাকে যদি পূজা নাম দিতে কুণ্ঠা না হয় তাহলে পাণ্ডার পা পূজাকেও ভক্তি নাম দিতে পার। ভক্তিকে রিপুর দলে ফেলো না। এমন কি ভক্তি দেখিয়ে দেবতার প্রসন্নতা লাভ করা যায় এ মনে করাতেও ভক্তির খর্ব্বতা করা হয়। ভক্তি যে করে ভক্তিতে তারই চরিতার্থতা।

আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্য হয় এও আধ্যাত্মিকতার নামে স্থূল বৈষয়িকতা। পুণ্য অন্তরের সামগ্রী, এবং সে পুণ্যে পারত্রিক সদ্গতির কথাও স্থূল বস্তুতন্ত্রতা। আমাদের দেশে পুণ্যকে পণ্য-সামগ্রী করে তুলেছে— দেশ পায়ের ধুলো বিক্রি করে লোভীদের কাছে।— আচারের অনর্থক উপকরণ বাহ্য পদার্থ, হাটে নানা নামে তাদের বেচাকেনা চলে; একদা মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নানের পরে আমাকে তিলকচর্চ্চিত করে যে মানুষ মূল্য নিয়েছিল পুণ্যকে এতদূর শস্তা করার দ্বারা সে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা করে থাকে সেই দুর্গতির ভারেই ভারতবর্ষের মাথা আজ হেঁট হয়ে গেছে।— এই পর্য্যন্তই থাক্। তর্ক করে কোনো লাভ নেই। ইতি ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪১

দাদা

১০৭

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি আজন্ম ব্রাত্য। মর্ত্তধরণীর বুকের কাছে আমার বাসা — এখানকার মাটির ভাঁড়ে যে অমৃত পাই তাই আমার যথেষ্ট। পারত্রিকের ঠিকানা জানি নে, যারা সেখানকার বিবরণ জটিল ভাষায় বিস্তারিত করে বল্‌তে আসে তাদের কথা বুঝতেও পারি নে বিশ্বাসও করি নে। সকল জাতির সকল শাস্ত্রই দৈবদত্ত নিখুঁৎ সত্যের অহঙ্কার করে অথচ তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আদায় কাঁচকলায়। মধ্য আফ্রিকার বর্ব্বরও তাদের নিরর্থক আচারকে ধর্ম্মের পদবী দিয়ে তার শুচিতার অভিমানে রোমাঞ্চিত, আমাদেরও সেই একই দশা। এই পরস্পর প্রতিযুধ্যমান শাস্ত্রকে আমি দূর থেকে নমস্কার করি— শ্রেয়োবোধের অনুমোদিত শুচিতাকেই পালন করতে আমার প্রয়াস,— যে বাহ্য আচার মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে প্রাচীর তুলে বেড়ায় মানবপ্রেমকে, ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে শাস্ত্রের অক্ষর বাঁচাবার জন্যে খুনোখুনি করতেও অগ্রসর হয় তাকে বর্জ্জন করে নাস্তিক অধার্ম্মিক পদবী নিতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই। পাণ্ডার পা পূজো করে যে আত্মাবমাননা হয় তার দ্বারাও ভক্তির সার্থকতা ব্যাখ্যা করবার মতো শাস্ত্রিক সূক্ষ্ম তর্ক আমার বুদ্ধির অতীত। অতএব আমাকে ভিন্ন জাতের মানুষ বলেই জেনো, আমি তোমাদের ত্যাজ্য। আমার গতি হবে কোথায় সে জন্যে

আমি ভাবিই নে— খামকা যমদূত আমার ঝুঁটি ধরে যদি কুম্ভী-পাকের দিকে টানাটানি করে তবে তার সেই রূঢ় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করব, বলব তার যে মনিবের এমনতরো বুদ্ধিহীন হৃদয়হীন বিধিবিধান তার বিরুদ্ধে আমার চিরকালের বিদ্রোহ— তাকে ঘুষ দিয়ে স্বর্গে যেতে চাই নে— কেননা সেখানে গিয়ে শাস্ত্রীয় ভাষায় নিয়ত যার খোষামোদ করে আত্মরক্ষা করতে হবে তাকে আমি সম্মান করতে অক্ষম। যে বিধাতা আমাকে বুদ্ধি দিয়েচেন, মানুষভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা দিয়েছেন, মানব-প্রেমের ত্যাগপরায়ণ দুঃসাধ্য সাধনার দিকে আহ্বান করেছেন, তাঁকে ভক্তি করেই আমার ভক্তিবৃত্তিকে ধন্য বলে মানি— তাঁরই বিধান আমার যুক্তিতে আমার শুভবুদ্ধিতে সহজ বলে বোধ হয়, তাই আমার শিরোধার্য্য।

সজনীকান্ত আমাকে শ্রদ্ধা করতে করুণা করতে স্বভাবতই অক্ষম সে জন্যে আমি তাঁকে দোষ দিই নে। আমার রচনায় বা ব্যবহারে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা তাঁকে এতই উদ্বেজিত করে যে তিনি আমাকে অপমান না করে থাকতে পারেন না। নিষ্কাম সাহিত্যসমালোচনার সঙ্গে তার প্রভেদ আছে। যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি তার ত্রুটিকে নির্দ্দেশ করা আমাদের কর্ত্তব্য হলেও তাকে অসম্মান করতে আমরা সহজেই কুণ্ঠিত হই। আমি জানি তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অপরাধ সম্বন্ধেও নিঃশব্দে ধৈর্য্য প্রকাশ করে থাকেন। সাহিত্যে তাঁর আদর্শই যদি একমাত্র আদর্শ হয় এবং সেই আদর্শের সঙ্গে আমরা মিলিয়ে না চললেই আমরা যদি সৌজন্যের অধিকার

থেকে বঞ্চিত হই তবে তাঁর সেই দুর্জ্জয় অভিমানকে মেনে চলে চলে মান রক্ষা করতে হবে এমন আশা কী করে করবে!— কিন্তু নিশ্চিত জেনো তাঁর প্রতি তোমার বন্ধুভাবকে আমি মনের এক কোণেও বাধা দিতে ইচ্ছা করি নে। আমার খাতিরে যদি তাঁর প্রতি তোমার সৌহার্দ্দ্যের কিছু খর্ব্বতা ঘটাও সেটা আমার প্রতিই তোমার অসম্মান হবে। আমি নিজে তাঁর অশ্রদ্ধার আবেষ্টন থেকে দূরে থাকতে চাই কিন্তু তাঁকে দণ্ড দেবার ইচ্ছা আমার মনে যদি জাগে তবে সেইটেই আমারই সব চেয়ে বড়ো দণ্ড। আর ক'দিনই বা বেঁচে থাকব— যেখানে স্নেহ পেয়েছি শ্রদ্ধা পেয়েছি করুণা পেয়েছি সেখানেই আসন পেতে আনন্দে কাটাতে চাই, বিরোধ বিদ্বেষের প্রতিবেশে মনকে কলুষিত পীড়িত করতে যাব কেন? ইতি ১০ ডিসেম্বর ১৯৩৪

দাদা

১৫৮

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। এখনো ব্যস্ততার অবসান হয় নি— জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কবে হবে তাও জানি নে। নিষ্কৃতি চাই যে তাও সত্যি, চাই নে এও সত্যি। আমার মধ্যে নিভৃতচারী অবকাশবিলাসী ধ্যানপরায়ণ মানুষও আছে আবার আছে

কর্ম্মের মধ্যে যে আপন সার্থকতা সন্ধান করে। কর্ত্তব্যের পরিকল্পনা মনের মধ্যে যখন জেগে ওঠে তখন তাকে রূপ দেবার জন্যে মন আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ তো কাব্য মহাকাব্য লেখা নয়, ভাব নিয়ে শব্দ নিয়ে ছন্দ নিয়ে সাধনা নয়, বহুতর মানুষকে নিয়ে কাজ,— অনেক বিষয়েই আমার স্বভাব ও ইচ্ছা থেকে স্বতন্ত্র স্বভাব ও ইচ্ছা তাদের। আমি রাষ্ট্রনায়ক নই, শাসননিপুণ নই, মানুষকে ভেঙেচুরে পিটিয়ে পিণ্ড করে কুমোরের মতো তাই নিয়ে মূর্ত্তি গড়ব আমার সে শক্তিও নেই প্রবৃত্তিও নেই। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহৎ আদর্শের চারদিকে আকৃষ্ট হবে, তার সাধনায় আপনাকে উৎসর্গ করবে এই প্রত্যাশা করি। কিন্তু এমন প্রত্যাশা কবির যোগ্য। বস্তুত নানা মানুষ আসে নানা আকর্ষণে, কেউবা অর্থের কেউ-বা খ্যাতির কেউবা কর্ত্তৃত্বের, তাদের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নানা রকমের, তাদের মধ্যে বিরুদ্ধতাও থাক্‌তে পারে— তাদের সবাইকে এক-শাসনে অভিভূত করে না আনতে পারলে এক-ফললাভের আশা থাকে না। সেই শাসনকার্য্যে আমার আনন্দ নেই। অথচ যে কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা আমি করেচি সে কর্ম্মকে বড়ো বলেই জানি, এও জানি যাদের মনে কল্পনা নেই, বুদ্ধিতে কাঠিন্য ও তীক্ষ্নতা থাকলেও দীপ্তি নেই এ কাজ তাদের নয়— কাজেই এই কর্ত্তব্যভার আমি ইচ্ছে করেই বহন করেছি। শুধু সাহিত্য নিয়েই জীবনযাপন যদি আমার পক্ষে স্বাভাবিক হোতো তা-হলে মনের আনন্দে সেই পথেই চলতুম। সে আর হোলো না। অতএব নালিশ করা আমাকে শোভা পায় না। আমার কাব্য

আমার দেশের লোক অনেক পরিমাণে স্বীকার করেচে— আমার কাজকে যদি স্বীকার না করে তবে দোষ দেব কাকে? বাঙালী দেশের কোন্ কাজকেই বা শ্রদ্ধা করে মেনে নেয়, কোন্ কাজকেই বা সাতখানা করে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা না করে? বাঙালীর অপরিসীম অহঙ্কারের কাছে কোনো কাজই তার সম্মতির যোগ্য বলে গণ্য হয় না। অহৈতুক প্রতিকূলতায় কণ্টকিত এই দেশে যে হতভাগ্য কোনো দুরূহ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় সে বঙ্গভূমির ভাগ্যগগনে নিত্যজাগ্রত দুর্গ্রহের অভিসম্পাত-গ্রস্ত।

তুমি এক্‌জিমার ওষুধের কথা জিজ্ঞাসা করেছ। একটা ভালো ওষুধ আছে। জানি নে সে গাছের পরিচয় তোমাদের কাছে কোন্ নামে? এখানে তাকে বলে বন-টেপারি। তার ফল দেখতে ঠিক ট্যাপারির মতো, পোষাকপরা। বেঁটে নিয়ে তারি রস লাগাতে হয়। একবারের বেশি লাগাবার দরকারই হয় না, বড়ো জোর দুবার। তার পরে আর প্রয়োগ না করে অপেক্ষা করে দেখ্‌তে হবে।

কাল কলকাতায় যাচ্চি— প্রবাসীসাহিত্যসম্মেলনে। ইতি

৯ পৌষ ১৩৪১

দাদা

১৫৯

১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার মানসপটে আমার মুখচ্ছবিতে তুমি একটি নিষ্ঠুর কৌতুকহাস্যরেখা দেখতে পাচ্চ।— এতদ্দ্বারা আমি তোমাকে জ্ঞাপন করচি যে সেটা তোমারি কল্পনাতুলিকাদ্বারা আরোপ করা— বিধাতার রচনার মধ্যে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না— সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে তাঁরই উপর তোমার চেয়ে বেশি নির্ভর করা যেতে পারে।

অনতিকালের মধ্যে আমাকে বাংলাদেশের বাহিরে চার জায়গায় যেতে হবে— অন্তত আটটা ইংরেজি বক্তৃতা না হলে মান রক্ষা হবে না। সময়াভাব কাকে বলে সেটা তোমরা অনুভব বা অনুমান করতে পারো না। বেকারশ্রেণীয় অভিজাত-মণ্ডলীর মধ্যেই তুমি জীবনযাপন করো তাই আমাদের মতো কর্ম্মভারগ্রস্ত মানুষের অবস্থা তোমার মনোগোচর হতে পারে না। বর্ত্তমানে আমার কী দশা, কর্ম্মস্থানে কোন্ গ্রহের দৃষ্টি সন্ধান করে দেখলে প্রকৃত খবর সমস্তই জানতে পারবে।

কাল রাত্রে এখানে আটজন জাপানী অতিথি এসেছেন। তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হবে। স্বভাবতই আমি কুণো অথচ বিরাট বহিঃসংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটিয়েছে আমার ভাগ্য। আমার অন্তরের বিরুদ্ধে বাহিরের এই প্রতিবাদ নিয়তই চলেছে। অতএব ইতি ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫

দাদা

১৬০

২২ জানুয়ারি ১৯৩৮

কল্যাণীয়াসু

আমার সমস্ত দিনের ভোজনের তালিকা তোমাকে পাঠাতে বাধ্য হলুম— নইলে মনে মনে কাল্পনিক অর্দ্ধভোজনের বিবমিষা তোমাকে পীড়িত করবে।

প্রাতে ৬টা :— মাখন দিয়ে তোস্-করা রুটি দুই খণ্ড। তৎসহযোগে বিলিতি বেগুনের জ্যাম, গৃহজাত। অনেক পরিমাণে দুগ্ধসংযোগে চৈনিক চা। দুটি কদলী। বেগুনটা বিলিতি, তথাপি নিরামিষ।

মধ্যাহ্নে :— পালং, রাইশর্ষের শাক, ফুলকোফি, সেলারি (এক প্রকার বিলিতি সবজি) ট্যাড়স,— সমস্তই কাঁচা, খণ্ড খণ্ড করে মিশিয়ে তাতে আদা ও নেবুর রস দিয়ে তৎসহ পুদিনা শুল্‌ফ শাক মিশিয়ে কিঞ্চিৎ শর্করাযোগে সেবন করে থাকি। যেটাকে সেলারি বলচি এটা বিলিতি বটে কিন্তু দ্বিপদ বা চতুষ্পদ নয়, মাটি ফুঁড়ে ওঠে বটে কিন্তু শিং দিয়ে গুঁতিয়ে নয়। কালীঘাটে মানৎ করবার মতো এর মধ্যে ব্যথা, ভয় বা রক্তৎ কিছু নেই। তার পরে তোস রুটি, দুটো লবণস্পৃষ্ট, বাকি দুটো মিষ্টপ্রলেপযুক্ত। ক্বচিৎ সন্দেশ দিয়ে সমাপন করি।

অপরাহ্নে : ছাগদুগ্ধযোগে চা।

সায়াহ্নে : পূর্ব্বোক্তবৎ সবজির মিশ্রণ। পরিণামে যদৃচ্ছা-কৃত মিষ্টান্ন, সেটা মাছ বা মাংস দিয়ে রচিত নয়।

প্রাতে মধ্যাহ্নভোজনের পূর্ব্বে আধপোয়া আন্দাজ ছাগদুগ্ধ খেয়ে থাকি, কিন্তু তার পূর্ব্বে জগন্মাতার প্রসাদী ছাগের পিতৃ বা ভ্রাতৃপুরুষকে ভক্ষণ করি নে।

আর অধিক লেখবার সময় নেই। কাজের তাড়া আতিথ্যের কর্ত্তব্য শারীরিক পীড়া সব একত্র মিশেচে। ইতি ৮ মাঘ ১৩৪১

দাদা

১৬১

কল্যাণীয়াসু

কাল অর্থাৎ রবিবারে যাত্রা করে সোমবার সকালে কলকাতা পেঁছিব। হয় তো দু তিন দিন থাকতে পারি। জোড়া-সাঁকোয় এসে নামব তার পরে স্নানাহার সমাপন করে যাব বরানগরে। হয় তো বোটে থাকতেও পারি। ইতি

দাদা

১৬২

৫ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

লক্ষ্ণৌ থেকে যখন যাত্রা করলুম কলকাতায় আসাই তখন সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু শরীরটা আপত্তি জানালো। এবারে আমার ভ্রমণের গোড়া থেকেই শরীর বিগড়ে ছিল। ঘোরাঘুরিতে ক্রমেই সেটা বেড়ে চল্‌ল। তাই অবশেষে শান্তিনিকেতনে

আমার কুলায়ের কোণে এসে আশ্রয় নিতে হোলো। এখানে আমাদের বসন্ত উৎসবের জন্যে ছেলে মেয়েরা প্রস্তুত হচ্চে। নৃত্যগীতবাদ্যের আয়োজনে আমার সহায়তার দাবী করে তারা, আমি তো ওদেরই পোয়েট্ লরিয়েট্। এই পালাটা শেষ হলে পর একবার কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় যাব। সেই সময়ে রথী বৌমা বিলেতে যাত্রা করবেন। ওঁরা গেলে আমার এখানকার বাড়ি অত্যন্ত শূন্য হয়ে পড়ে। মন টেঁকে না।

নানা স্থানে ঘুরে এলুম। লাহোরে এই আমার প্রথম আবির্ভাব। আমাকে নিয়ে খুব ধুমধাম করেছে। তার সমারোহ অংশটা ক্লান্তিকর। আমার ঐ জিনিষটাতে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। কিন্তু এখানকার মানুষ অত্যন্ত সরল, তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা খুব অকৃত্রিম, সেটা অজস্র পেয়েছি। ইতি ৫।৩।৩৫

দাদা

১৬৩

৭ মার্চ ১৯৩৫

কল্যাণীয়াসু

তোমার ফল উপহার পেয়েছি। ভোগ আরম্ভ হয়েছে। আমার শরীরের জন্যে ভেবো না। আমার দেহে রোগের আঘাত প্রতিঘাত অনেক হয়েছে— কিছুতে আমাকে একান্ত পরাভূত করে না। এই কারণেই আমার সম্বন্ধে কেউ দয়া করতে পারে না। শয্যাগত হলেও অনতিকালের মধ্যেই এমনি খাড়া হয়ে এবং পূরো অধ্যবসায়ে কাজ করতে বসি যে কেউ অনুভব

করে না যে আমার শুশ্রূষা বা আমার বিশ্রামের দরকার আছে। তাদের দোষ দেব কেন? তাদেরই দরকারের অন্ত নেই, শেষ পর্য্যন্ত যত দিন পারি তাদের সে দরকার মিটিয়ে যাব। আমি কৃতজ্ঞতার দাবী করা ছেড়ে দিয়েছি কেননা জানি আশার অন্ত নেই, পূরণ করার শক্তি সীমাবদ্ধ। আমার উপরে লোকে এই জন্যেই রাগ করে— কিছু দিই বলেই মনে করে আরো দিতে পারতুম, যারা কিছুই দেয় না তারা নিরাপদ। বঙ্কিমের সময় তাঁদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে আলাপ করতে সাহস করত না। তাই তাঁদের সম্মানে কেউ আঘাত করে নি। তাই বলে নালিশ করব না। বিধাতার কাছে প্রচুর বর পেয়েছি কোনো দানে কিছু অভাব পড়লেই দুঃখ করা অকৃতজ্ঞতা। তোমাদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা যে সমবেদনা পেয়েছি সে কি কম কথা? এ তো অপ্রত্যাশিত।— এখানকার উৎসব সমাধা হলেই যাব কলকাতায়। তখন দেখা হবে। ইতি ৭।৩।৩৫

দাদা

১৬৪

১৬ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলুম। এখনো আছি। এবারে দোলপূর্ণিমার আগেই ইদের একটা ছুটি পড়েচে। তার সঙ্গে শনি রবি যোগ দিয়ে সেটা তিন দিনে স্ফীত হয়ে উঠেছে। তাই

কলকাতা থেকে আগন্তুকরা এই ছুটিতেই ভিড় করে আসচে। কাল সন্ধে থেকে তাদের আবির্ভাব সুরু হয়েছে। আজ রাত্রে তাদের চিত্তবিনোদনার্থে চণ্ডালিকা অভিনয় হবে। নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী চণ্ডালিকার ভূমিকা নেবে। সে চমৎকার অভিনয় করতে পারে। বোধ হচ্চে খুব ভালো হবে।

ঋতুরাজের অভ্যর্থনার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর একবার কলকাতা অভিমুখে যাব। তোমার জন্যে সুরুলের তাঁতের পাঁচ জোড়া সাড়ি আনিয়ে রেখেছি। ভেবেছিলুম হাতে করে নিয়ে তোমাকে দেব— কিন্তু কী জানি কোনো কারণে যদি দেরি হয়। আজ কালের মধ্যে কেউ এখান থেকে কলকাতায় যদি যায় তবে তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব— সেখান থেকে আমাদের দরোয়ান তোমার দ্বারে পৌঁছিয়ে দেবে। সাড়ি কয় জোড়ার দাম সম্বন্ধে তোমার মনে বিতর্ক উঠতে পারে। আগে থাকতে জানিয়ে রাখা ভালো— হাজার পাঁচেকের কম তো হবেই না। কারণ, আমি স্বয়ং তোমাকে দিচ্চি তার মূল্য তো বাজার দরের সঙ্গে মিলবে না। এই দানের মূল্যকে বাদ দেবার চেষ্টা কোরো না। তোমাকে দেবার এই উপলক্ষ্যটা আমার কাছেও অভিলষিত এই কথা মনে রেখো। আমার পরিতাপ এই যে অত্যন্ত শস্তায় পুণ্যলাভের চেষ্টা করচি— কিন্তু দানের মূল্য আর্থিক দামে নয়— এটা পেয়ে যদি খুসি হও তবে ব্রাহ্মণকন্যার সেই খুসিতেই আমার পুণ্যের পরিমাপ। আজ আর সময় নেই। ইতি ১৬।৩।৩৫

দাদা

১৬৫

২১ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার কন্যা তোমারি সম্মানের দিকে তাকিয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করেচে, আমার মানরক্ষার কথা ভাবে নি। একটু বুঝিয়ে বলি, চিঠিটা তাকে শুনিয়ো।— তুমি আমার কাছ থেকে কিছু চেয়েছিলে, এতে আমি খুসি হয়েছি। প্রমাণ হয়েছে তুমি আমাকে আপন করে অনুভব করেছো, তোমার মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি, তাই সে সঙ্কোচ বোধ করলে। তোমাকে কিছু দেবার সুযোগ পেলুম এ'তে আমার আনন্দ। খুকু তর্ক করতে পারত সে সুযোগ আমি নিজেই অযাচিতভাবে নিলুম না কেন। উত্তর এই, যদি তেমন করে দিতে হোতো তাহলে দামী জিনিষ না দিলে মান রক্ষা হোতো না। তাতে দেওয়ার আনন্দ ছাপিয়ে উঠত দেওয়ার কৃচ্ছ্রসাধন। কারণ সময় এখন এত খারাপ যে ধনীরাও আপন দারিদ্র্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্চে না। তুমি বিশেষভাবে সামান্য কিছু দাবী করেচ, তাতে দেওয়ার আনন্দ পেয়েছি, দেওয়ার দুঃখ কিছুই গায়ে বাজে নি, আর খুসি হয়েছি সঙ্কোচ করো নি বলেই। সঙ্কোচ করো নি বল্‌লে অত্যুক্তি হয়, তুমি বলেছিলে সুরুল থেকে পাঠিয়ে দিলে দাম দেবে। ঐটুকুর মধ্যে যে ছলনা ছিল বোধ হয় তারি জন্যে তোমার মেয়ের কাছে কথা শুন্‌তে হোলো। কেন স্পষ্ট করে বলতে পারলে না যে আমি যদি তোমাকে আমাদের এখানকার তৈরি জিনিষ তোমাকে

দিই তাহলে আমি দিচ্চি বলেই তুমি খুসি হবে, দামী জিনিষ গায়ে পড়ে দিচ্চি ব'লে না। খুকু যখন বিয়ে করে গিন্নিপনার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করবে তখন যদি যেচে কোনোদিন আমাকে লেখে, মামা, তোমার বই আমাকে দিতে হবে, তাহলে আমি কখনোই মনে করব না, নতুন গিন্নি খরচ বাঁচাবার জন্যে এই কৌশল করেচে। আবদার করতে যদি সে সঙ্কোচ করে তাহলে আমার মামাপদ তখনি রিজাইন্ করব। তাকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখচি সে নিজে না চাইলে তাকে একখানা বইও আমি দেব না। চাইতে যদি পারে সে, তাহলেই জানব পাবার অধিকার তার হয়েছে— স্বাতন্ত্র্যের গৌরবই যদি বড়ো হয় তাহলে কিনুক আমার বই। আর যাই করো পাঁচ জোড়া সাড়ির থেকে আধখানাও তুমি তোমার গরবিণী মেয়েকে দিতে পারবে না। সুরুলের সাড়ি পরতে আপত্তি যদি না থাকে তাহলে মামার কাছে চাইতে হবে মিষ্টি গলায়— এমন কি যদি আমি সহ্য না দিই তাহলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে। আমি হয় তো বলব আমার জমিদারী নিলেম হতে বসেছে, কিন্তু সে যেন ফস করে বিশ্বাস করে না বসে। এমন কি আমার দারিদ্র্যকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে উলটে আমারি জন্যে এক ডজন খদ্দরের পাঞ্জাবী ফরমাস যেন না দেয়। এই রইল কথা।

কাল সকালের গাড়িতে কলকাতায় যাব। রথীরা বিলেত যাবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই থাকব। তিন চার দিনের মধ্যেই আবার ফিরতে হবে কাজ আছে। কাল আমার কোনো আত্মীয় সাড়ির গাঁঠ্রি ৯।১।A কালু ঘোষের লেনে

পৌঁছিয়ে দেবে, উদ্ধার করে নিয়ো। হয় তো এই চিঠিখানিও উক্ত গাঁঠরির সঙ্গে তারি হাতে দিতে পারি। ইতি ২১।৩।৩৫

দাদা

১৬৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

খুব ব্যস্ততার মধ্যে তোমার চিঠি পেলুম। রথী বৌমা আজ সন্ধ্যার ট্রেনে য়ুরোপ অভিমুখে যাত্রা করবেন। চলে গেলে পর আর এই শূন্য বাড়িতে থাকব না— যাব বরানগরে। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মেয়াদ।

দাদা

১৬৭

২৪ মার্চ, ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

খুব খুসি হলুম।

আমার সকল মনের আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৪।৩।৩৫

দাদা

১৬৮

১ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ব্যস্ত আছি এখানে এসে অবধি। প্রুফ দেখতে হচ্চে, লিখ্‌তে হচ্চে, লেখা সংশোধন করতে হচ্চে, দর্শনার্থীদের ভিড় হচ্চে, সময়ের বাকি দুই একটা টুক্‌রো অংশ বিশ্রামের কাজে লাগাচ্চি।

ক দিন থেকে মেঘের দল হাওয়ায় সওয়ার হয়ে দিগন্তে দিগন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ধূলো উড়িয়ে হৈ হৈ করাই ছিল তাদের কাজ। এরা কন্‌গ্রেসের দলের মতো, এদের কাছ থেকে সার্থকতার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। এমন সময় কাল সন্ধ্যার দিকে ওরা মন স্থির করলে, হাওয়া বইল বেগে, ধড়াধ্বড় পড়তে লাগল দরজা, ওদের লম্বা ফর্দ্দ মাফিক বৃষ্টি এলো না, ধূলোর বৈরাগ্য শান্ত করবার মতো কিছু বর্ষণও হোলো। বহিরাকাশের নিমন্ত্রণে বাধা পড়ল বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়লুম। অনতি-কাল পরেই দেখলুম দুই একবার পা দুটো কেঁপে উঠল। ভূমিকম্প বলেই অনুমান করচি, কিম্বা বাতাসের বেগে খাট বিচলিত হয়েছিল তাও হতে পারে। আকাশে এখনো কিছু কিছু মেঘের ষড়যন্ত্রের অবশেষ আছে, হয়তো সন্ধ্যার অন্ধকারে আর একবার তাদের পরাক্রম দেখা দেবে।

হৈমন্তীকে তোমার চিঠি দেব। কিন্তু রাণী কিছুকাল হোলো সভর্ত্তৃক অন্তর্ধান করেছে। ওরা আমার সমস্ত কাজের মাঝখানেই

হঠাৎ দৌড় দিয়েছে মাদ্রাজে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে বয়েস অল্প— সব দায়কে হাল্‌কা করেই দেখে। কিন্তু আমার বয়স অল্প নয়, দায় বিস্তর, মোচন করবার শক্তি ক্ষীণ, বাহনদের পরেই নির্ভর— বিনা কারণে তাদের ডানা যদি চঞ্চল হয়ে ওঠে, অদৃশ্য হয় মেঘের মধ্যে, আমার বোঝা নামাবার উপায় দেখি নে। দুঃখ করব না, নালিশ করব না, সব বোঝা যিনি নামিয়ে নেবেন তাঁর রথের শব্দ অদূরে শোনা যায়।

আর যাই হোক্ ক্লান্তি ছাড়া আমার দেহে আর কোনো বালাই নেই— অতএব চিন্তা কোরো না। নানা দেশের নানা ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করেচে, তারা বলে আমার দেহের কোনো যন্ত্রই শিথিল হয় নি, কেবল হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশী অযথা পরিশ্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। ইতি ১৮ চৈত্র ১৩৪১

দাদা

১৬৯

১৪ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজ নববর্ষের দিনে তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আজ উৎসবের ব্যাপারে এবং অতিথিকৃত্য নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। এখন কিছু দিন এই রকম চলবে। কারণ এই ছুটির সময় সুযোগ পেয়ে চারদিক থেকে এখানে লোকের আমদানি হয়। তাছাড়া অন্য কাজ আছে।

রাণীকে ও হৈমন্তীকে তোমার চিঠি দিয়েছি। তাদের কাছ থেকে আমার সংবাদ জানতে পারবে। সংবাদ বিশেষ কিছুই নেই। আজ সায়াহ্নে শুক্লনবমীর জ্যোৎস্নায় নৃত্যগীত হবে। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

দাদা

১৭০

২৬-২৭ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দিনের বেলায় লিখি। লেখায় শ্রান্তি এলে অপরাহ্নে কখনো ছবি আঁকতে বসি। দিন ফুরিয়ে গেলে বাইরে গিয়ে বসি সেই সময়টাতে দর্শনার্থীর সমাগম হয়। সন্ধ্যা হয়ে আসে যখন, তখন কোনো কোনো দিন এখানকার ছেলেমেয়েরা ধরে তাদের কিছু একটা পড়ে শোনাতে, কবিতা, বা নাটক, বা গল্প। গল্পগুচ্ছ থেকে সুপরিচিত পুরোনো গল্প শোনবার জন্যেও ওদের আগ্রহ আছে। পর্শু শুনিয়েছি রাজটীকা, কাল শুনিয়েছি ক্ষুধিত পাষাণ। আজ ছিল ছুটি। সমস্ত দিন চলে তপ্ত হাওয়া, উড়তে থাকে ধুলো, সন্ধ্যার দিকে হাওয়ার বেগ বাড়ে, তাপ কমে, রাত্রে পড়ে ঠাণ্ডা।

এই দুরন্ত হাওয়ায় যখন চুল উড়ে পড়চে চোখে, টেবিলের উপর কাগজ পত্র সামলানো শক্ত হচ্চে এমন সময়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসলুম। এ মুল্লুকে খবর বলে কোনো বালাই নেই— এ তো কলকাতা সহর নয়— দিনগুলো জপমালার গুটির মতো,

একটার সঙ্গে অন্যটার বেশি কিছু তফাৎ নেই। আমার তরফে যা কিছু সংবাদ সে ঘটনার নয়, সে রচনার। একটা কবিতার বই ছাপা চলচে— দিনে দিনে সেটাকে ভরে তুলচি।

কাল সন্ধ্যার পরে লোক এল, চিঠি রইল বন্ধ।

আজ সকালে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। বৌমার পাঁচিল-দেওয়া বাগানটার কোণে বসে প্রথম-প্রাতরাশটা সেবন করচি। কাঁচা রোদ পড়েছে পাঁচিলের গায়ে লতানে আমগাছের পরে। একজন অধ্যাপক প্রণাম করতে এলেন আজ তাঁর জন্মদিন। কিছু তাঁকে মিষ্টান্ন খাইয়ে দিলুম। আরো ছুটি একটি বন্ধু দেখা দিলেন। বেলা বেড়ে চল্‌ল। এলেম ঘরের মধ্যে। এলো এক ঝুড়ি ডাকের চিঠি— বিলেতের ডাক। কিছু পড়তে হোলো, কিছু দিলেম রেখে, হয় তো শেষ পর্য্যন্ত পড়তে ভুলেই যাব।

প্রুফ এলো গোটা কতক। সেগুলোও সেরেছি। তোমার অসমাপ্ত চিঠিখানা ডেস্কের উপর চীৎ হয়ে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আবার সুরু করে দিলুম। কিন্তু তাগিদ এলো স্নানে যাবার। এমন দিন ছিল যখন স্নানাহারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিয়ম মানি নি। আজকাল আমার পরিজনবর্গ উৎপাত করে, বলে, তখনকার কালের অনিয়ম এখনকার কালে সইবে না, অর্থাৎ আমাকে বৃদ্ধ বলে খোঁটা দেয়— শুনে আমার রাগ হয়, ইচ্ছে করে প্রতিবাদ করি, প্রমাণ করি আমি তাদের চেয়েও বয়সে কাঁচা। অবশেষে বারবার তাগিদে স্নান করতে যেতেও হয়। অতএব ইতি ১৪ বৈশাখ ১৩৪২

দাদা

১৭১

৬ মে ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বয়স যখন অল্প ছিল জন্মদিনের প্রভাতে ঘুম থেকে উঠতেই নানা লোকের কাছ থেকে নানা উপহার এসে পৌঁছত। তুমি যেমন করে বাজার ঘুরেছ তেমনি করেই তারা, যারা আমার জন্মোৎসবে খুসি হোত এবং আমাকে খুসি করতে চাইত, দোকানে দোকানে এমন কিছুর সন্ধান করত যা দেখে আমার চমক লাগতে পারে। অপ্রত্যাশিত বই ছবি কাপড় শিল্পদ্রব্য, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ফল ফুলের ঝুড়ি। তখন জীবনে প্রভাতের আকাশ ছিল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ, মন ছিল সুকুমার সরস, সব কিছুতেই ছিল তার ঔৎসুক্য, স্নেহের ছোঁওয়া লাগ্‌লেই বেজে উঠত মনোযন্ত্রের তার— তখন জন্মদিনগুলি সমস্ত দিনই গুঞ্জরিত হয়ে থাকত, তার রেশ যেন থামতে চাইত না। তার একটা কারণ, তখনকার পৃথিবী প্রায় ছিল আমার সমবয়সী, পরস্পর এক সমতলে বইত হৃদয়ের আদানপ্রদানের প্রবাহ। জন্মের অধিকাংশই ছিল সামনের দিকে অনুদ্‌ঘাটিত, মন তখন মৌমাছির মতো হাওয়ায় ঘুরে বেড়াত সম্ভাব্যতার প্রত্যাশায়, অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে। এখনকার জন্মদিন তো কাঁচা নয়, কচি নয়, মন তার সকল প্রত্যাশার শেষে এসে পৌঁচেছে। অজানা পথে চল্‌তে চলতে ভাগ্যের হাতে হঠাৎ অভাবনীয় দান পেয়ে অধীর হয়ে উঠব এই ছিল তখনকার আকাশবাণীতে, তখনকার জন্মদিনের

অভাবিতপূর্ব্ব উপহারগুলিও এই বাণী বহন করত। তখনকার সেই জন্মদিনের ধারা এখন আর নেই। কিছু উৎসর্গ যে আসে না তা নয়— কিন্তু সে আসে দূরের দান গায়ের কাছে, কণ্ঠে আসে না হাতে আসে না— উপহার আসে না অঞ্জলি থেকে অঞ্জলিতে। দেবতারা কি খুসি হন তাঁদের পূজায়, মর্ত্ত্য যখন স্বর্গের দ্বারের প্রান্তে উদ্দেশে রেখে আসে তার নৈবেদ্য। সেই আমার অল্প বয়সের পঁচিশে বৈশাখের স্নিগ্ধ ভোরবেলাটা মনে পড়চে— শোবার ঘরে নিঃশব্দচরণে ফুল রেখে গিয়েছিল কারা, প্রত্যুষের শেষ ঘুম ভরে গিয়েছিল তারি গন্ধে— তার পরে হেসেছি ভালোবাসার এই সমস্ত সুমধুর কৌশলে, তারাও হেসেছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। সার্থক হয়েছে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ।

আজ সকালে বসে বসে ছবি আঁকছিলেম— বেলা তখন নটা। এমন সময় তোমার উপহারগুলি এসে পৌঁছল। খুসি হয়েই হাসলুম। চিঠিতে সেটা পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। তোমার গরদের জোড় পরব আমার জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে। তোমার পাথরের থালায় বোধ হয় এরা চন্দনের বাটি রাখবে। দুটি যে সুন্দর গড়নের বাটি দিয়েচ তার একটা লাগবে আমার ছবি আঁকার কাজে, আর একটা প্রাত্যহিক জলযোগের উপকরণ-রূপে। তোমার রাখীও সেদিন পরব।

অপরাহ্ণ এখন রৌদ্রতাপে ক্লান্ত, মাঝে মাঝে একটা কোকিল ডাকচে বোধ হয় য়ুকলিপ্‌টস্‌ গাছের ডালে বসে— এতে করে কোকিলের আধুনিকতার প্রমাণ হয়, উচিত ছিল ওর বকুলের

ডালে আশ্রয়গ্রহণ। কিন্তু ওর দোষ নেই— সে গাছটা কাছা-কাছি নেই। পূর্ব্ব আকাশে মেঘের প্রলেপ লেগেছে— কিন্তু বর্ষণের আশা বারবার প্রতিহত হয়ে চলে যাচ্চে। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৪২

দাদা

১৭২

১৫ মে ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল তুমি আসতে পেরেছিলে খুসি হয়েছি। আগামী শনিবারে এখানকার কাজ সেরে আমাকে যেতে হবে বোলপুরে। এইবার আমার সেই মাটির ঘরে প্রবেশ করব— আর একটা নূতন পর্ব্ব আরম্ভ করতে হবে— পুরাতনের যত কিছু উদ্‌বৃত্ত বোঝা হয়ে সামনেকার অবকাশকে আচ্ছন্ন করে আছে তাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়ে দিয়ে যাত্রাপথকে অবারিত করে দেব এই মনে করে আছি। তোমাদের কাছ থেকে অযাচিত অর্ঘ্য পেয়েছি— তোমরা আমার জীবনের অনেক অসম্মান দূর করে দিয়েছ— আমার জীবনের কাজকে হাটের পণ্যের মতো বিচার করে দর কষাকষি করো নি— তাকে আমার দান বলে আনন্দিত মনে গ্রহণ করেছ— তোমাদের সেই আনন্দই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ইতি ১৫ মে ১৯৩৫

দাদা

অভাবিতপূর্ব্ব উপহারগুলিও এই বাণী বহন করত। তখনকার সেই জন্মদিনের ধারা এখন আর নেই। কিছু উৎসর্গ যে আসে না তা নয়— কিন্তু সে আসে দূরের দান পায়ের কাছে, কণ্ঠে আসে না হাতে আসে না— উপহার আসে না অঞ্জলি থেকে অঞ্জলিতে। দেবতারা কি খুসি হন তাঁদের পূজায়, মর্ত্ত্য যখন স্বর্গের দ্বারের প্রান্তে উদ্দেশে রেখে আসে তার নৈবেদ্য। সেই আমার অল্প বয়সের পঁচিশে বৈশাখের স্নিগ্ধ ভোরবেলাটা মনে পড়চে— শোবার ঘরে নিঃশব্দচরণে ফুল রেখে গিয়েছিল কারা, প্রত্যুষের শেষ ঘুম ভরে গিয়েছিল তারি গন্ধে— তার পরে হেসেছি ভালোবাসার এই সমস্ত সুমধুর কৌশলে, তারাও হেসেছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। সার্থক হয়েছে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ।

আজ সকালে বসে বসে ছবি আঁকছিলেম— বেলা তখন নটা। এমন সময় তোমার উপহারগুলি এসে পৌঁছল। খুসি হয়েই হাসলুম। চিঠিতে সেটা পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। তোমার গরদের জোড় পরব আমার জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে। তোমার পাথরের থালায় বোধ হয় এরা চন্দনের বাটি রাখবে। দুটি যে সুন্দর গড়নের বাটি দিয়েচ তার একটা লাগবে আমার ছবি আঁকার কাজে, আর একটা প্রাত্যহিক জলযোগের উপকরণ-রূপে। তোমার রাখীও সেদিন পরব।

অপরাহ্ণ এখন রৌদ্রতাপে ক্লান্ত, মাঝে মাঝে একটা কোকিল ডাকচে বোধ হয় য়ুকলিপ্‌টস্‌ গাছের ডালে বসে— এতে করে কোকিলের আধুনিকতার প্রমাণ হয়, উচিত ছিল ওর বকুলের

ডালে আশ্রয়গ্রহণ। কিন্তু ওর দোষ নেই— সে গাছটা কাছা-
কাছি নেই। পূর্ব্ব আকাশে মেঘের প্রলেপ লেগেছে— কিন্তু
বর্ষণের আশা বারবার প্রতিহত হয়ে চলে যাচ্চে। ইতি ২৩
বৈশাখ ১৩৪২

দাদা

১৭২

১৫ মে ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল তুমি আসতে পেরেছিলে খুসি হয়েছি। আগামী
শনিবারে এখানকার কাজ সেরে আমাকে যেতে হবে বোলপুরে।
এইবার আমার সেই মাটির ঘরে প্রবেশ করব— আর একটা
নূতন পর্ব্ব আরম্ভ করতে হবে— পুরাতনের যত কিছু উদ্‌বৃত্ত
বোঝা হয়ে সামনেকার অবকাশকে আচ্ছন্ন করে আছে তাকে
ক্রমে ক্রমে সরিয়ে দিয়ে যাত্রাপথকে অবারিত করে দেব এই
মনে করে আছি। তোমাদের কাছ থেকে অযাচিত অর্ঘ্য
পেয়েছি— তোমরা আমার জীবনের অনেক অসম্মান দূর করে
দিয়েছ— আমার জীবনের কাজকে হাটের পণ্যের মতো বিচার
করে দর কষাকষি করো নি— তাকে আমার দান বলে আনন্দিত
মনে গ্রহণ করেছ— তোমাদের সেই আনন্দই আমার শ্রেষ্ঠ
পুরস্কার। ইতি ১৫ মে ১৯৩৫

দাদা

১৭৩

২৪ মে ১৯৩৫

ওঁ চন্দননগর

কল্যাণীয়াসু

আমাদের পদ্মা বোটে আশ্রয় নিয়েছি। এই বোটেই যৌবনকালে লিখেছি সোনার তরীর কবিতা— কতকাল বাস করেছি পদ্মার চরে সম্পূর্ণ একলা। এমন হয়েছে মাসের পর মাস একটি শব্দও উচ্চারণ করি নি, নিঃশব্দ বাক্য বিস্তার করেছি লেখায়। ছোট গল্পের অধিকাংশই এই বোটে লেখা। তারও আগেকার দিনে যখন আমার বয়স ছিল আঠারো, এই চন্দননগরে গঙ্গার ধারে দীর্ঘকাল কেটেছে। ঐ সামনে দেখা যাচ্চে দোতলা বাড়ি, ঐখানে ছিলেম জ্যোতিদাদার সঙ্গে। মনে পড়চে কোন্ এক বাদলের দিনে ঘন মেঘে ছায়াচ্ছন্ন নদী, নিবিড় বৃষ্টিধারায় দিগন্ত অবগুণ্ঠিত, দীর্ঘ অপরাহ্নের কর্ম্মহীন প্রহরে অকারণ বেদনায় মন বিরহাতুর, তখন একলা বসে বিদ্যাপতির গানটিকে সুরে বসিয়েছি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

জানি নে আমার দেওয়া সুরে এ গান কখনো শুনেছ কিনা। অনেকেই জানে। আমার নিজের বিশ্বাস সুরটা ভালো হয়েছে। আজ ঐ বাড়িটা অনাদরে জীর্ণ হয়ে পড়েছে নইলে ঐখানেই থাকতুম।

আমার মনে হয় তুমি যদি গৌরীপুরে গিয়ে থাক তোমার

দেহ মন সুস্থ থাকবে। তোমার সেই বাল্যকালের কুলায়ে তোমার মন আপন অভ্যস্ত আশ্রয় সহজে পাবে। পরিচিত গাছপালাগুলির আত্মীয়তা চারদিককে স্নিগ্ধ করে রাখে, তাদের নিরন্তর শুশ্রূষায় তুমি আরাম পাবে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সেখানে বই পড়ে সময় কাটাবার উপায় যথেষ্ট আছে— দায়িত্বভারবিহীন বিশ্রামকাল পড়াশুনার প্রবাহে ভরে উঠবে। যদি সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় এবং মন দিতে পারো তাহলে ইংরেজি শেখবার চেষ্টা কোরো। ব্যাকরণের দুর্গমতা পরিহার করে কোনো একটা হাল্‌কা বই নিয়ে যদি দ্রুত বেগে পড়ে যাও তাহলে ক্রমশই এই ভাষাটা মনে বসে যাবে। আমার ইংরেজি ও সংস্কৃত বিদ্যা এই প্রণালীতেই। তুমি দেশ বিদেশের কথা শুনতে ভালোবাসো— ইংরেজিতে ছবিওয়ালা জিওগ্র্যাফিক্যাল রীডার আছে, চেষ্টা দেখ্‌তে পারো। এমনি করে হাৎড়ে হাৎড়ে দশখানা বই যদি শেষ করতে পারো দেখবে ভাষাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অত্যন্ত তন্ন তন্ন করে পড়বার দরকার নেই— কোনোমতে মানে বুঝে হুহু করে পড়ে যেয়ো। এমনি করে যত বেশি সংখ্যার বই পড়বে ততই আপনি পথ সুগম হয়ে উঠবে।

গ্রামবাসীদের জন্যে তুমি কী করতে পারো জিজ্ঞাসা করেছ। এ কাজের অভিজ্ঞতা তোমার নেই এবং আমার বিশ্বাস তোমার মনোবৃত্তিও এ কাজের অনুকূল নয়। তোমার স্নায়ুর দুর্ব্বলতায় তোমার মনকে ক্লান্ত ও বিক্ষিপ্ত করে দেবে। তখন অক্ষমতার ধিক্কারে তোমার মন পীড়িত হবে। যদি তুমি এমন কোনো

সঙ্গী পাও যিনি মাঝে মাঝে একটু একটু ব্যাখ্যা করে দ্রুতবেগে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি পড়ে যেতে পারেন তাহলে তুমি ফল পাবে। ইংলণ্ডে যে ডাক্তারের বাড়িতে ছিলুম, সেখানে রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত দুঘণ্টা বই পড়ে যেতুম, সমস্তটাই যে সম্পূর্ণ বুঝতুম তা নয় কিন্তু কেবলমাত্র আবৃত্তির বেগে ভাষাটা দিনে দিনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

অনেকদিন পরে জনতা ও কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পড়াশুনো করতে আরম্ভ করেছি। অনেকদিন এমন বিশ্রাম পাই নি। বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছিলুম কিন্তু ইস্কুল আমার স্বভাবের মধ্যেই ছিল। মাস্টার মশায়কে ফাঁকি দিয়েছি কিন্তু কোনোদিন পড়া ফাঁকি দিই নি— রাত জেগে পড়েছি যে সব বই ভালো করে বোঝবার শক্তি ছিল না তাও পড়তে ছাড়ি নি। সম্প্রতি আমার সেই পড়ার ধারা নানাবিধ বিঘ্নে অবরুদ্ধ হয়েছে— পড়বার সেই অভ্যাসটাও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে — নানা চিন্তা এসে মনোযোগকে পরাভূত করে দেয়— তা ছাড়া শারীরিক দুর্ব্বলতাও মনকে অভিভূত করে। এখানে এসে চারদিকে নানাবিধ বই জড়ো করেছি— যখন যেটা খুসি টেনে নিয়ে পড়তে বসি— লিখতে এখন আর মন যায় না।

জুন মাসের শেষকাল পর্য্যন্ত এখানে থাকব স্থির করেছি। ইতি ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

দাদা

কল্যাণীয়াসু

তোমার পক্ষে কত গভীর আমার স্নেহ
এবং করুণা তা তুমি হয়তো উপলব্ধি করতে পারবে না।
আমার চিন্তা এবং বোধের দিক থেকে সত্যকে তোমার সামনে ধরবার
রাখি সেই জন্যেই আমি এত চেষ্টা করেছি। তোমাকে
তাতে দুঃখ দেওয়া হয়েছে। যে সংস্কার তোমাকে আশ্রয়
দিয়েছিল তাতে হয়তো তুমি আরাম পেতে — তোমার নারী-
স্বভাব তার মধ্যে আপন সেবাপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পেরেছিল,
আমাদের প্রকৃতি বুদ্ধিপ্রবীণ, বুদ্ধির দ্বারা সত্যকে আপনার
চিত্তের সঙ্গে মেলাতে পারলে সে আরাম পায় — আমার বোধ হয়
উচিত ছিল সে পথ তোমাকে যদি নাও আরাম দিত তাতে
ক্ষতি নেই। কিন্তু এ কথা মনে রেখো তোমাকে স্নেহ করেছি
শ্রদ্ধা করেছি বলেই আমি এত কথা বলেছিলুম তোমাকে।
তোমার রুচি ও বেদনা দেখে সে সব আলোচনা আমি একদিন
ছেড়ে দিয়েছি — ইচ্ছা করেছি যেমন করে হোক তুমি শান্তি
পাও। যে বিশ্বাস মানুষের ক্ষতি ঘটায়, পরস্পরের ভেদ
আনে, সমাজের মধ্যে দুঃখকে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়

তুমি ভাল সাবধানে হয়ে থাকো এটা আমি স্নেহে মনে
করি কি — তোমার সম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকতে পারিনি
বলেই এই সব আলোচনা দ্বারা তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। সে
সম্বন্ধে আমি লজ্জিত হয়েছি কিন্তু এ তুমি মনে জেনো
তুমি আমার স্নেহ পেয়েছ — যখন তুমি দুঃখ পাও
তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে আমি খুসি হতুম।
আমার মধ্যে একটা সকলের থেকে দূরত্ব আছে — সুদূরতা সবাই
অনুভব করেন — কিন্তু সেটার কারণ উদাসীনতা নয়;
দূরে নির্লিপ্ত অবকাশের মধ্যেই আমার কবিপ্রকৃতি স্বাভা-
সেই অবকাশের মধ্যে থেকেই আমার ভালোবাসা
আপনাকে অব্যাহতভাবে প্রকাশ করে; মানুষের সম্বন্ধকে
সঙ্কীর্ণ অধিকারে পীড়িত করলে সেই ভালোবাসা কুণ্ঠিত হয়।
বৌমা ভাল আছে কিন্তু আমি তাঁদের একটা গাড়িতে
উঠেছি — এই জায়গাটা খোলা, বেশ ভালো লাগছে —
জলস্থল আকাশের সঙ্গীত আমার মনের মধ্যে পড়েছে!
ইতি ৭ জুন ১৯৩৫ দাদা

১৭৪

[চন্দননগর] ৭ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পরে কত গভীর আমার স্নেহ এবং করুণা তা তুমি হয়তো উপলব্ধি করতে পার না। আমার চিন্তা এবং বোধের দিক থেকে সত্যকে তোমার সামনে আনবার জন্যে সেইজন্যেই আমি এত চেষ্টা করেছি। তোমাকে তাতে দুঃখ দেওয়া হয়েছে। যে সংস্কার তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাতে হয় তো তুমি আরাম পেয়েচ— তোমার নারীস্বভাব তার মধ্যে আপন সেবা-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পেরেছিল। আমাদের প্রকৃতি বুদ্ধি-প্রধান, ধ্যানের দ্বারা সত্যকে আপনার চিত্তের সঙ্গে মেলাতে পারলে সে আনন্দ পায়— আমার বোঝা উচিত ছিল সে পথে তোমাকে যদি নাও আনতে পারি তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু এ কথা মনে রেখো তোমাকে স্নেহ করেছি শ্রদ্ধা করেছি বলেই আমি এত কথা বলেছিলুম তোমাকে। তোমার দ্বিধা ও বেদনা দেখে সে সব আলোচনা আমি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি— ইচ্ছা করেছি যেমন করে হোক তুমি শান্তি পাও। যে বিশ্বাসে মানুষের ক্ষতি ঘটায়, পরস্পরে ভেদ আনে, সমাজের মধ্যে মূঢ়তাকে অন্ধতাকে প্রশ্রয় দেয় তুমি তাতে আবদ্ধ হয়ে থাকো এটা আমি শ্রেয় মনে করি নি— তোমার সম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকতে পারি নি বলেই এই সব আলোচনাদ্বারা তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। সে সমস্ত তর্কে আমি নিরস্ত হয়েছি কিন্তু এ তুমি মনে

জেনো তুমি আমার স্নেহ পেয়েছ— যখন তুমি দুঃখ পাও তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারলে আমি খুসি হতুম। আমার মধ্যে একটা সকলের থেকে দূরত্ব আছে বলে আত্মীয়স্বজনেরা অনেক সময়ে আক্ষেপ করেন— কিন্তু সেটার কারণ উপেক্ষা নয়, বৃহৎ নির্লিপ্ত অবকাশের মধ্যেই আমার বিধাতাদত্ত স্থান— সেই অবকাশের মধ্যে থেকেই আমার ভালোবাসা আপনাকে অব্যাহতভাবে প্রকাশ করে ; মানুষের সম্বন্ধকে সঙ্কীর্ণ অবরোধে পরিণত করলে সেই ভালোবাসার খর্ব্বতা ঘটে।—

বোট ঘাটে আছে কিন্তু আমি তীরের একটি বাড়িতে উঠেছি— এই জায়গাটি খোলা, বেশ ভালো লাগচে— জলস্থল-আকাশের সঙ্গমে আমার আসন পড়েছে। ইতি ৭ জুন ১৯৩৫

দাদা

১৭৫

[চন্দননগর] ১২ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার মনকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব এমন কথা তুমি কখনোই কল্পনা কোরো না। হৃদয়ের অকৃত্রিম অর্ঘ্য দুর্লভ দান, তাকে অবজ্ঞা করায় অপরাধ আছে। বিধাতা তাঁর অরণ্যে আমাদের সামনে ফুল দিয়েছেন ফল দিয়েছেন ধরে — তার সৌন্দর্য্য তার মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয়, যে সন্ন্যাসী আপন ঔদাসীন্যের অহঙ্কারে তাকে উপেক্ষা করে সে বিধাতার অযাচিত

দানকে নিন্দা করার দ্বারাই নিন্দনীয় হয়। মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তার চেয়ে বড়ো তার চেয়ে মূল্যবান, বিধাতা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বর আর কী দিয়েচেন? আমি একদিন লিখেছিলেম--

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়—

আজও আমি সেই কথাই বলি— বিধাতার দানকে গ্রহণ না করে মুক্তি নয়, তাকে সত্য করে গ্রহণ করাতেই মুক্তি— সৌন্দর্য্যকে অস্বীকার করায় মুক্তি নয়, সৌন্দর্য্যকে বরণ করে নেওয়াতেই মুক্তি। কতদিন আমি বাইরের দিকে যখন তাকিয়ে থাকি আমার মনের মধ্যে সুধার ঝরনা ঝরে পড়ে— আমার অহঙ্কারের বাধা সরিয়ে রাখি বলেই তারা অন্তরে প্রবেশ করে— তোমাদের কাছ থেকে যখন সেবা পাই শ্রদ্ধা পাই, তখন আমি একান্ত খুসি হই, সে খুসিতে অহঙ্কার মিশ্রিত হলে তার প্রশস্ত পথটা রুদ্ধ হোতো।

এখানে আমি জুন মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে যাব কলকাতায়— দুই একদিন থেকে বরানগরে যাব। কলকাতা বড় শুষ্ক কঠোর, বেশি দিন টিঁকতে পারি নে। যতদিন থাকতে বাধ্য হই বাইরে গাছপালার মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়। রথী বৌমা ১০ই জুলাইয়ে আসবে দেশে ফিরে— কদিন তাদের জন্যে অপেক্ষা করে তাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব। তুমি যখনি আসবে খুসি হব নিশ্চয় জেনো। তুমি আমাকে কোনো জিনিষ দেবার চেষ্টা কোরো না— তোমার অন্তঃকরণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আপন সম্পূর্ণ রূপেই আমাকে স্পর্শ করে, আর কিছুই আমার দরকার হয় না।

এখান থেকে চিঠিপত্র যথাসময়ে আসাযাওয়া করতে বোধ হয় বাধা পায়। আজ জোড়াসাঁকো থেকে একজন কর্ম্মচারী তোমার দেওয়া বাটি দুটি নিয়ে এসেছিল তার হাতে এই চিঠি পাঠাই। ইতি ১২ জুন ১৯৩৫

দাদা

১৭৬

[চন্দননগর] ১৯ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার দেওয়া সব জিনিষগুলিই পেয়েছি। পেয়ে যতই খুসি হই মনে মনে লজ্জা বোধ না করে থাকতে পারি নে। আমার জন্যে তুমি নিজেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করো এ কথা মনে করতে আমি দুঃখ পাই। অন্তর থেকে তুমি যা নিবেদন করো তা আমি অন্তরেই গ্রহণ করি। বস্তুত বাইরে থেকে আমার দাবী খুব ক্ষীণ। ছেলেবেলা থেকেই বাইরের দিকে নিঃসক্ত থাকা আমার স্বভাব। অনেক সময়ে আমার আত্মীয়েরা এতে দুঃখ পেয়েছেন। কেননা আমি জানি, যাদের কাছে আমি প্রিয়জন বলে গণ্য তারা আমাকে স্বভাবতই সেবার দ্বারা নির্ভর দিতে ইচ্ছা করে। আমি অধিকাংশ সময়ে এই অধিকার থেকে আমার নিকট আত্মীয়দেরও বঞ্চিত করেছি— এমন কি রোগের সময়েও আমি শুশ্রূষা যথাসম্ভব গ্রহণ করি নি, এখনো করি

নে। বাইরের দিকে আমার এই দূরত্ব অন্তরের দিকে কিছুমাত্র কৃপণ নয় এ কথা নিশ্চিত জেনো।

এখানে আমি জুন মাসের ৩০শে পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে দুই একদিনের জন্যে জোড়াসাঁকোয় কাটাব— যদি তার সুবিধে না হয় তাহলে বরানগরে ৪।৫ দিন থাকবার কথা। বরানগরে তোমার আসা যদি দুঃসাধ্য হয় তাহলে আমাকে জানালে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। ইতি
৪ আষাঢ় ১৩৪২

দাদা

১৭৭

[চন্দননগর] ২৩ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি যে ক'টি জিনিষ পাঠিয়েছ সবগুলিই আমার কাজে লাগবে। এইবার আমার নতুন কুটীরে উঠব— সেখানে নতুন উপকরণের দরকার— তোমার কাছ থেকে তার কিছু সাহায্য পেয়েছি। তুমি আমাকে যে মনে করে এগুলি দিয়েছ সে কথা স্মরণ করে খুব খুসি হয়েছি। তোমার এই ত্যাগের প্রবর্ত্তনার মূল্য আমার কাছে উপেক্ষিত হয় নি। অন্তরের দানকে মন বাইরে রূপ দিতে চায়, তার মাধুর্য্যে আনন্দিত হই, কেবল সঙ্কোচ হয় পাছে তুমি নিজেকে অতিমাত্র বঞ্চিত করো।

আমি এখানে আরো সপ্তাহখানেক থাকব। ১লা জুলাই যাব জোড়াসাঁকোয়— ২রাও থাকব সেখানে— তার পরে বরানগরে। ৫।৬ই তারিখে চলে যাব শান্তিনিকেতনে— এখনো নিশ্চিত স্থির করি নি। এখানকার জমিদাররা আমাকে ত্রিশে তারিখে নিমন্ত্রণ করেছে, নইলে আগেই বেরিয়ে পড়তুম।

গঙ্গার উপর আষাঢ়ের সমারোহ ভাল লাগচে— শান্তি-নিকেতনের প্রান্তরে তার মহিমা আরো অবারিত। ইতি ৮ই আষাঢ় ১৩৪২

দাদা

১৭৮

[চন্দননগর] ২৭ জুন ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এইমাত্র খবর এল জোড়াসাঁকো বাড়ির এক অংশ সৌম্যরা কিছুদিনের জন্য মাড়োয়াড়িদের ভাড়া দিয়েছে। তাদের বিয়ে চল্‌চে— সুতরাং যাদের বিয়ে নয় তাদের পক্ষে ওখানে দিন-যাপন আরামের হবে না। তাই ঠিক করেছি সোমবার অপরাহ্ণে যাব বরানগরে। বৃহস্পতিবার প্রাতে দৌড় দেব শান্তিনিকেতনে। বরানগর বোধ করি তোমার পক্ষে দুর্গম হবে। তবু যদি আসা সম্ভব হয় তবে খুসি হব।

আমাকে তুমি যত দুরন্ত করে কল্পনা করো সেটা সঙ্গত নয়। আমি স্বভাবত নির্জ্জনচর— কিন্তু তোমার মধ্যে আত্মোৎসর্গের

যে দাক্ষিণ্য আছে তাকে আমার কবিপ্রকৃতি কখনই উপেক্ষা করে না। আমি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেছি কিন্তু সেটাকে আমি অনুভব করি নে--- সেই কারণে তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক ব্যবধান নেই বলেই তোমাদের হৃদয়ের দান আমি হৃদয়ের সঙ্গেই সহজে গ্রহণ করতে পারি। ইতি ২৭ জুন ১৯৩৫

দাদা

১৭৯

১২ জুলাই ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

একখানি সাড়ি এবং চামড়ার পোর্টফোলিয়ো তোমাকে পাঠাচ্ছি, গ্রহণ কোরো। বিশ্বভারতী পাড়টা অন্য পাড় দিয়ে ঢেকে নিয়ো--- ওটা ব্যবহার্য্য নয়। ইতি ১২ জুলাই ১৯৩৫

দাদা

১৮০

[শান্তিনিকেতন] ১৭ জুলাই ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ক্ষিতিমোহনবাবু দাদু-চরিতের যে উপক্রমণিকা লিখেচেন সেটি আমার ভালো লেগেছে বলেই তোমাকে পড়তে পাঠিয়েছি। ভারতের মধ্যযুগে এই যে সব বড়ো বড়ো সাধকদের

আবির্ভাব হয়েছিল এঁরা সমাজ ও শাস্ত্রের প্রাচীর তোলা দুর্গের বাইরে বাস করতেন বলেই এঁদের প্রতিভার স্বচ্ছতায় আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ এমন বিশুদ্ধ ও সার্ব্বভৌমিক হয়েছিল। এই সকল ধর্ম্মসাধকদের প্রায় সকলেরই উৎপত্তি অন্ত্যজ জাতির থেকে। সমাজ তাঁদের বাইরে বসিয়ে রেখেছিল,— সেই অনাদর অবজ্ঞাতেই তাঁদের মুক্তির সহায়তা করেছিল। ঐ বই বাজারে বের হবার পূর্ব্বে আমাকে দেখতে দেবার জন্যে যে কপি পাঠানো হয়েছিল সেই কপিই তোমাকে দিয়েছি। ঐ মলাটে যে আঁকাজোখা আছে সে আমার নয়, কার তাও জানি নে।

শ্যামলীতে প্রবেশ করার পর থেকেই কাজ সংক্ষেপ করার চেষ্টায় আছি— এখনো কৃতকার্য্য হতে পারি নি। ইতি ১৭ জুলাই ১৯৩৫

দাদা

১৮১

১২ অগস্ট ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন চিঠি লিখতে পারি নি। দেহে মনে উদ্যমের অভাব— জীবনের দিবসান্তে যেন প্রদোষের ছায়া ঘনীভূত। মন অত্যন্ত কর্ম্মবিমুখ অথচ কর্ম্মের অভাব নেই।

বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন চলচে। আগামী বৃহস্পতি-

বারে দিন স্থির হয়েছে। খুকু যদি আসতে পারত নাচ গানে সে নিশ্চয় খুসি হয়ে যেত। গোটা কয়েক নতুন গানও তৈরি করতে হোলো, নইলে এরা ছাড়ে না।

যেমনি বর্ষামঙ্গলের গান স্বুরু করেছি অমনি বৃষ্টি অজস্রধারে নেমেছে। অথচ অনেক দিন থেকেই অনাবৃষ্টিতে এ প্রদেশে চোখের জল ছাড়া আর সবকিছু শুকিয়ে গিয়েছিল। এমন আরো অনেকবার ঘটেচে। এই দৃষ্টান্তে কবিত্বের মন্ত্রশক্তি দাবী করতে পারি।

তোমার চিঠিতে বোধ হচ্চে ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ করেছ। তিনি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু সে সব ব্যয় হয়ে গেছে। অনেক খরচ করে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবার উপায় করে দিয়েছিলেন— সেই উপলক্ষ্যে প্রচুর অনাবশ্যক ব্যয় করেছেন। প্যারিসে আমার চিত্রপ্রদর্শনীর সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে নিয়েছিলেন— তার পরিমাণ অল্প নয়। তিনি আমার জাহাজযাত্রার জন্যে যে একটি আরামকেদারা দিয়েছিলেন সেইটেই কেবল তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সাক্ষ্য-স্বরূপে রয়েছে। ইতি ১২ অগস্ট ১৯৩৫

দাদা

১৮২

২১ অগস্ট ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছুদিন শরীর অসুস্থ ছিল— কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণই বন্ধ করতে হয়েছিল। আমার শরীরে দুর্ব্বলতা যতই থাক প্রায় সে অসুস্থ হয় না— তার কারণ শরীরযন্ত্রগুলি জীর্ণ হয় নি। এবারকার অসুখে মনে হোলো কোথাও যন্ত্র বিকল হয়েছে। সেটা কাটিয়ে উঠ্‌তে কিছু সময় লেগেছে কিন্তু এখন সে নিষ্কৃতি দিয়েছে। যাই হোক নোটিস পাচ্চি যে বহুকালের এই দেহটাকে নিয়ে সামান্য পরিমাণেও টানাটানি আর চলবে না। কাজ তো কম করি নি— এত বেশি জমা হয়েচে যে অনেকবার মনে হয় এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়। কেননা উৎপত্তি যদি পরিমিত না হয় তাহলে তার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। অন্তত তার মধ্যে অনেক বর্জ্জনীয় জিনিষ থেকে যায়— তারই প্রভাবে রক্ষণীয় জিনিষেরও মূল্য কমবার কথা। এ নিয়ে মনে আন্দোলন করে লাভ নেই। কারণ, মহাকাল স্বয়ং হচ্চেন ভাণ্ডারী, তিনি নিজের গরজেই যাচাই করতে ভুল করেন না। আজ পর্য্যন্ত যা তিনি জমা করেচেন তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন ঝাঁটিয়ে। সেই যারা নিষ্কৃত হয়েচে তাদের বেদনা কোথাও নেই— কারো ভ্রম-ক্রমে তারা যদি থেকে যেত তাহলেই সৃষ্টির মধ্যে ব্যথা দিয়ে থাকত।

কাল থেকে অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি চলেছে। আজ অপরাহ্নে পশ্চিম

দিগন্তে কালো মেঘের আসর জমে উঠ্‌ল— হঠাৎ সুদূর প্রান্তর পেরিয়ে গর্জ্জন করে প্রবলবেগে ছুটে এল ঝড়ের হাওয়া, একটু পরেই তার পিছন পিছন এল মূষলধারে বর্ষণ— দেখতে দেখতে ভেসে গেল মাঠ বাট— তার পর থেকে রিম্‌ঝিম্‌ ধারাপতন চলেইচে। এখন নিকষকালো অন্ধকার— ঝিল্লিধ্বনিতে আকাশের নাড়ীতে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ভিজে হাওয়ায় গায়ে বালাপোষ জড়িয়ে বসে আছি। ইচ্ছে করচে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারের গভীর তলায় চোখটাকে মনটাকে অবগাহন স্নান করিয়ে নিই। এখনি তাই করব। এখানকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ভারি একটি গম্ভীর মহিমা আছে। আকাশ নির্ম্মল থাকলে মনে হয় তারাগুলো যেন খুব কাছে এসেছে, তার অপরিসীম রহস্যে মন অভিভূত হয়।

আজকাল মাঝে মাঝে অনেকদিন যদি আমার চিঠি বন্ধ থাকে তবে উদ্বিগ্ন হোয়ো না। আমার বয়সে সংসারের ছোটো-বড়ো সমস্ত দায়িত্বকে অস্বীকার করবার সময় এসেছে— কর্ত্তব্যে মন না দেওয়াই আমার এখনকার প্রধান কর্ত্তব্য। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩৪২

দাদা

১৮৩

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বড়ো চিঠি লেখার মতো শক্তি ও উৎসাহ আমার নেই, সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলি। জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও ব্যবহারের অন্যায় বহুব্যাপী, সেইজন্যে শ্রেয়ের বিশুদ্ধ আদর্শ ধর্ম্মসাধনার মধ্যে রক্ষা করাই মানুষের পরিত্রাণের উপায়। নিজেদের আচরণের হেয়তার দোহাই দিয়ে সেই সর্ব্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শকে যদি দূষিত করা যায় তাহলে তার চেয়ে অপরাধ আর কি কিছু হতে পারে? ঠগীরা দস্যু-বৃত্তি ও নরহত্যাকে তাদের ধর্ম্মেরি অঙ্গ করেছিল। নিজের লুব্ধ ও হিংস্র প্রবৃত্তিকে, চরিত্রবিকারকে, দেবদেবীর প্রতি আরোপ করে তাকে পুণ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করাকে কি দেবনিন্দা ও পাপ বল্‌বে না? যারা নিজে লোভী রক্তলোলুপ, তাদের নিন্দা করো, কিন্তু দেবীকে রক্তলোলুপ প্রমাণ করার মতো বীভৎস নিন্দনীয়তা আর কী হতে পারে? এই কুৎসিত আদর্শবিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত, তিনি তো ধর্ম্মের জন্যেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্মের উদ্দেশেই প্রাণ দিতে ও নিতে স্বয়ং উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশই তো রামচন্দ্রশর্ম্মা পালন করচেন, ধর্ম্মের নামকে কলঙ্কিত করে অনিচ্ছুক অশক্ত প্রাণীকে বলি দেওয়ার সঙ্গে রামশর্ম্মার ধর্ম্মোদ্দেশে ইচ্ছাকৃত আত্মবলিকে

তুমি এক কোঠায় ফেলে নিন্দা করলে কী মনে ক'রে, আমি বুঝতে পারলুম না। সাধারণ মানুষের হিংস্রতা নিষ্ঠুরতার অন্ত নেই— স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণ রোধ করতে পারেন নি— কিন্তু পাপচিত্তে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ধর্ম্মকর্ম্মে হিংস্রতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গের মতো দুষ্কর পুণ্যকর্ম্ম আর কিছু হতে পারে না; তাতে আশুফল কিছু হতে পারে কি না জানি নে কিন্তু সেই প্রাণউৎসর্গই একটি মহৎ ফল। তিনি আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণঘাতক ধর্ম্মলোভী স্বজাতির কলঙ্কক্ষালন করতে বসেচেন এই জন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি। তিনি মহাপ্রাণ বলেই এমন কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

হঠাৎ খবর পেলুম আমাদেরি বংশের কোনো লোক সজনীকান্তকে নিন্দা করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। কিছুদিন আগে সজনীকান্ত রজতজুবিলির অভিনন্দনসূচক পত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে আমার কাছ থেকে লেখা চাইবার জন্যে আশ্রমে এসেছিলেন। আমি দিতে পারি নি, তাঁকে উপেক্ষা করা তার কারণ নয়। এই অনুরোধ নিয়ে তাঁর ভাষায় বা ব্যবহারে আত্মলাঘবজনক কিছুই প্রকাশ পায় নি। লেখার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ জানান নি বাংলাদেশে এমন সম্পাদক অল্পই আছে, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে সম্মান করেচেন কিন্তু আত্মসম্মানের হানি করেচেন এমন কথা বলা অসঙ্গত। যা হোক আমাকে জড়িত করে এই রকম অন্যায় কুৎসাবাদের সৃষ্টি করায় আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ ও দুঃখ বোধ করেচি।

আমার শরীর ভালো নেই কিন্তু আমার এ বয়সে সেটাকে

বিশেষ সংবাদ বলে গণ্য করা চলবে না। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩৪২

দাদা

১৮৪

৮ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার হাত থেকে ছুটির পার্ব্বণী পেয়ে খুব খুসি হয়েছি— ভোগ করেছি যথাসাধ্য— কাল বিজয়ার দিনে পরব তোমার দেওয়া কাপড়খানি। আজকাল তলিয়ে গেছি নৈষ্কর্ম্ম্যে— কর্ত্তব্য-সাধনা এখন আমার সাধনার অন্তর্গত হয় [? নয়]— মানব-সংসারের সমস্ত দায়িত্ব থেকে ছুটির আবেদন করচি— পূর্ব্ব কর্ম্মবেগ এখনো আমাকে ধাক্কা দিয়ে চালায় কিন্তু সেটা ক্ষীণ হয়ে আসচে। দিন ম্লান হয়ে এসেছে সায়াহ্নে, সায়াহ্ন নিঃশব্দে বিলীন হবে রাত্রির মধ্যে। এই শান্তির পথে যাত্রা প্রতিদিন সহজ হয়ে আসুক এই আমি কামনা করচি— অভ্যাসের গোপনে থেকে যায় ক্ষোভের কারণ, হয়তো তার মূল শিথিল হয়ে আসচে।

শরৎকাল দিনে দিনে রমণীয় হয়ে আসচে। মনে হচ্চে এই আমার কাল— এই শিশিরধোয়া ঘাসে শিউলি ঝরার কাল। এই যে শুভ্রতার স্তব্ধ ফোয়ারা দেখি কাশের বনে— এই ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হবে আমার মনের প্রান্তরে সেই খবরের

যেন আভাস পাই ঐ নির্ম্মল নীলাকাশে। ইতি শুক্লানবমী আশ্বিন ১৩৪২

দাদা

১৮৫

৮ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কার্ডখানা যে রমণীয় তা নয়— হাতের কাছে বিনা চেষ্টায় পেয়েছি— পড়ে আছে সামনে, লিখে দিচ্চি দু চার কথা। কলকাতায় আমার যাওয়া সহজে আর ঘটবে না— জরার জড়িমা তাকে পেয়ে বসেছে। যদি দেখি কোনো কারণে এই ছুটিতে অন্যত্র কোথাও যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে— তাহলে কলকাতা রাস্তায় পড়তে পারে— তখন তোমাকে নিশ্চয় খবর দেব। এখানে শরতের স্নিগ্ধ শুভ্র সৌরভের উৎস উদ্বারিত— পরিবর্ত্তনের দুরাশায় এখান থেকে কোথাও যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। বস্তুত ঠাঁইবদল বা হাওয়াবদল তেমন প্রয়োজনীয় নয়, আসল দরকার মানুষবদল। এখানকার মানুষ অত্যন্ত পরিচিত, তাদের ঠেকানো যায় না— পলায়ন ছাড়া ভদ্রভাবে নিষ্কৃতির উপায় নেই। তোমার দেওয়া ধুতিটি পরে এখানে কাল বিজয়ার অভ্যর্থনা সম্পন্ন করেছি। মালপোয়া নানা আকৃতির ছিল বটে কিন্তু তার প্রকৃতিতে একই রকমের মিষ্টতা। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩৫

দাদা

১৮৬

৯ অক্টোবর ১৯৩৫

কল্যাণীয়া শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী
বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ আশ্বিন

১৩৪২

১৮৭

১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বন্দ্বের কথা যখন বলো সেটা আমি বুঝতে পারি নে বলে মনে কোরো না। যে তুরীয় ধামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছ বলে তুমি পীড়া বোধ করো তার সত্যতাকে আমি মনে মনে লাঘব করি নে। তোমার ধর্ম্মদীক্ষা তোমার সংসারকে এবং উপাস্যকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী করে দিয়েছে— একটাকে ত্যাগ না করলে তুমি স্থিতির আশা করতে পার না। আমি দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য করতে চাই আপন স্বভাবেরই প্রবর্ত্তনায়। এই আমার চারদিকেই সকল সম্বন্ধের মধ্যেই যেখানেই সুন্দরকে দেখি, যেখানেই কল্যাণের সাধনা করি সেখানেই আমার মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্য এক হয়ে যায়। সত্যের

মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ নেই, সত্য সব নিয়ে এক। মর্ত্ত্যজগৎ সয়তানের সৃষ্টি নয়, আমারও ঘরের বানানো নয়, সে সেই মহাসত্যেরই অন্তর্গত যার মধ্যে তুমি সংসারাতীতকে খুঁজে বেড়াচ্চ। পরমার্থসাধনাকে অশুচি করা হয় যখন সত্যের কোনো অঙ্গকে অশুচি কল্পনা করে ঘৃণার অন্ধ সংস্কার রচনা করো। অশুচিতা আমাদের নিজের বিকৃতিতে। পরমার্থ-চিন্তাকেও আমরা অশুচি করি যখন তার মধ্যে অহঙ্কার আসে, অন্ধতা আসে, ভেদবুদ্ধি দেখা দেয়। সংসারও পবিত্র, স্বয়ং পরমাত্মার আনন্দরূপ, যখন তাকে সেই ভাবে দেখতে পারি। শুচিতা জলে মাটিতে অশনে বসনে মন্ত্রে তন্ত্রে নেই— শুচিতা অন্তরপ্রকৃতিতে— যেহেতু মানুষ মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক। যিশুখৃষ্ট এই কথাই বলেছেন, ভগবান বুদ্ধেরও এই উপদেশ। ভগবদ্-গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেন যখন যজ্ঞকে তিনি বাহ্য উপকরণগত না বলে বলেছেন আন্তরিক। সত্যই যজ্ঞ, দান যজ্ঞ, জীবে দয়া যজ্ঞ, সর্ব্ব মানুষে মৈত্রী যজ্ঞ। যেখানে সত্য নেই, দয়া নেই, চিত্তের নির্ম্মলতা নেই আছে পূজা অর্চ্চনা, আছে ভক্তিরসের সম্ভোগ সেখানে আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রবঞ্চনা। বিধাতার জগৎকে অবিশ্বাস কোরো না, ঘৃণা কোরো না, তিনি পৃথক একটা স্বর্গ সৃষ্টি করে নিজের পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ বাধান নি। সব কিছুতে আনন্দিত হও, সবাইকে আনন্দিত করার সাধনা করো, এতেই মুক্তির স্বাদ। ইতি ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

দাদা

৩ নভেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখি নি, তার কারণ কুঁড়েমি। যথাসম্ভব কাজ সংক্ষেপ করে চলেছি। মনের বায়ুমণ্ডলকে স্বচ্ছ করে তোলার প্রয়োজন আছে।— সাকার নিরাকার উপাসনা-ভেদ নিয়ে আমার মনে কোনো তর্ক নেই। যে মূঢ়তায় মানুষের মনকে নিরালোক করে, যে ভেদবুদ্ধিতে পরস্পরের সম্বন্ধকে অপমানিত করে, যে পূজাবিধি বাহ্যানুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়ে আত্মাকে খর্ব্ব করে, ধর্ম্মের নামে যে সকল নিরর্থক প্রথা সুদীর্ঘকাল হিন্দুকে দুর্ব্বল ও পরাভূত করে রেখেছে তাকে নিন্দা না করে থাকতে পারি নে।

তোমার চিঠিতে মুসোলিনিকে আমার পুরাতন বন্ধু বলে উল্লেখ করেছ। একদিন প্রকাশ্যভাবে আমার বন্ধুর অত্যাচারের নিন্দা করেছি— সেই অবধি তাঁর রাজ্যে আমার প্রবেশ করা নিরাপদ নয়, তাঁর প্রজারা আমাকে সম্মান দেখাতে ভয় পায়, ইটালিতে আমার ছবি অনেককে গোপন করতে হয়েছে। এই বন্ধুর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য করে আমি প্রিয়বাক্য বলি নি। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্যে ধর্ম্মপত্নীকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, সেই পথ অনুসরণ করে লোকরঞ্জনের খাতিরে যদি সত্যকে বর্জ্জন করতে পারতুম, তাহলে দেশের জনসাধারণের প্রিয়পাত্র হতে বাধা থাকত না, এবং রাজদত্ত সম্মানের শিরোপা আজও আমার

ললাটকে ভূষিত করত।— দেশের কাছে অনেক আপিল অনেক-দিন করেছি, কখনো কোনো ফল পাই নি। নিষ্ফল প্রয়াসের উৎসাহ এখন আর নেই। যাঁদের বয়স অল্প সংসারের ভার তাঁদেরই পরে। ইতি ৩ নবেম্বর ১৯৩৫

দাদা

১৮৯

১৪ নভেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যদি অ্যাবিসীনিয়ার রেড ক্রস সোসাইটি ফণ্ডে টাকা পাঠাতে ইচ্ছা করো তাহলে সোজা দিল্লির ঠিকানাতেই পাঠানো ভালো। যথাস্থানে পৌঁছবে সন্দেহ নেই।

রাজা নাটকটি অভিনয় করা যাবে এই রকম সঙ্কল্প হয়েছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি— আমাকেও নামতে হবে ঠাকুর্দ্দার পালায়। কিছুদিন আগে এখানে শারদোৎসব অভিনয় হয়ে গেছে তাতে আমি ঠাকুর্দ্দা সেজেছিলুম— ঠাকুর্দ্দার বাহ্য সাজ বিধাতা স্বহস্তে রচনা করেচেন— পরচুলোর খরচ বেঁচে গিয়েছিল।

খুকুর বিয়ে নিয়ে তোমরা ব্যাপৃত আছ। বিয়ের পরে ওদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ করবার সুযোগ হয় তো পাওয়া যাবে। ইতি ১৪ নবেম্বর ১৯৩৫

দাদা

১৯০

[কলিকাতা] ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫

কল্যাণীয়াসু

এই মাত্র অভিনয় শেষ করে আসচি। নিরতিশয় ক্লান্ত। তোমরা দেখতে এলে খুসি হতে।

আগামী কাল বরানগরে যাচ্চি— এখানে ভিড়ের চাপ আর সইচে না। বোধ হয় ১৬ তারিখে কটকে যাবো। ৭ই পৌষ উপলক্ষ্যে ফিরতে হবে তার আগে নয়। ইতি ১২।১২।৩৫

দাদা

১৯১

[কলিকাতা] ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি। শয্যাতল থেকে এখনো নিষ্কৃতি পাই নি। তোমার মিষ্টান্ন অর্ঘ্য পেয়ে আনন্দিত হলুম খেয়ে আনন্দবর্দ্ধনের উপায় নেই। তোমরা দ্বারে এসে চলে গিয়েছিলে সেজন্যে দুঃখিত হয়েছি। ইতি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫

দাদা

১৯২

[কলিকাতা । ডিসেম্বর ১৯৩৫]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখনো ছুটি মেলেনি। দুর্ব্বল। চিকিৎসকের শাসনে আছি। যখনই চলৎশক্তি ফিরে পাব যাব শান্তিনিকেতনে। তোমার ফুল পেয়ে খুব খুসি হলুম।

দাদা

১৯৩

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কন্‌গ্রেসের বিরুদ্ধে তুমি যে অভিযোগ করেচ তার মর্ম্ম বুঝতে পারলুম না। কনগ্রেস মুসলমান খ্রীষ্টান শিখ ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করে কেবল সনাতনী হিন্দুদের প্রতি নয় আমি তো তার কোনো প্রমাণই পাই নি। কন্‌গ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক সমাজ তার উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। যদি পড়ত তাহলে একই কালে শিখ ও মুসলমানকে সে গ্রহণ করতে পারত না। কনগ্রেসের যাঁরা নেতা তাঁরা ভারতের সকল সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করে বললাভ ও জয়লাভ করতে স্বভাবতই ইচ্ছা

করেন। সনাতনীদের ধর্ম্মই ভারতীয় সমাজকে চিরবিচ্ছিন্ন করবার পন্থা আশ্রয় করেছে— এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে ইচ্ছা করেন তাঁদের সঙ্গে সনাতনী-দের মত ও আচারের মিল না থাকাই সম্ভব— কিন্তু তাই বলে কনগ্রেসের কার্য্যবিধির মধ্যে বিশেষ করে সনাতনীদেরই ঠেকিয়ে রাখা হয়েচে এমন অপবাদ আমি তো আর কখনো শুনি নি। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই ভগবানকে পূজার ক্ষেত্রে জাতের বেড়ায় বিভক্ত করা হয়েছে— অর্থাৎ যেখানে শত্রুরাও মেলবার অধিকার রাখে হিন্দুরা সেখানেও মিলতে পারে না। এই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদে হিন্দুরা পদে পদে পরাভূত। তারা সর্ব্বজনের ঈশ্বরকে খর্ব্ব করে নিজেদেরই পঙ্গু করেছে— তাদের এই নিত্যধর্ম্মবিরোধী আত্মঘাতী আচরণকে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষীরা কখনোই শ্রেয় বলে স্বীকার করতে পারে না। বাংলাদেশে আজ যে মুসলমানের সংখ্যা এত অত্যন্ত বেশি, তার কারণ ঘটিয়েছে সনাতনীরা, আমি যখন জমিদারী পরিদর্শনে মফস্বলে যেতুম প্রতিদিন তার প্রমাণ পেয়েছি। মানুষকে হিন্দুসমাজ অবমাননার দ্বারা দূর করে দিয়েছে, সকলের চেয়ে লজ্জার বিষয় এই যে সেই অবমাননা ধর্ম্মের নামেই। সনাতনীরা নিত্যধর্ম্মবিদ্রোহী বলেই দেশবিদ্রোহী। মুসলমানের কাছে একদিন তারা হেরেছে আবার হারবে। মুসলমানের আর যত দোষ থাক তারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করে নি, তাদের ধর্ম্মের বিধানেই তাদের ঐক্য। আমাদের ধর্ম্মের বিধানেই আমাদের অনৈক্য। এই অনৈক্যের ফাটল দিয়েই বহুশতাব্দী ধরে আমাদের

শক্তি গেল বহিঃস্থত হয়ে। সনাতনীরা যদি এই অন্ধ সংস্কারের ভেদবুদ্ধিকেই, এই নরনারায়ণের অবমাননাকেই ধর্ম্মের অনুশাসন ব'লে আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে স্বদেশের মুক্তির সাধকেরা কদাচ তাদের এই আত্মবিনাশের পন্থাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। বিদেশী যারা বাহির থেকে আমাদের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছে, ভিতর থেকে হিন্দুরা নিজের হাতে তাদের চেয়ে আরও বেশি কড়া শিকল এঁটে দিয়ে সেই শিকলকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করচে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে কন্‌গ্রেস সাহস করে সমালোচনা করে নি— মহাত্মাজি প্রভৃতি দুই একজন ব্যক্তিগত ভাবে করে থাক্‌বেন। কন্‌গ্রেসের এই ভীরুতা তার কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ— কিন্তু তবু কেন তুমি সনাতনীদের পক্ষ থেকে কন্‌গ্রেসের নামে নালিশ এনেছ তা আমি বুঝতে পারলুম না। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫

দাদা

১৯৪

৮ জানুয়ারি ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইনফ্লুয়েঞ্জায় পীড়িত হয়ে পড়ে আছি। পত্রাদি লেখা দুঃসাধ্য। এই ধাক্কায় দেহের ভাঙনের কাজ আরো কিছুদূর এগিয়ে দেবে।

তোমার মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব চল্‌চে— কেবলি নিজেকে দুঃখ দিচ্চ। তোমার অভ্যস্ত সংস্কার এবং তোমার বুদ্ধির মধ্যে কিছুতেই মিল হচ্চে না। মেয়েরা স্বভাবতই বিচারবুদ্ধির চেয়ে প্রথার প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত। আমাদের দেশে বারো আনা পুরুষ স্ত্রীস্বভাবাপন্ন— ভীরুতা এবং মূঢ়তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কিন্তু ধাক্কা লেগেচে। জাগতেই হবে।

সুজিতকুমার বেদজ্ঞ পণ্ডিত, কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর বইখানি তোমাকে পাঠালুম। পড়ে দেখো। ইতি ৮ জানুয়ারি ১৯৩৬

দাদা

তোমার নামের লেব্‌ল্ নিয়ে একটিন মধু আমার কাছে আজ এসে পৌঁছল।

১৯১

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কন্যার সঙ্গে এতদিন পরে প্রথম বিচ্ছেদের দুঃখ তোমাকে অত্যন্ত বাজবে সে তো ধরা কথা। কিন্তু তার উপরে কাল্পনিক আশঙ্কা ও উদ্বেগের বোঝা চাপিয়ে নিজেকে অতিরিক্ত পীড়িত কোরো না। যেমন অবস্থাতেই থাক্ বাসন্তী স্বামীর ঘরে নিশ্চয়ই সুখে থাকবে, কেননা সে ঘর যে ওর নিজেরই ঘর— তোমাদের

কাছে ও ছিল আশ্রিত, সেখানে ও হোলো কর্ত্রী— আপন সংসার আপন জীবন দিয়ে সেখানে সৃষ্টি করতে হবে— এই সৃষ্টিকার্য্যে মেয়েদের যেমন সুখ এবং কল্যাণ এমন আর কিছুতেই নয়— তোমার বিয়োগদুঃখদ্বারা কল্পনায় তাকে ক্ষুণ্ণ কোরে দেখো না। তার সংসারে তোমাদের মনের মতো স্বচ্ছলতা না থাকতে পারে— তাতে কী আসে যায়। বাসন্তীর স্বামী নিজের পৌরুষের জোরেই নিজের উন্নতি সাধন করবে। তোমরা প্রশ্রয়দ্বারা ওকে যদি দুর্ব্বল ও নির্ভরপরায়ণ করো তাহলে পরিণামে ওর ক্ষতিই হবে। আমাদের দেশে শ্বশুরনির্ভরী পুরুষের দুর্গতি অনেক দেখেছি। কিছু পরিমাণে সাংসারিক অভাব মারাত্মক নয়, তাতে করে উদ্যমকে চেতিয়ে তোলে। তাছাড়া সাধারণ গৃহস্থালির আদর্শে অভ্যস্ত হওয়া তোমার মেয়ের পক্ষে ভালো শিক্ষা। যারা ভালো গিন্নি হয় তারা অতি-স্বচ্ছলতার মধ্যে মানুষ নয়। বস্তুত স্নেহের আতিশয্যে তোমরা যা নিয়ে আহাউহু করো সেটা তোমাদের নিজেরই মানসিক আরামের জন্যে— সেটা মেয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। অবস্থার অনতিধনশালিতা অসম্মানের নয়, অসম্মান বাইরের সাহায্যের প্রতি নির্ভর। তোমার মেয়েকে প্রথম থেকে এই অপমানে দীক্ষিত কোরো না, তার নিজের চেষ্টাকে অবকাশ দিয়ো। ইতি

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

দাদা

১৯৬

৪ এপ্রিল ১৯৩৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বহু দেশ ঘুরে অবশেষে শ্যামলীর আশ্রয়ে এসে ফিরেছি। বিশ্রামের জন্যে মন উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে— কিন্তু আমার গ্রহ বিশ্রাম করেন না, আমাকেও করতে দেন না। দিল্লিতে বাঙালীদের অভ্যর্থনার আতিশয্যে আমাকে শয্যা আশ্রয় করতে হয়েছিল। ডাক্তার ডিজিটলিন খাইয়ে আমার ক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত করেছিলেন।

চিত্রাঙ্গদার অভিনয় দেখে পশ্চিমপ্রদেশের সকলেই প্রশংসায় মুখরিত। সেখানকার গুণগ্রাহীরা বলেছেন সৌন্দর্য্যের এমন চরম উৎকর্ষ তাঁরা কখনো দেখেন নি— ও অঞ্চলের শ্বেত-দ্বৈপায়নেরাও বিস্ময়বিমুগ্ধ। আমার দুর্গ্রহের চক্রান্তে আমি বাংলাদেশে জন্মেছি— সেখানকার মানুষ মন খুলে ভালো বলবার অসহ্য দুঃখ সইতে পারে না, সেখানে সকলেই সকলের চেয়ে প্রখর বুদ্ধিমান— প্রখর বুদ্ধির লক্ষণ এই যে খাটো বাট-খারায় ভালো জিনিষের গৌরব পরিমাপ করা— যেমন করে হাটে সুচতুর মহাজন পাট কেনবার সময় চাষীকে ঠকিয়ে ওজন চড়ায়। পূরো প্রশংসা পেয়েছি আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্রই, কেবল পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ ছাড়া। আমি বলি ভাগ্যের হাতে বঞ্চিত হওয়াই ভালো— তাতে বিধাতাকে ঋণী করে রাখা যায়।

নন্দিতার বিবাহ আশ্রমেই হবার কথা। এখন বিদ্যালয়ের

লম্বা ছুটি। যাদের নিয়ে এখানে সমারোহ, তারা অনুপস্থিত থাকবে— কাজটা শান্ত ভাবেই সম্পন্ন হবে। আমার পক্ষে সেটা ভালো।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসে পৌঁছন গেল সেই দিনই দেবতার বর্ষণ আমাদের অভিনন্দিত করেছে। এখনো ঠাণ্ডা আছে হাওয়া। পশ্চিমে ভ্রমণের সময় যে ধূলো অন্তর্গত হয়েছে তাতে বোধ করি আমার ওজন সের চার পাঁচ বেড়ে গিয়ে থাকবে।

একটা কথা মনে রেখো, তোমার চিঠিগুলি আমার কাছে আসে অর্ঘ্যের মতো— আমি তাকে কিছুমাত্র অনাদর করি নে।

কলকাতায় কী উপলক্ষ্যে কবে যাওয়া হবে তা কিছুই বলতে পারি নে। তোমার জ্যোতির্ভূষণকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ো। ইতি ৪।৪।৩৬

দাদা

১৯৭

[শান্তিনিকেতন] ৩০ এপ্রিল ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বিবাহের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম— কাজটা সুসম্পন্ন হয়ে গেল, এখন আমার ছুটি। এখানকার বাগানের ফল তোমাকে পাঠাবার সঙ্কল্প ছিল কিন্তু ফলের আশা ত্যাগ করতে

হোলো। অনাবৃষ্টিতে ধরণীর রসসঞ্চয় নিঃশেষপ্রায়। পেঁপে-গুলো বালখিল্য মুনিদের মতো গাছে ঝুলচে উপবাসে জীর্ণ, যে কয়টা লেবু ফলেছে তাদের অবস্থা দেখে আমার বাগান লজ্জিত। কাঁচা আমগুলো দুদিন বাদেই শুকিয়ে ঝরে পড়বে এমন তাদের ক্লিষ্ট দশা। অপরিণত ফলসা এখনো গাছে আছে কিন্তু তাদের ফল বলে গণ্য করা চলবে না। গাছভরা ছিল বেল, আমার চেয়ে সতর্ক লোকেরা সেগুলো গাছে রাখে নি, সরবতী লেবুগুলো আমাদের অগোচরে যাদের ভোগে লেগেছে তারা আমার অপরিচিত। লিচুগুলো চুরির যোগ্য অবস্থা হবার পূর্ব্বেই ধরাশয্যাশায়ী।

এই দুর্গতির দিনে অনন্যগতি হয়ে আমার সাহিত্যবৃক্ষের ফল তোমাকে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু সেও নূতন গাছ থেকে পাড়া নয়। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে বিনয় আমি করব না। ছাপবার সময় প্রুফ দেখতে হয়েছিল, তখন অনুভব করেছিলুম এর মধ্যে জীর্ণতার কোনো লক্ষণ নেই। আমি তরুণের কবি, আমার লেখায় তার প্রমাণ কখনো ক্ষীণ হবে না। চিত্রাঙ্গদা বাসন্তীকে লক্ষ্য করেই পাঠিয়েছিলুম, কেননা ছাপার অক্ষরের অন্তরালে নৃত্যের রূপ প্রচ্ছন্ন। তুমি নাচ দেখ নি অতএব এটা তোমার কাছে নিরর্থক। অন্য বই দুটি তরুণদের হাতে পৌঁচেছে এতে আমি যথার্থই খুসি হয়েছি। আমার বিশ্বাস ওরাই এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। এর মধ্যে তথ্য নেই, ঘটনার বিবরণ নেই, পুরাণ কথার ব্যাখ্যা নেই। এর মধ্যে যে চিন্তার ও রসের ধারা আছে সে তাদেরই উপভোগ্য যাদের বুদ্ধি ও হৃদয় তাজা,

স্বাদগ্রহণের শক্তি যাদের ক্লান্ত ও ক্ষীণ হয় নি— তাদের কাছে এ বইগুলির সকল সংস্করণই প্রথম সংস্করণ। আমার রচনা যে জাতীয় ফল, জীর্ণ রসনা ও নির্জ্জীব মস্তিষ্কের কাছে তা পথ্য নয় এ কথা স্পর্দ্ধা করেই বলতে পারি। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৪৩

দাদা

১২৮

[জোড়াসাঁকো] ১৩ মে ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর মন আজকাল একান্ত কর্ম্মবিমুখ হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ সময়ই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। এইবার মনে করচি ছুটি নেব। বহুকাল পড়বার সময় পাই নি। বাল্যে ইস্কুল পালিয়েছি বটে কিন্তু পড়ায় ফাঁকি দিই নি। এমন বিষয় ছিল না যা নিয়ে নাড়াচাড়া করি নি। এখন আরএকবার সেই পর্ব্বে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। সেদিনকার বালকের মতোই মনটা পড়তে চাচ্চে। বয়স্কযুগের কঠিন কাজের দায় কিছুতেই ছাড়ে না— অবকাশের আকাশটা তাই স্বচ্ছ হতে পারচে না, কোনো একটা দুর্গমে দৌড় দিয়ে পালাতে ইচ্ছা করে। অল্পদিন আগে ভুবনেশ্বরের একজন পাণ্ডা এসেছিল। বৌমা সেখানে থাকতে তাঁকে এই ব্যক্তি যত্ন করেছিল। ভুবনেশ্বর যদি সম্বৎসর আরামে

থাকবার জায়গা হোত তাহলে সেখানে একটি ছোটো পাহাড়ের উপর কুটীর বানাতুম। তার সুযোগও ঘটেছিল। কিন্তু স্থায়ীভাবে আশ্রয় নেবার জায়গা ও নয়। সে হিসাবে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আর কোনো স্থানের তুলনা হয় না।

আমার ভোগের সামগ্রী ইতিমধ্যে তুমি আমাকে অনেক পাঠিয়েছ। সেই দানের মধ্যে তোমার হৃদয়ের যে স্নিগ্ধতা প্রকাশ পায় সে আমার কাছে রমণীয়। আজ সকালে জোড়া-সাঁকোয় এসেছি। আর কিছুক্ষণ পরে আবার বরানগরে ফিরে যাব। সেখানে মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৪৩

দাদা

১৯৯

১৫ মে ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার জীবনের একটা দিক তোমার ভালো করে জানা নেই। প্রথম বয়সে বৈষ্ণবসাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবনচাঞ্চল্যের আন্দোলনবশত নয়, কিছু উত্তেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রসমাধুর্য্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্ত্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করচে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেচে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের— কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে এ'কে আমি সঙ্কীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারি নি— আজও পারি নে নিক্‌সন্ সাহেবের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও। আমি মানি রস-স্বরূপকে, যাঁর পরমানন্দের মাত্রা জীবে জীবে। আমি সেই আনন্দকে উপলব্ধি করতে চাই বিশ্বের সর্ব্বত্র— বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশ্বমানবে। সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখবার সাধনা আমার, রূপককে সত্য বলে কল্পনা করা কেবল যে আমার পক্ষে অনাবশ্যক তা নয় কিন্তু তা বাধাজনক। তবু বুঝতে পারি আমার পুরুষের স্বভাবে যেটা যথেষ্ট, মেয়েদের স্বভাবে তা নয়। তোমাদের উপাসনা পালন করা সেবা করা, অর্থাৎ ঈশ্বরকেও তোমাদের নারীপ্রকৃতির কাছে নির্ভরশীল করে তবে তোমরা আনন্দ পাও। ক্ষতি নেই। যেখানে তার সত্য প্রয়োজন আছে সেখানে তার উপায় থাকা ভালো। কিন্তু তবু আমার মনে হয় তোমাদের এই প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার স্থান থাকা উচিত মানবলোকে, জানা উচিত মানুষের সেবাতেই ঈশ্বরের সেবা। শিলাইদহের বৈষ্ণবীর আচরণে এই সত্যের আভাস পেয়েছিলুম। কিন্তু যে পথ তোমার চিরাভ্যস্ত আনন্দের পথ তার গভীরে সত্য নেই এমন কথা বলি নে— তুমি নিঃসন্দেহ জেনে বা না জেনে সেই

সত্যকে স্পর্শ করেছ— সুস্পষ্টভাবে যথার্থভাবে তাকে লাভ কর এই আমি কামনা করি। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

দাদা

২০০

৪ জুন ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছু কাল হোল তোমাকে একখানি চিঠি লিখেছি তাতে জানিয়েছিলেম যে ভ্রমক্রমে, আমার চিঠির মধ্যে তোমার বৈবাহিককে লেখা একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলে, সেখানি আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। এ চিঠি কেন তুমি পাও নি বুঝতে পারলেম না। তদনুসারে এ চিঠিও না পেতে পার। অতএব বাহুল্য লিখে কোনো ফল নেই।

ঝড় বৃষ্টি চলচে, ঠাণ্ডা পড়েচে। ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

দাদা

২০১

[শান্তিনিকেতন] ২৫ অক্টোবর ১৯৩৬

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবে। তোমার নতুন বাসায় ঠাকুরঘরের সৌষ্ঠব সাধনে ব্যস্ত আছ। আমিও উঠেছি নতুন

বাসায়— আমার ঠাকুরঘর সাজাবার ভার আমার উপর নেই — আমার আকাশের মিতা এই কাজে লেগেছেন— চারদিকে শিশিরে ঝলমল করচে পত্রপুঞ্জ, হেমন্তের আলোয় লেগেছে কাঁচা সোনার রঙ, পাখীরা আনন্দে চঞ্চল। গাছের ছায়ায় বসে দিন কাটে— ঠাকুরকে সাজাবার স্পর্দ্ধা রাখি নে— তিনি তাতে আপত্তি করেন না— আমাকেই খুসি করবার জন্যে তাঁর আয়োজন। বিজয়[া]দশমী [৮ কার্ত্তিক] ১৩৪৩

দাদা

২০২

২৮ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার আজন্মকালের অভ্যাসবশত এক জায়গায় তুমি আমাকে ঠিকমত বুঝতে পারবে না। আমার কবিপ্রকৃতি, সুতরাং আমি সীমার মধ্যেই অসীমকে উপলব্ধি করি, সে সীমায় তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন— কোনো দেশবিশেষের সম্প্রদায়বিশেষের আপন খেয়ালে গড়া এমন সীমা নয় যা সেই সম্প্রদায়ের বাইরে বিশ্বভুবনে আর কোথাও কোনো সাক্ষ্য রাখে না। যদি বল, নিজসৃষ্ট সীমার মধ্যে তাঁর যে প্রকাশ-রূপ, তাঁর ইচ্ছা তাকেও আমরা আপন ঐশ্বর্য্যে সাজাই। সে কাজ তো করেই আসচি, ছন্দ দিয়ে, সুর দিয়ে আনন্দ দিয়ে—

ঠাকুরঘরের সেই শাশ্বত সেবাই ত কবিদের হাতে। আমাদের এই সাজের ফুল তোমরাও ব্যবহার করতে পার— যেমন করে ব্যবহার করো বাগানের ফুল।— পূজারি ঠাকুরের পথ তাকিয়ে তোমার ঠাকুরের অপমান করো কোন্ সাহসে ভেবে পাই নে। তার হাতের পূজার বিশেষ মূল্য আছে না কি তাঁর কাছে? তাহলে আমি ম্লেচ্ছ যে ঠাকুরঘরের দ্বার খোলা পাই দিন রাত্র, সেখানে কেবলমাত্র তাঁরই দ্বার রুদ্ধ।

ভুল কোরো না, আমি খুবই বেঁচে আছি, গভীর আনন্দে আছি। সে আনন্দের প্রকাশ তোমার অভ্যস্ত পথে নয় বলেই তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমার আনন্দ আজও নব নব ভাষার ভঙ্গীতে রূপ নিচ্চে, সে রসে যাদের স্বাভাবিক অধিকার আছে তারা চিনতে পারবে। যারা কেবলি এক অভ্যাস থেকে আর এক অভ্যাসের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে— তারা তাদের অভ্যাসের বাইরেকার রসউৎসে পৌঁছতে পারবে না। ক্ষতি কী, স্বভাবদত্ত তাদের বরাদ্দ থেকে তারা বঞ্চিত হয় নি।

যে জনসাধারণকে গণমহারাজবর্গের মধ্যে ফেলেছ, তাদেরই ভিতরে একটি স্বচিহ্নিত সীমা এঁকে যত বীভৎসতা দেখতে পাও সেইখানেই— আর মনে কর সেইটে এড়িয়েই তোমার শুচিতা বাঁচিয়ে চলচ। আর তার বাইরে যেখানে তোমার প্রত্যহ স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ, যেখান থেকে তাড়কেশ্বরের পাণ্ডা ও পূজারি-ঠাকুরদের আমদানি, সেখানকার সকল কলুষ সকল বীভৎসতা অভ্যাসের অন্ধতাবশত নির্ব্বিচারে সয়ে যাও। এ কথা মনে আনতে পারো না পাপের ঘৃণ্যতা জাতিবর্ণের মধ্যে বদ্ধ নয়,

প্রত্যহ সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও। এই গণমহারাজবর্গের মধ্যেই তোমরাও আছ, আমরাও আছি, তারাও আছে— পাপপুণ্যের গতায়াত এর সর্ব্বত্রই ;— বিশেষ অভ্যস্ত আচারের কৃত্রিম সিলমোহরের ছাপ মেরে কলুষের গায়েও জাতের তিলক কেটে দিয়ো না। মানবলোকে যদি তার স্পর্শ বাঁচিয়ে নির্ম্মল থাকতে চাও তাহলে ঘরে বাইরে কোথাও পা ফেলতে পাবে না। নিজেকে ঘরগড়া নিয়মে একান্ত সাবধানে শুচি রাখবার সাধনা না করে যথাসাধ্য সকলকে ক্ষমা করবার করুণা করবার আপন করবার সাধনা কোরো। আমাদের দেশে পাপকে তেমন নিন্দা করে নি যেমন নিন্দা করেছে কৃত্রিম আচারের ত্রুটিকে। বিধাতা এই অপরাধকে ক্ষমা করেন নি— বহু শতাব্দী ধরে মার খেয়ে আসচি এই দোষে, মরব এরই হাতে।

একটা ভুল ধারণা তোমার চিঠি থেকে বুঝলুম। নব্যারা আমাকে উপেক্ষা করে কি না নিশ্চিত জানি নে। আসল কথা, কেউ বা করে, কেউ বা করেও না, তার বেশি আশা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রাচীনাদের এবং প্রাচীনদেরও কথা না তোলাই ভালো। কবিধর্ম্মের অনুবর্ত্তী আমি নব্যাদের উপেক্ষা করি নে। যদি প্রাচীনকালে জন্মে থাকি তবে নিঃসন্দেহ তখনকার নব্যাদের প্রতিও আমার হৃদয় সকরুণ ছিল, প্রপৌত্রদের যুগে যদি জন্মাই তবে তখনো থাকবে। আমি যখন নবীন ছিলুম, বাংলাদেশের নব্যারা তখন ছিলেন অদৃশ্য। যদি এত বেশি দৃশ্যমান থাকতেন তাহলে আমার তখনকার ইতিবৃত্তান্তে ভাগ্যলিপি কোন্ রঙের কালীতে কোন্ রসের লিখন প্রকাশ করত জানি নে। এখন

যেখান দিয়ে তারুণ্যের প্রবাহ বয়ে চলেছে তার তীরে আছি বটে কিন্তু আছি শিখরচূড়ায়। প্রবাহিণীর কলধ্বনি শুনতে পাই, চলচাঞ্চল্যও চোখে পড়ে। কিন্তু থাকি নিরাসক্ত। সেই নিরাসক্তির ভূমিকাতেই প্রশস্ত আকাশে গানের স্বরবৈচিত্র্য ছন্দোবৈচিত্র্যে খেলবার জায়গা পায়। গিরিশৃঙ্গ যেমন ফাল্গুনের সূর্য্যতাপে তুষারবিগলিত নির্ঝরধারা দান করে যায় দূর দেশ দেশান্তরকে, আমিও তেমনি দূর থেকেই দান করে যাব নব নব কালকে নবীন নবীনাদের গান। যদি অত্যন্ত নিকটে তাদের সমভূমিতে থাকতুম তাহলে এই ধারায় থাকত না এত অবাধ দাক্ষিণ্য, পদে পদে অনেক ধূলো বালি এ'কে নিকটের সীমায় অবরুদ্ধ করত। ইতি ২৮।১০।৩৬

দাদা

২০৩

[শ্রীনিকেতন] ১৯ নভেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার সেক্রেটরি কলকাতায়। আমার কাজের ভার দুর্ব্বহ। শান্তিনিকেতন ছেড়ে পালিয়ে এসেছি শ্রীনিকেতনের বাড়িতে। এই জায়গাটাতে শ্রীর চেয়ে শান্তিই বেশি। তেতালার নির্জ্জন ঘরে হেমন্তের স্বর্ণালোকপ্লাবিত উন্মুক্ত আকাশের মধ্যে দেহ মন নিমগ্ন। শীতকাল অতিথি সমাগমের সময়। দূর দেশ

থেকে দর্শনার্থী আসচে— শ্রদ্ধা জানিয়েই চলে যায়, আমার অবকাশকে ভারগ্রস্ত করে না। ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

দাদা

২০৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে এসেছি। সেখানে নির্জ্জনে তেতালার ঘরে খোলা আকাশের মাঝখানে একটা মুক্তির অবকাশ ছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বচ্ছ গভীর অন্ধকারে আমি যেন নক্ষত্র-লোকের নীরব সভাকবির মতো বিরাজ করতুম। বামে সূর্য্যোদয় এবং দক্ষিণে সূর্য্যাস্তের মাঝখান দিয়ে বইত আমার চিন্তাধারা। এখানে জনতা এবং কর্ম্মজালে আবৃত করে রাখে মনকে— খাঁচার পাখীর মতো সে কেবলি পালাবার ফাঁক খুঁজতে থাকে। ইচ্ছা আছে এখান থেকে ছুটি পেলেই পদ্মাতটে শিলাই-দহের চরে গিয়ে আশ্রয় নেব। নিজের কাছ থেকে দৌড় দেবার মতো সেখানে যেমন খোলা দরজা এমন আর কোথাও নেই।

দাদা

২০৫

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন পরে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। আমি নানা কাজে নিবিষ্ট আছি, অথচ কাজে আমার আগ্রহ নেই। জীবনের সায়াহ্নকাল কাজ করবার নয় সেটা প্রতিক্ষণে উপলব্ধি করচি। মানুষ কর্ম্মের দাস, সায়ংসন্ধ্যাকে মানে না; সূর্য্য যখন ছুটি ঘোষণা করে দিয়ে অস্তে যান, মানুষ তখন আলো জ্বালিয়ে দিনকে টেনে রাখে। — বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দায় নিয়েছি, ছাত্রদের সমাবর্ত্তনের দিন বক্তৃতা করতে হবে, আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে। বোধ হয় ১১ই তারিখে কলকাতায় যাব। হয় তো বেলুড়েও আমাকে টানবে। বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি যেমন অসঙ্গত, বেলুড়েও তেমনি। আমার নামটাকে নিয়ে সবাই আপন আপন ঢাক বানাতে চায়, কাঠি পড়ে আমারি পৃষ্ঠে। শরীরটা মাঝে মাঝে জবাব দিতে চায়, তাকে দোষ দিতে পারি নে, তার সহিষ্ণুতার অন্ত নেই। ইতি ২০ মাঘ ১৩৪৩

দাদা

২০৬

[কলিকাতা। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এ চিঠি যদি ঠিক সময়ে ডাকে পাও তবে জানবে কলকাতায় সবেমাত্র এসেছি।

তোমাকে সুরুলের তাঁতের কাপড় দু জোড়া পাঠিয়েছি। জানি নে ভালো কি না। গুণের মধ্যে এখানকার পল্লীর জিনিষ।

হয়ত ১৫ই পর্য্যন্ত জোড়াসাঁকোয় থেকে চন্দননগরে যাব। সেখানে কিছুদিন গঙ্গার হাওয়া খাবার ইচ্ছে। তার পরে বক্তৃতাদি শেষ করে যাব কালিগ্রাম পরগণায়, প্রজাদের আমন্ত্রণে — তোমাদের জমিদারীর সান্নিধ্যে।

দাদা

২০৭

[শান্তিনিকেতন] ৫ মার্চ ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন তোমার চিঠি পাই নি, পেয়ে খুসি হলুম। কিছুদিন থেকে নানা কর্ত্তব্যে বিজড়িত হয়ে পড়েছি তার উপরে শরীরটা অবসাদগ্রস্ত হয়েছে— তার সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদের সময় আসন্ন হোলো তাতে আর সন্দেহ থাকচে না। আগামী ১লা বৈশাখে এখানে একটা উৎসব আছে— জনতার আশঙ্কা করি—

আগন্তুকদের যথোচিত অভ্যর্থনা করবার মতো উদ্যম দেহে মনে নেই। চীনরাষ্ট্রপতিরা অনেক টাকা খরচ করে ভারতের সঙ্গে যোগরক্ষার উদ্দেশে এখানে একটি গৃহনির্ম্মাণ করেচেন— অনু-ষ্ঠানটা তাই নিয়ে। ইতি ৫।৩।৩৭

দাদা

২০৮

১৯ এপ্রিল ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞানের বই আমি বেশি পড়ে থাকি। আমার রচনায় যদি এ অনুরাগ রূপ ধারণ করে তোমরা তার সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। ইতি ৬ বৈশাখ ১৩৪৪

দাদা

২০৯

৬ মে ১৯৩৭

ওঁ

আলমোড়া
Almorah

কল্যাণীয়াসু

তোমার কাছ থেকে আমার জন্মদিনের অভিবাদন পেয়ে আনন্দিত হলুম। এখানে এসে ভালো আছি, ভালো লাগচে।

জায়গাটি স্নিগ্ধ সুন্দর নির্জ্জন। বাড়িটি বড়ো, ঘরগুলি আলোয় উজ্জ্বল, বারান্দা প্রশস্ত, চারদিক খোলা, আকাশ মেঘমুক্ত, ঢালু পাহাড়ে শ্যামল বনস্পতির দল রোদ পোহাচ্চে, সামনের পাহাড় নীলিম বাষ্পে অপরিস্ফুট। ২৫ বৈশাখ এত উর্দ্ধে দলে বলে আমাকে আক্রমণ করতে আসবে না মনে করে শান্তিতে আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি
২৩ বৈশাখ ১৩৪৪

দাদা

২১০
[মে ১৯৩৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমরা যা লিখি সে তো বেদবাক্য নয়। যে সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে বিধিদত্ত বুদ্ধি খাটাতে নিষেধ করে,হাজার বছর পূর্ব্বকার বিধিনিষেধের বোঝা নির্ব্বিচারে কাঁধে নিয়ে চলতে বলে, না চল্‌লে চাবুক তোলে আমি তার বিরুদ্ধে যা বলি সে তো কেবল মানুষকে ভাববার [?ভাবাবার] জন্যে। আমি তো কাউকে জাতে ঠেলতে পারি নে, কারো মেয়ের বিয়ে বন্ধ করা আমার সাধ্যে নেই, আমি কেবলমাত্র যুক্তি দিতে পারি। যুক্তি যারা মানতে অক্ষম, বুদ্ধিকে যারা স্বীকার করতে অনভ্যস্ত, তাদের উপর তো বিধাতার দণ্ড উদ্যত হয়েই আছে— বহু শতাব্দীর পরাভবে অপমানে তাদের মাথা হেঁট হয়ে রইল, এখনো শুচিতার বড়াই

করে ব্যর্থতার পথে যদি তারা চলতে চায় তাহলে তার শাস্তি কালেরই হাতে। আজ পর্য্যন্ত শাস্তি অন্য পক্ষেই দিয়ে এসেছে, দলে বলে করে এসেছে জোরজবরদস্তি, এত পীড়ন অন্য কোনো সমাজেই নেই, সেই জন্যেই এত দুর্ব্বলতা অন্য কোনো সমাজকে জীর্ণ করে নি। ভাবিয়ে তুলে তোমার মনকে আমি অস্থির করেছি— অস্থির করতেই এসেছি আমি, বিচারবুদ্ধিকে যারা পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে তাদের মনকে আমি কথার ধাক্কা দেব, এর বেশি আর কিছু করতে পারব না। তারাও আমাকে ধাক্কা দিতে থাকবে। এতে মনোরাজ্যে একটা নড়াচড়ার সৃষ্টি হবে— সেটা ভালোই।

দাদা

২১১

[আলমোড়া] ২০ মে ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসেও জয়ন্তীর হাত এড়াতে পারি নি। অল্পস্বল্পের উপর দিয়েই গেছে, অসহ্য গোছের কিছু হয় নি। বিদেশী লোক, আমাকে দিয়ে আমার ইংরেজি কবিতা পড়িয়ে নিলে। ফুলে ভরে গিয়েছিল ঘর— জলযোগটা লোকের রুচিকর হয়েছিল। বাসন্তী যে সেদিন শূন্য সভায় গান গাইতে রাজি হয় নি তার থেকে বোঝা গেল সে আধুনিক মেয়ে। আনুষ্ঠানিক সমারোহ করতে তার সঙ্কোচ বোধ হতেই পারে সে তোমার মত সেকেলে

নয়। আমাকে নানা উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান করতে হয় কিন্তু ওটা আমার স্বাভাবিক নয়।

ইতিমধ্যে এখানে দারুণ শিলবৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে অকাল বর্ষণও হচ্ছে। বোধ হয় বাতাসে বর্ষামঙ্গলের কবির ছোঁয়াচ লেগেচে।

দিন ভালোই যাচ্ছে। ইতি ২০ মে ১৯৩৭

দাদা

বাসন্তীকে বোলো আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সে যে কোলাহল বাড়িয়ে তুলতে অসম্মত হয়েছিল সে জন্যে আমার কোনো নালিশ নেই।

২১২

[আলমোড়া। ২৯ মে ১৯৩৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীর ভাল নেই এ ওজর চলবে না। কিন্তু ভালো থাকলে এবং ভালো জায়গায় থাকলে কুঁড়েমি পেয়ে বসে— কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা জন্মে এমন কি খেতে শুতেও গড়িমসি করি। অর্দ্ধেক রাত্রি চৌকিতে হেলান দিয়ে কাটে, আর দিনটা কাটে দিবাস্বপ্নে বারান্দায় বসে। নীল আকাশে বেগ্‌নি কুহেলীর চাদর জড়িয়ে পাহাড়গুলো যেন তন্দ্রাবিষ্ট— সুগম্ভীর নৈষ্কর্ম্ম্য-সাধনায় ওদেরি অনুসরণ করতে ইচ্ছে করে।

এখন বেজেছে সাড়ে দুপুর, বাতাসে যে তাপ ও চাঞ্চল্য

দেখা দিয়েছে সেটা গিরিরাজের খ্যাতির যোগ্য নয়। এ আমাদের নিম্নধরাতলের শীতমধ্যাহ্নের আতপ্ত নিশ্বাসেরই মতো। গরম কাপড়টা আচারপালন মাত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে মীরার শরীর খারাপ হয়েছিল, মহারাণী সেই সময়কার সংবাদটা এখনো তাজা রেখেছেন। ইতি ২৯ মে ১৯৩৯ [?১৯৩৭]

দাদা

২১৩

[আলমোড়া] ৩০ মে ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি ভুল কোরো না। বাদ প্রতিবাদে উত্তেজিত হবার মতো মেজাজ আমার নয়। আমি যা বলা উচিত মনে করি ['বলি'], কিন্তু আমার কথা না মানলেই মনে মনে বা বাইরে কাউকে শাস্তি দিতে হবে সে রকম চিন্তা করাও আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তোমার চিরাভ্যস্ত আচার তুমি পালন করবে এ নিয়ে আমার মাথা গরম হবে কেন? আমার শান্তিনিকেতনেই অনেকে আছেন যাঁরা আমার মতানুবর্ত্তী নন, এমন কি আমার মতবিরোধী, আমি তাঁদের তেড়েও যাই নে, তাড়িয়েও দিই না। আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী, আচারের স্বাধীনতা থাক্ অন্যের, বিচারের স্বাধীনতা থাক আমার, এ জন্যে ঝগড়া করার দুঃখ পোষণ করা মূঢ়তা। ইতি ৩০ মে ১৯৩৭

দাদা

২১৪

[আলমোড়া] ১১ জুন ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমি কতকগুলি লেখা নিয়ে দিন রাত ব্যাপৃত আছি। এখানে যে অবকাশ পেয়েছি সে আর কোথাও পাব না তাই এর অল্প অংশও নষ্ট করতে ইচ্ছা করচে না।

তোমার শেষ দুই একটি চিঠি খুব ভালো লাগল। তোমার রচনার শক্তি যখন তোমার মানসিক অবসাদ বা বিরক্তি ভেদ করে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তখন তার অসামান্যতা আমাকে বিস্মিত করে। মনে দুঃখ হয় যে বাহ্যিক ও আন্তরিক নানা বাধার ভিতর দিয়ে তুমি মানুষ হয়েছ, অন্তরে বাহিরে প্রতিহত হয়েছে তোমার সহজ শক্তি।

বাংলাদেশে গল্পগুচ্ছ পড়বার যুগের অবসান হয় নি কি? অল্পবয়সে বাংলা দেশের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দের ধারা উদ্বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলঙ্কৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দবিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই। বাংলা পল্লীর সেই অন্তরঙ্গ আতিথ্য থেকে সরে এসেছি তাই সাহিত্যের সেই শ্যামচ্ছায়াশীতল নিভৃত বীথিকার ভিতর দিয়ে আমার বর্ত্তমান মোটরচলা কলম আর কোনো দিন চলতেই পারবে না।

আবার যদি শিলাইদহে বাসা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে মন হয় তো আবার সেই স্নিগ্ধ সরলতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু আর সময় নেই। অতএব ইতি ১১।৬।৩৭

দাদা

২১৫

১৭ জুলাই ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শরীরটা নিঃসন্দেহভাবেই অসুস্থ। কিছুতে মন লাগাতে বা হাত লাগাতে পারচি নে।

তোমার কবিতা ইতিপূর্ব্বে কখনো কখনো যা পেয়েছিলুম সেগুলি ছিল বেশ তাজা— এখন যে কবিতা পাঠিয়েছ সে যেন সাবেক কালের দাগ ধরা। বোধ হচ্চে তোমার দেহ মনে অবসাদ নেমেচে তাই পুরানো কালের গুঞ্জনধ্বনিই চলচে। জোর করে লিখে কোনো লাভ নেই— খাঁটি লেখা খাঁটি হীরের মতো খনির মধ্যে হঠাৎ হাতে ঠেকে।

শ্রাবণের শ্যামমূর্ত্তি দ্যুলোকে ভূলোকে প্রকাশ পেয়েছে। নিরন্তর ধারাবর্ষণ চলেছে— ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে রোদ্দুর নেমে এসে দিকে দিকে সবুজের উপর সোনালির তুলি বুলিয়ে দিচ্চে— পাখীগুলো ডাকচে আর লাফাচ্চে, তারা খুসি হয়েছে এই কথাটা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো জরুরি

কাজ তাদের হাতে নেই। বেলা যাচ্চে শরৎশেষের স্বল্পজল নদীটির মতো, মন্থর স্রোতে। দক্ষিণের বারান্দায় বাগানের সামনে চুপ করে বসে আছি— কাজ করবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু উৎসাহ নেই।

Calcaria Fluor 6x (বায়োকেমিক, অর্শের একটা ভালো ওষুধ। রাত্রে হোমিয়োপ্যাথী নাক্‌স্ ভমিকা ৩০x এবং প্রাতে সালফর ৩০x উপকারে লাগতে পারে।

বাংলায় বায়োকেমিক বই আছে এই পর্য্যন্ত জানি এর বেশি আর জানা নেই। মহেশ ভট্টাচার্য্যের দোকানে খোঁজ করলেই পাবে। ইতি ১ শ্রাবণ ১৩৪৪

দাদা

২১৬

২০ [? ১৯] জুলাই ১৯৩৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কাল মঙ্গলবারে কলকাতার উপকণ্ঠে যাত্রা করচি। প্রশান্ত তাঁর পূর্ব্বের বাসা পরিহার করে তার থেকে আরো কিছু দূরে বেলঘরিয়ায় একটা বাগানবাড়িতে উঠেছেন। তার নাম গুপ্ত-নিবাস। সন্ধান করে সেখানে আসা হয় তো তোমার অসাধ্য হবে— অতএব আশা করব না। জ্বরনাশক দ্বারিক গুপ্তদের বাড়ি— ভাড়া দিয়েছেন। দিন তিন চার থাকব, কাজ আছে—

কাজ এখানেও আছে— তাই শীঘ্র চলে আসতে হবে। ইতি
৪ [? ৩] শ্রাবণ ১৩৪৪

দাদা

২১৭

বেলঘরিয়া
গুপ্তনিবাস

কল্যাণীয়াসু

আচ্ছা, শনিবারে জোড়াসাঁকোয় যাব। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে অপরাহ্ণের দিকে ফিরে আসব। ইতি বৃহস্পতি-বার

দাদা

২১৮
৪ অগস্ট, ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে এসেছি আমার নিভৃত কুলায়ে। সহরে চারদিকে জাল পাতা— পালাবার জো নেই। বেলঘরিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্গম কিন্তু জনসমাগমের বাধা হচ্ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবকাশ নীরন্ধ্র হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে টাউন-হলে বক্তৃতাও দিতে হোলো, উপলক্ষ্যটি এমন যে না বলতে পারলুম না।

এখানে বৃষ্টিবিহীন শ্রাবণ আকাশে মেঘ বিছিয়ে বসে আছে। ক্ষণে ক্ষণে অত্যন্ত কৃপণ ধনীর ঘরে কাঙালি বিদায়ের মতো ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে যাচ্চে। চাষীদের আশা দিচ্চে কিন্তু আশা পূর্ণ করচে না। ইতি ১৯ শ্রাবণ ১৩৪৪

দাদা

২১৯

১৩ অগস্ট ১৯৩৭

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমার পতিসর ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনতে চেয়েছ। আমার কলম অলস এবং নানা কাজে ব্যস্ত। আমার যে অনুচর ছিল সে বিস্তারিত বিবরণ লিখবে এমন জনশ্রুতি শুনতে পাই। আমার লেখবার একটা মস্ত বাধা আমার অসাধারণ বিস্মরণ-শক্তি এবং নিজের কথা আলোচনা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা। মোটের উপর বলবার বিষয় এই যে খুব ভালো লেগেছিল— প্রথম থেকেই আমার প্রজাদের ভালোবেসেছি তারা তা ভুলতে পারে না, আমার প্রতিও তাদের ভালোবাসা অকৃত্রিম ও গভীর। দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর তারি প্রচুর পরিচয় পেয়ে যত খুশি হয়েছি এমন খুশি আমার রচনা সম্বন্ধে সমালোচকদের স্তুতি-বাদে হই নে।

শ্রাবণ এবার তার আদিপর্ব্বে কৃপণতা করেছিল, বিদায়

কালের কাছাকাছি পূর্ব্বত্রুটি পূরণের চেষ্টা করচে। আগামী রবিবারে এখানে বর্ষামঙ্গলের দিন স্থির করেছি কিন্তু উপর-ওয়ালারা যদি ঐরাবতে চড়ে বর্ষামঙ্গলে লেগে যান তাহলে আমাদের হার মানতে হবে। ব্যস্ত আছি। ইতি ২৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

দাদা

২২০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এবার তুমি যথারীতি আরোগ্যচর্চায় মন দিয়েছ শুনে খুশি হলুম। শরীরটা বিধাতার দুর্লভ দান, ওটাকে অবহেলা করবার অধিকার কারো নেই— লক্ষ টাকা দাম দিয়ে যদি ওকে কিনতে হোত তবু ওর উপযুক্ত মূল্য হোতো না। বিশ্বজগতের সঙ্গে ঐ তো যোগের সেতু, যতদিন বেঁচে আছো ওটাকে মেরামতে রাখবে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এই সর্ত আছে।— আমি কাল সকালের গাড়িতে জোড়াসাঁকোয় যাচ্ছি দিনটা কাটিয়ে রাত্রে অন্তর্ধান করব বেলঘরিয়াতে। তোমার রুগ্ন দেহ এবং অন্যান্য অসুবিধা নিয়ে আসবার চেষ্টা কোরো না। এবারে আমি ৮।৯ দিন থাকব। ব্যস্ত থাকতে হবে। ইতি

দাদা

২২১

৬ অক্টোবর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে বিশ্বপরিচয় ও ছড়ার ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। বোধ হচ্চে পাও নি না পাবার কারণ তোমাদের ঠিকানা বদলের খবর বিশ্বভারতী আপিসে জানাও নি। সে দুটো বই পুরোনো ঠিকানা থেকে উদ্ধার করতে ['না'] পারো তাহলে যথাস্থানে আর দুখানা দাবী করে আনিয়ে নিয়ো।

শরীরে এখন বিশেষ কোনো উপদ্রব নেই— শান্ত হয়ে বসে আছি। ইতি ৬।১০।৩৭

দাদা

২২২

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সুস্থ হয়েছি কিন্তু দেহ নিশ্চেষ্টপ্রায়। আশীর্বাদ। ইতি

দাদা

২২৩

৯ অক্টোবর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বারান্দায় বসে সন্ধ্যার সময় সুনন্দা সুধাকান্ত ও ক্ষিতিমোহন বাবুর স্ত্রীকে মুখে মুখে বানিয়ে একটা দীর্ঘ গল্প শুনিয়ে তার পরে বাদলা বাতাস ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে ঘরে গিয়ে কেদারাতে বসেছিলুম, শরীরে কোনো প্রকার কষ্ট বোধ করি নি, অন্তত মনে নেই; কখন মূর্চ্ছা এসে আক্রমণ করল কিছুই জানি নে। রাত নটার সময় সুধাকান্ত আমার খবর নিতে এসে আবিষ্কার করলে আমার অচেতন দশা। পঞ্চাশ ঘণ্টা কেটেছে অজ্ঞান অবস্থায়, কোনো রকম কষ্টের স্মৃতি মনে নেই। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে রক্ত নিয়েছে, গ্লুকোজ শরীরে চালনা করেছে, কিন্তু আমার কোনো ক্লেশবোধ ছিল না! জ্ঞান যখন ফিরে আসছিল তখন চৈতন্যের আবিল অবস্থায় ডাক্তারদের কৃত উপদ্রবের কোনো অর্থ বুঝতে পারছিলুম না। দীর্ঘকাল পরে মন মোহমুক্ত হোলো। তোমরা দূরে বসে আমার রোগের যেসব বিভীষিকা কল্পনা করছিলে তার সমস্তই অমূলক। রোগের আকস্মিক আবির্ভাব হয় তো সাংঘাতিক, কিন্তু তার আদি অন্তে মধ্যে লেশমাত্র দুঃখ আমি পাই নি।

একটা সুবিধা এই হয়েছে সংসারের হাজার রকম দাবী থেকে নিষ্কৃতি নিতে পেরেছি। প্রতিদিন চিঠি আসচে ঝাঁকে ঝাঁকে, কেউ চায় প্রবন্ধ, কেউ চায় তাদের কোনো অধ্যবসায়ের

জন্যে আশীর্বাণী, কেউ চায় তার মেয়ের জন্যে নাম, কেউ চায় কোনো দার্শনিক বা সাহিত্যিক সমস্যার সদুত্তর— তা ছাড়া রচনার অভিমত,— কারো আর ত্বর সয় না। আগে হলে নিরুত্তরে বসে থাকতে দুঃখ বোধ হত, এখন কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে পীড়া দেয় না, কিছুকালের জন্যে মৃত্যুদূত এসে আমার ছুটির পাওনা পাকা করে গিয়েছে। মনে করচি আমার ভীষ্মপর্ব শেষ হোলো— অনবরত তুচ্ছ দাবীর শরবর্ষণ আজ থেকে ব্যর্থ হবে— স্বর্গারোহণ পর্ব পর্য্যন্ত এই রকমই যেন চলে এই আমি কামনা করচি।

তুমি বৃথা কল্পনায় মনকে পীড়িত করেছিলে সেই জন্যে আসল খবরটা তোমাকে জানালুম। ইতি ৯।১০।৩৭

দাদা

২২৪

[১৩ অক্টোবর ১৯৩৭]

ওঁ

"গুপ্তনিবাস"

বেলঘরিয়া

২৪ পরগণা

কল্যাণীয়াসু

শরীরটার আরো মেরামৎ দরকার আছে তাই টেনে এনেছে কলকাতার দিকে। আছি সেই বেলঘরিয়ার বাগানে— গৃহ-স্বামীরা তাঁদের বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছেন গিরিডিতে। মাস-

খানেক লাগবে নিষ্কৃতি পেতে। ইতিমধ্যে কাল তোমার কাছ থেকে পরিধেয় উপহার পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। ঘনঘোর ঘটা করে বাদল চলচে— এখানে চারদিকের গাছপালার সঙ্গে তার সুসঙ্গতি আছে— কলকাতার ইঁট কাঠের দেয়ালগুলোর মধ্যে তার সুর নষ্ট হয়, তাল কেটে যায়। ইতি নবমী [২৭] আশ্বিন ১৩৪৪

দাদা

২২৫

২৪ অক্টোবর ১৯৩৭

ওঁ

বেলঘরিয়া

কল্যাণীয়াসু

আমার শরীর সমান ভাবেই আছে। চিকিৎসা চলচে। চিকিৎসার মেয়াদ নবেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। জওহরলাল কাল দেখা করতে আসবেন মহাত্মাজি কবে আসবেন জানি নে। তোমাদের দুঃসময় চলচে এখন বোধ হয় এখানে তাঁদের দেখতে আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইতি ২৪।১০।৩৭

দাদা

২২৬

২৮ অক্টোবর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শ্রীনিকেতনের তাঁতের কাপড় তিনখানি তোমাকে পাঠালুম। ব্যবহার্য্য বলে গণ্য হলে খুশি হব।

তোমার যেদিন সুবিধা হয় আসতে পার। আমি তো তোমাকে নিষেধ করি নি। ২৮।১০।৩৭

দাদা

২২৭

৫ নভেম্বর ১৯৩৭

কল্যাণীয়াসু

আশীর্বাদীস্বরূপ সামান্য কিছু দক্ষিণা তোমাকে দিতে ইচ্ছা হোলো। যেমন খুশী ব্যবহার করলে আনন্দিত হব।

এখনি চলেছি শান্তিনিকেতন অভিমুখে। ইতি ৫।১১।৩৭

দাদা

২২৮

১৪ নভেম্বর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আশীর্বাদের স্বরূপ তোমাকে সামান্য কিছু পাঠিয়েছিলুম, তাতে তোমার অভাব মোচন হবে এমন অদ্ভুত কথা মনে করে দিই নি— তুমি খুশি হবে এই ছিল তার উদ্দেশ্য। কোনো আকারে তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা কোরো না আমার শরীরে কোনো উৎপাত উপসর্গ নেই, কিন্তু জড়তা আছে। মনটা কাজের ক্ষেত্র থেকে পলাতকা। সামান্য কোনো দায় উপস্থিত হলেই ভয় লাগে। অথচ সম্পূর্ণ নিরর্থক দিনযাপনও অবসাদজনক। ইতি ১৪।১১।৩৭

দাদা

২২৯

[২৮ নভেম্বর ১৯৩৭]

ওঁ

বেলঘরিয়া

কল্যাণীয়াসু

চিকিৎসার জালে আবার আমাকে টেনে এনেছে। শান্তিনিকেতনের আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্র, আমার ঘরের কাছের বাগানে এখনো সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে দু চারটে করে শিউলি ফুটছে, হিমঝুরি-বীথিকায় পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রাঙ্গণে আমার প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করে শালিখগুলো চঞ্চল হয়ে

লাফিয়ে বেড়াচ্চে, একটি পাটলবর্ণ গ্রাম্য কুকুর সেও আসে প্রসাদপ্রত্যাশায়, থেকে থেকে ইস্কুলের ঘণ্টা বাজে, পূর্বদিগন্তে রেলগাড়ি ধূমকেতু উড়িয়ে চলে যায়— যথেচ্ছ অবকাশের মধ্যে আমার আরামকেদারা আশ্রয় করে পড়ে থাকি— ভালো লাগে না ওখান থেকে সরে আস্‌তে। এখানে দেহে এক্‌স্‌রে প্রয়োগ করবে তিনদিন— আজ থেকে আরম্ভ মঙ্গলবারে সমাধা,— বুধবারে ফিরে যাব যদি কোনো বিঘ্ন না ঘটে। ইতি রবিবার
[২৮ নভেম্বর ১৯৩৭]

দাদা

২৩০

২৯ নভেম্বর ১৯৩৭

কল্যাণীয়াসু

তোমার পাঠানো ভোগের দ্রব্য পেলুম— যথাসাধ্য ভোগে লাগাব— সাধ্যের সীমা বেশিদূর নয়।

আজ আর খানিক বাদে যেতে হবে ডাক্তারের দরজায়— আলোকবাণ বর্ষণ হবে। কাল এই চিকিৎসার পালা শেষ হবে— কালই সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরব। এখানে মন বসচে না— শরীরও বিকল আছে— কিন্তু বিশেষ কোনো উপসর্গ নেই। আসলে এখানে আমার সর্বপ্রধান ব্যাধি হচ্চে নানা দাবী নিয়ে সমস্ত দিন লোকের ভিড়। আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে এখন তিনটে— এর মধ্যে ফাঁক ছিল না— এখন হেলান দিয়ে পড়েছি লম্বা কেদারায়।

আমার পূর্বের চিঠি হয় তো ইতিমধ্যে পেয়ে থাকবে। ইতি
২৯।১১।৩৭

দাদা

২৩১

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

অবসাদের ছায়াচ্ছন্ন তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি দুঃখবোধ করেছি। আমার বিশ্বাস তোমার এই মানসিক গ্লানি তোমার শারীরিক অস্বাস্থ্যেরই অনুবর্ত্তী। সংসারে সকলেরই ভাগ্যে মাঝে মাঝে দুর্যোগ ঘটে, অনেক সময়ে অবিবেচনাবশত কর্ম্মজালে গ্রন্থি পাকিয়ে তুলি— নানা কষ্টের কারণ নিজের ভিতরে এবং নিজের বাইরে আছে, এক এক সময়ে সমস্তটা মিলে ব্যাপারখানা জটিল হয়ে ওঠে— এ সমস্তকেই স্বীকার করে নিয়ে নিজের জোরেই নিজেকে সাংসারিক সংকট থেকে উদ্ধার করতে হয়— উদ্ধার বল্‌তে বাইরেকার সমস্যাকে সহজ করা নয়, নিজের ভিতরে সমস্যার সমাধান করা, অন্তরে দুঃখের ঠোকাঠুকিতেই আলোককে জ্বালিয়ে তোলা। নিজেকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে এ সমস্তই ক্ষণস্থায়ী কুহেলিকা, চিরকালের জ্যোতিষ্ক আছে দিগন্তে। যদি বলো আমার জোর নেই, দৃষ্টি নেই, আমি দুঃখকেই মান্‌তে পারি, দুঃখের অতীতকে মানবার মতো বীর্য্য

পাই নে— তাহলে কী আর বলব! বলব দুঃখ পাবেই, নালিশ করে তার অবসান হবে না।

আমি কোনো রোগের অধিকারে নেই, যে শারীরিক অপটুতা সেটা জরাজনিত। তাতে চলাফেরার পথ রোধ করেছে, মনের গতি বন্ধ করে নি— কখনো বই পড়ি, কখনো লিখি, কখনো পরিপূর্ণ নৈষ্কর্ম্ম্য উপভোগ করি। তোমার চিঠি থেকে মনে হয় তুমি কল্পনা করচ আমি কবিত্বলোকে চিরযৌবনধামে মধুপগুঞ্জনমুখর নববসন্তের দক্ষিণ সমীরণে পুলকিতদেহে স্বপ্ন-বিহ্বল হয়ে থাকি। চারিদিকে তার আভাসও দেখতে পাই নে। তোমার এই কল্পনার সত্যরূপ দেখবার জন্যে জন্মান্তরের অপেক্ষা করতে হবে,— জীবনসায়াহ্নে স্তিমিত দীপালোকে আপনার সঙ্গ নিয়ে আপনি আছি একা। ভালোই আছি, কোনো দায়িত্ব নেই, রসাভিষিক্ত চতুর্দশপদী কবিতা লেখবার দাবীও আসচে না কোনোখান থেকে— এ'কেই তো বলে মুক্তি।

আজ মাঘের আকাশ শ্রাবণের মুখোস প'রে আছে। বৃষ্টি নেই, কেবল নিবিড় ছায়া, আর ভিজে হাওয়া বইচে চারদিক থেকে। সূর্য্যালোকপিপাসু আমার মন ['।'] স্বাধিকারপ্রমত্ত ঋতুর এই অন্যায় ব্যবহার সইতে পারচি নে।

মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যাচ্চে— জানলার ধারে আমার কেদারাটা আশ্রয় করি গে। ইতি ৮।২।৩৮

দাদা

২৩২

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাজে কর্মে চিন্তায় জড়িত আছি। কলকাতা অভিমুখে যেতে হবে পয়লা মার্চে। আশ্রয় নেব বেলঘরিয়ায়। চিকিৎসার কিছু অবশেষ আছে। উৎপাত হয় তো চলবে কয়েক সপ্তাহ ধরে। তার পরে কিছু দিনের জন্যে আর কোনো নিভৃতে আশ্রয় খুঁজে নেব। ইতি ২৩।২।৩৮

দাদা

২৩৩

৬ মার্চ ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

৮ই তারিখে এখান থেকে যাত্রা করব। বেলঘরিয়ায় আশ্রয় নেব স্থির করেছি। চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে। দেহখানা বেমেরামৎ হয়ে পড়েচে— চোখে কম দেখচি, কানে কম শুনচি, কলম চলচে খুঁড়িয়ে, স্মৃতিশক্তির উপরে প্রদোষের ছায়া পড়েছে। ইতি ৬।৩।৩৮

দাদা

২৩৪

৯ মার্চ ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলকাতার দিকে আমার যাওয়ার বিঘ্ন ঘটেছে। কবে যেতে পারব তার নিশ্চয়তা নেই। যাতায়াতের ক্লান্তি স্বীকার করতে মন এখন অনিচ্ছুক। শান্ত হয়ে বসে নিভৃতে কিছু কাজ করতে ইচ্ছা করি। ডাক্তারের চিকিৎসার চেয়ে বিশ্রাম বেশি ফলদায়ক। ইতি ৯।৩।৩৮

দাদা

২৩৫

৪ এপ্রিল ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

হঠাৎ আমার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ঘটেছে— পড়তে এবং লিখতে কষ্ট হয়। এবার সর্বসম্মতিক্রমে আমার জন্মোৎসবের দিনস্থির হয়েছে ১লা বৈশাখে। বীরেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে ওঁদের কালিম্পঙের বাড়িটা ব্যবহার করবার সম্মতি নিয়েছি— জীর্ণ দেহ সংস্কারের জন্যে হিমগিরির আতিথ্যের প্রয়োজন ঘটেছে। ইতি ৪।৪।৩৮

দাদা

২৩৬

[এপ্রিল ১৯৩৮]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দৈবাৎ তোমার চিঠিতে এইমাত্র তোমার ঠিকানা পাওয়া গেল। তোমার জামাতাকে বোলো তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার একটা সম্পূর্ণ তালিকা জোড়াসাঁকোয় শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন— যথাস্থানে সে পাঠিয়ে দেবে। কাল রাত্রে কালিম্পঙ রওনা হব। কয়দিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম।

দাদা

২৩৭

[কালিম্পঙ] ৩০ এপ্রিল ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এখনো পর্যন্ত কালিম্পঙের দুর্নামের যোগ্য কোনো লক্ষণ দেখি নি। দার্জ্জিলিঙের চেয়ে ভালো যেহেতু শুক্‌নো, তাছাড়া ফ্যাসানের ফরমাসে যাদের বেশভূষা চলাফেরা তাদের ভিড় এখানে বন্ধ শিলঙের মতো এখানে কেরাণী ও কেরাণীদের প্রভুদের আবহাওয়া নেই। ভারতশাসনকর্ত্তাদের রথচক্রের ঘর্ঘর এখানে কানে আসে না। যাকিছু সমস্ত বেশ পরিমিত

মাত্রার, অশন বসন মেলে না যে তা নয় কিন্তু বড়ো দরের বাবুগিরির মাপে নয়। সব চেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য সে হচ্চে এখানকার এই বাড়ি, ঘরে ঘরে প্রচুর আলোর সংস্থান, বড়ো বড়ো দরজা জানলা আকাশের বিরুদ্ধে দরোয়ানি করে না— বাইরে তাকালেই দেখতে পাই গিরিরাজের সঙ্গে মেঘমালার নিরন্তর মিলনলীলা চল্‌চে। এ রকম উদার ব্যবস্থার বাড়ি পাহাড়ে সচরাচর মেলে না। আমার মতো শান্তিপ্রিয় আলোক-পিপাসু মানুষের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত, দুর্লভ বললেই হয়। বিশেষত এখানে গৃহস্বামীদের আগমনের বিশেষ তাগিদ নেই শুনেছি অতএব তাঁদের ভোগের অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করচি নে জেনে মন স্বস্তিতে আছে। কেসরবাইয়ের সম্বন্ধে অত্যন্ত অত্যুক্তি শুনেছিলুম বলে সেদিন সঙ্গীত উপভোগের কিছু ব্যাঘাত হয়েছিল। তুমি যদি নেপথ্যে সেখানে থেকে যেতে তাহলে তোমার বা অন্য কারো পরিতাপের কোনোই কারণ ঘটত না। তুমি মনে মনে কাল্পনিক বিঘ্ন রচনা করে অকারণে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ো বলে অনাবশ্যক দুঃখ বোধ করো। সেদিন গৃহস্বামিনী অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু তুমি তো তাঁর তিলমাত্র পথ রোধ কর নি। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৪৫

দাদা

২৩৮

[মংপু] ২২ মে ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কালিম্পঙের কাছাকাছি এক জায়গায় সিন্‌কোনা চাষের ক্ষেত্র। সেখানে মৈত্রেয়ীর স্বামী কাজ করেন। মৈত্রেয়ীর সনির্বন্ধ অনুরোধে এখানে এসেছি— ফেরবার পথ সে আটক করে আছে। বিধাতাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন— অকালে ঘোর বৃষ্টি নেমেছে— এ অবস্থায় পাহাড়িয়া পথে চলনের চেয়ে পতনের আশঙ্কাই বেশি। তবে কিনা জায়গাটি ভালো, বাড়িটি প্রাসাদবৎ, তা ছাড়া যত্নের সীমা নেই। উচ্চতায় এ জায়গাটা দার্জিলিঙের কাছে মাথা হেঁট করবার নয়। কালিম্পঙ কিছু রুক্ষ, তার বাইরের পাহাড় শ্রেণী পর্জন্যদেবের পথ আটকে আছে।

৮।২।৪৫

দাদা

ভ্রমক্রমে দুটো কার্ডের দু পিঠে এই ছোটো লিপিখানি লিখিত হয়েছে। রিক্তস্থান ভরাট করে দেবার মতো ঐশ্বর্য কলমের নেই।

বৌমা এখানে নেই— আমার সংসারের অধিকাংশই আছে কালিম্পঙে। আমার শরীর পূর্বের চেয়ে ভালোই।

[কালিম্পঙ] ৯ জুন ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কয়েকদিন মংপু পাহাড়ে ছিলুম। আজ ফিরচি কালিম্পং।

জায়গাটি মনোরম— সম্মুখের পাহাড়গুলির ব্যবহার অন্ত-রঙ্গের মত— অর্থাৎ তারা দূর আকাশের থেকে নিম্নতলবাসীদের প্রতি ভ্রূকুটিবিক্ষেপ করে না— তাদের উদার নীল বক্ষ প্রসারিত করে কাছাকাছি ঘিরে এসেছে— স্বীকার করচে তারাও পৃথিবীতে আমাদের প্রতিবেশী। এখানে ফুলের অভ্যর্থনাও চারদিকে অজস্র। দৃষ্টির ভোজ পেতে দেওয়া হয়েছে চারদিকে— দুঃখ এই দৃষ্টির উপর আবরণ নামচে। এটা বিধাতার অকৃতজ্ঞতা কেননা আমার চক্ষু সেই শিশুকাল থেকে তাঁর সৃষ্টিকে যে রকম বাহবা দিয়ে এসেছে এমন কোনো রূপকার কারো কাছ থেকে পায় নি— তাঁর রসরচনার এমন রসজ্ঞ সহজে মিলবে না সে আমি গর্ব করেই বলতে পারি। বোধ হচ্চে সব চেয়ে বড়ো পর্দাখানা পড়বার আগে সইয়ে নিচ্চেন। চোখের কুয়াষা ঠেলে কিছু কিছু লিখতে হচ্চে, কেননা কলমের অপযশ সইতে পারব না— অনেকদিন সে আমার ভাবের বাহনগিরি করে আসচে এখনো প্রস্তুত আছে— কিন্তু যে মন চালনা করেন সেই সারথির তেমন উৎসাহ নেই— তিনি বলেন ওস্তাদরা ঠিক সময় যেমন চলতে জানে ঠিক জায়গায় তেমনি থামতেও ভোলে না— এই

যথোচিত থামাটাও সৃষ্টিরও অঙ্গ। আজ এই পর্যন্ত ইতি ৯।৬।৩৮

দাদা

চিঠিতে ঠিকানা কেন লেখনা— আমার স্মৃতিশক্তি কি আমার দৃষ্টিশক্তির চেয়ে প্রবল।

২৪০

২ জুলাই ১৯৩৮

ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়াসু

কাগজে পড়েছ যে সর্বসাধারণের কাছে আমি বিশ্রাম কামনায় ছুটি চেয়েছি— তার থেকে তুমি কল্পনা করেছ যে এই সাধারণের মধ্যে তুমিও আছ। তুমি জানো তোমার চিঠি পড়তে আমার ভালই লাগে, যদিও আজকাল চিঠি লিখতে আমার কলম সরে না— সেটা আমার দুর্বলতা। যাই হোক কাল্পনিক আশঙ্কায় আমার প্রতি অন্যায় বিচার করে আমাকে দুঃখ দিয়ো না, এবং নিজের মনকে বৃথা পীড়িত কোরো না— আমার প্রতি বিশ্বাস রেখো। ইতি ২।৭।৩৮

দাদা

২৪১

[শান্তিনিকেতন] ৮ জুলাই ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

নাৎনী না হয়ে নাতির জন্মসংবাদে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হবার কারণ ঘটল কিন্তু নাতবৌয়ের সমাগমপ্রত্যাশায় মনকে সান্ত্বনা দেব। নবাগত এবং প্রসূতির পরে আমার আশীর্বাদ রইল।

অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে দেখি সবুজ সমুদ্রের ঢেউগুলি মেঘমেদুর আকাশের দিকে সকৃতজ্ঞ জয়ধ্বনি বিস্তার করে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। চোখ জুড়িয়ে গেল। কর্তব্য থেকে ছুটি নিয়েছি— এখানকার বনভূমির সঙ্গে নিভৃতে মোকা-বিলার কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

জুলাই মাসের অন্তে নগাধিরাজের অতিথিশালায় আমার নিমন্ত্রণ রয়েছে, সেখানে শরৎ ঋতু যাপন করব। পারি যদি, সপুত্রক বাসন্তীকে যাবার সময় সশরীরে আশীর্বাদ জানিয়ে যাব। ইতি ৮।৭।৩৮

দাদা

২৪২

[* শান্তিনিকেতন] ৮ অগস্ট, ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ভালই আছি কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ত আছি— একটুও বিশ্রামের সময় পাই নে। যে বিষয়টা লেখার ভার নিয়েছি সেটা কঠিন— ও দিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার জন্যে তাগিদ আসচে। তা ছাড়া এখানকারও অনেক দায়িত্ব আছে। অথচ মনটা ছুটি পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। কিশোরকান্ত নামটা আমি ময়মনসিংহ আভিজাত্যের মাপেই কল্পনা করেছিলুম— ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলুম। কবিতাটি আমার নিজেরই শুভ-কামনার ছাঁদে রচিত। ইতি ৮।৮।৩৮

দাদা

২৪৩

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

চিঠিপত্র কখনো লিখি কখনো লিখি নে। যখন লিখি সেটা দৈবাৎপাওয়া অবকাশে দৈবাতের খেয়ালে। ছুটি নিয়েছি— কিন্তু ছুটির মধ্যেও কখনো কখনো ফাঁক এসে পড়ে। তবু মোটের উপরে মনটা বিমুখ, কলমটা সত্যাগ্রহের ভয় দেখায়।

দেহযন্ত্রে যে তন্তুগুলোকে বলে nerves, সেতারের আল্‌গা তারের মতো তারা বাজতে চায় না, যদি বাজে সুরে বাজে না। অল্প কোনো ধাক্কাতেই আমার মনটাকে সরিয়ে দেয় আমার কর্মশালা থেকে। জানালার বাইরে ফুটেছে দোলনচাঁপা তার গন্ধে যখন ভরে ওঠে ঘরের আকাশ, তখন সেটা একটা ছুতো হয় মনকে বাইরে দৌড় করাতে। ইস্পাহানি গোলাপের গুচ্ছ এনে মালী সাজিয়ে দেয় ফুলদানিতে,— তখনি আধখানা লেখা লাইনের দায়িত্ব কাটিয়ে কলম ফেলে দিয়ে বল্‌তে ইচ্ছে করে, তবে থাক্। আমার ছায়াদেহী দলবল জুটেছে শরতের শিশির-ভেজা ঘাসের উপরে, ছেঁড়া মেঘের আলো ঢালা আকাশে ;— আমার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেওয়া সামাজিক মানুষটাকে কোনোমতে ফেলে দিয়ে এই ফুরফুরে হাওয়ায় মেঠো রাস্তা বেয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে পালামৌ কিম্বা তুম্‌কা জেলার দিকে। কিন্তু এ সমস্তই নিছক কবিত্ব। ছেলেবেলায় আমাকে গণ্ডি এঁকে জানালার কাছে বসিয়ে রাখত— আজও সেই গণ্ডি— জানলা একটা আছে, তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাই অগমকে অধরাকে— মনে মনে ভাবি গণ্ডি ভাঙবার সময় আসচে, তার পরে ?— জানি নে। ইতি ১৫।৯।৩৮

দাদা

২৪৪

৬ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

এবার কালিম্পঙ অভিমুখে চল্‌লুম। গরমে তাড়া করেছে। শনিবারে কলকাতায় পৌঁছব— সোমবারে যাত্রা করব। নড়বার ইচ্ছা ছিল না— কিন্তু স্থির থাকতে দিল না। ইতি ৬।১০।৩৮

দাদা

২৪৫

৫ নভেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার পুরাতন জন্মতিথির অন্তর হতে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠুক নব জন্ম, নব সফলতার প্রত্যাশা বহন করে নিয়ে এই কামনা করি। ইতি ৫।১১।৩৮

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪৬

[নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩৮]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির একটা উত্তর দিতে ভুলে গিয়েছিলুম। তত্ত্ব-বোধিনীতে ধর্ম সম্বন্ধে তুমি যেমন ইচ্ছা আলোচনা করতে পার— তাতে ক্ষতি নেই। সম্পাদক প্রেমানন্দ সজ্জন সচ্চরিত্র এবং ধর্মনিষ্ঠ। ইতি

দাদা

আমার কাছে নাচনের চিঠি এসেছিল সজনীর দৌত্যে— উত্তর গেছে তাঁরই হাত দিয়ে— দূত যদি সে চিঠি লোপ করেন তবে সে নালিশ তোমরা মিটিয়ো— শনিবারের চিঠিতে ওটা বের হবে ভাবিনি— মনে করেছিলুম ওটা অলকায় বেরবে।

২৪৭

১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সমস্ত পৃথিবীর হাওয়া আবর্তিত আবিল। মানবজাতির উপরে একটা অভিশাপ নেবেছে। এর মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও যদি অশান্তির ঘূর্ণিপাক দেখা দেয় তবে সেটাকে মেনে

নিতে হয়। তুমি বলচ সম্প্রতি তোমার জীবনে প্রশংসাও চলচে গালমন্দও জাগচে, এটা খুব খারাপ লক্ষণ নয়, এই অভিজ্ঞতার মধ্যেই আটাত্তর বছর কাটিয়ে দিয়েছি— শেষ পর্যন্তই কাটবে— নিরবচ্ছিন্ন সমাদর সত্য হয় না। ... ...র হাতে আমার লাঞ্ছনা কম হয় নি— আবার কিছু দিনের জন্যে বাঁক ফিরেছে, সম্মানের আশা হয়েছে— কিন্তু তাকে স্থায়ী বলে নিশ্চিন্ত হওয়া মূঢ়তা। নাই বা হোলো স্থায়ী। ভিতরের সত্য যদি মুখের কথার একটু গরম হাওয়া লাগলেই শুকিয়ে পড়ে, তাহলে সে সত্যই নয়, তার মরাই সদ্গতি। সংসার আমাদের প্রশ্রয় দেবে না আমরাও পদে পদে মাথা হেঁট করে তাকে সেলাম ঠুকব না। দেখচ তো ইংলণ্ড আজকাল শান্তিলাভের দুরাশায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কী রকম ল্যাজ নাড়চে— এই অপমানিত শান্তি টিঁকতে পারে না অথচ অপমানটা টিঁকবে। ভীরুর মত অসম্মানের সঙ্গে রফা করতে চাইব না, তাকে অগ্রাহ্য করলেই সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে।— এই মাত্র দেখা গেল যাকে বিশ্বাস করেছি আদর করেছি সে বিনা কারণে ফণা ধরে উঠেছে তাই বলে মনসার পূজো দিতে ছুটব না আমি যে শিবের পূজারি তাঁর জটার পাকে পাকে সাপ থাকে বাঁধা, কণ্ঠে মিলিয়ে যায় বিষ। ইতি ১৬।১২।৩৮

দাদা

২৪৮

২০ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সংসারে যাকে আমরা চেয়ে পাই নে সেও আমাদের ব্যর্থ করে না। না চাইতে পারাই হচ্চে মরুভূমির ধর্ম। সে মেঘের কাছ থেকে বর্ষণ চাইতে জানে নি, সে ভূমিমাতার কাছ থেকে কোনো বর প্রার্থনা করলে না— এতেই তার যথার্থ অকিঞ্চনতা, বেদনাহীন তার দৈন্য। জীবনে আমরা অনেক জিনিষ পাই আর অনেক জিনিষ চাই— দুইয়েতেই রক্ষা করে আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্রের সরসতা। নিজের অতীতের দিকে চেয়ে দেখলে দেখতে পাই কত প্রতিহত আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র বেদনা। বুঝতে পারি চাইবার প্রবল শক্তিতে প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করেছে— আত্মসৃষ্টির মধ্যে এই অভিজ্ঞতার আগুন একটা প্রধান উপকরণ। তোমার প্রাণের বীণায় তোমার ভাগ্য যদি মীড় দিয়ে থাকে কঠিন টানে, তাতে সমগ্র রাগিণীকেই পূর্ণতা দিয়েছে। আসলে ভাগ্যহীন সে-ই ভাগ্য যাকে নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্রয় দিয়ে অসম্মান করে। তারা অদৃষ্টের পুতুলনাচের পুতুল, যেমন সব আমাদের রাজাবাহাদুরের দল। আমি তো জানি কতবার আমি প্রাণান্তিক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু সেই আমার সৌভাগ্য। বিধাতা আমাকে অনেক দিয়েছেন কিন্তু আদর দেন নি ইতি ২০।১২।৩৮

দাদা

২৪৯

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুই একদিনের জন্যে শরীরটা বিগড়িয়ে ছিল সেই খবরটা অতিকৃত হয়ে খবরের কাগজে প্রচারিত হয়েছিল। এখন ভাল আছি। কিন্তু কলকাতায় যাবার মতো অবস্থা নয়। বসন্তকাল এইখানেই কাটবে— গাছপালার মধ্যে সেই অভ্যর্থনারই আয়োজন চলচে। ইতি ৪।২।৩৯

দাদা

২৫০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে ভয় কোরো না। মানুষের মনের সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি আছে। আমি নির্মমভাবে অবিচার করতে পারি নে। ভালোমন্দ নিয়ে সমাজে অনেক কৃত্রিম বুলির চলন আছে আমার কাছে তার মূল্য নেই। যা সত্য আমি তাকে স্বীকার করি।

দাদা

২৫১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কিছু কাল থেকে হাটে হাটে তোমার সাঁওতালি সাজের অলঙ্কার খোঁজাখুজি করচি— এখনো ফল পাই নি। ৭ই পৌষের মেলার সময় এই গয়নার আমদানি হয়। যাই হোক সন্ধান ছাড়ি নি।— বসন্ত উৎসব কাছে এসেছে— তাই নিয়ে সুরতরঙ্গে খেয়া দিতে হচ্চে— কাজটা ভালো লাগে বলে অবকাশ খোওয়ানোর অভিযোগে নালিশ করচি নে।

আমাকে উড়িষ্যার বর্তমান শাসন দরবার নিমন্ত্রণ করেছে। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তদুপলক্ষ্যে পুরীতে যাব স্থির হয়েছে।

দাদা

২৫২

২৩ মার্চ ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার ধারাবাহিক ব্যস্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তির ভার বেড়েই চলেছে। আগামী ১লা এপ্রেলে যাব কলকাতায়। থাকব দু চার দিন— হয় তো তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। ইতি ২৩।৩।৩৯

দাদা

২৫৩

২৭ এপ্রিল ১৯৩৯

ওঁ

পুরী

কল্যাণীয়াসু

জ্বর নিয়ে এসেছিলুম তার আক্রমণ ছেড়েছে। কিন্তু অকর্মণ্য হয়ে পড়ে আছি কেদারায়, দেখচি ঢেউয়ের লুটোপুটি, শুনচি তার কলধ্বনি, প্রবল হাওয়া দিন রাত্রিকে দিচ্চে নাড়া। মাঝে মাঝে ঘুমের আবেশ দেহটার উপরে গড়িয়ে যাচ্চে। কর্তব্যের দিগন্তসীমা বহুদূরে ফিকে হয়ে দেখা যাচ্চে। এখান থেকে নড়ব কবে জানি নে। ২৭।৪।৩৯

দাদা

২৫৪

১৮ মে ১৯৩৯

Mungpoo
Darjeeling
C/o Dr M. Sen

কল্যাণীয়াসু

তোমার পীড়িত কল্পনা তোমাকে বহুল পরিমাণে অনাবশ্যক কষ্ট দেয়। তোমার সম্বন্ধে আমি যদি উদাসীন হতে পারতুম তাহলে আমি তোমার এই বেদনাকে উপেক্ষা করতুম— কিন্তু জানি আমার সংসর্গে এসে তোমার জীবনের পুরাতন আশ্রয়

বিচলিত হয়ে গেছে তাতেই তোমাকে দোলায়িত করে দুঃখ দিচ্চে। তোমার সংস্কার তোমাকে আঁকড়ে আছে অথচ তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারচে না। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিকে অন্ধ করে রাখায় শ্রেয় নেই। বুদ্ধি যিনি দিয়েছেন তাঁকে অমান্য করলেই তবে ধর্মপালন সম্ভব হবে এমন বিশ্বাস মনুষ্যোচিত নয়। তাই তোমার দ্বিধান্দোলিত মনের পীড়ায় দুঃখ বোধ করি কিন্তু পরিতাপ করি নে। অন্যান্য অনেক মেয়ের মতো তোমার চরিত্রে মূঢ়তাই যদি মুখ্য হোত তাহলে তারি গর্তে চোখ বুজে থেকে সংশয়ের আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে— কিন্তু তোমার দীর্ঘকালের অন্ধ অভ্যাস সত্ত্বেও ধর্মমূঢ়তা তোমাকে অভিভূত করতে পারে নি এই দেখেই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আমার চিন্তা থেকে তোমাকে দূরে রাখতে পারি নি। পৃথিবীতে অনেক লোকেরই সংস্রবে আসতে হয় কিন্তু যথার্থ পরিচয় হয় অল্প লোকেরই সঙ্গে। তুমি এসেছ আমার পরিচয়মণ্ডলের মধ্যে— তাতে তুমি সুখ না পেতে পারো কিন্তু সে তোমার আত্মসম্মানের কারণ হয়েছে।— আমার শরীর পাহাড়ে এসে ভালোই হয়েছে। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

দাদা

২৫৫

২৯ জুলাই ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ব্যস্ত এবং ক্লান্ত আছি। মাঝে কলকাতায় যাবার সম্ভাবনা ঘটেছিল কিন্তু ফাঁড়া কেটে গেল। শীঘ্র যাবার আশঙ্কা নেই। বর্ষামঙ্গলের তালিম দিতে হচ্চে— তাছাড়া ডাকঘরের রিহর্সল। আজ শ্রাবণের দিন ঘন মেঘে অন্ধকার— সকাল থেকে নিরন্তর বৃষ্টি পড়চে— কোনো কাজের দায়িত্ব না থাক্‌লে এই রকম দিন অত্যন্ত মনোরম। ইতি ২৯।৭।৩৯

দাদা

২৫৬

২ অগস্ট্‌ ১৯৩৯

কল্যাণীয়াসু

তোমার ফলের অর্ঘ্য পেয়ে ভোগে লাগিয়েছি।

আকাশে শ্রাবণের ধারা অবারিত— এখানকার ডাঙা জমি পর্যন্ত জলে থৈ থৈ করচে— পুকুরের মাছ পালিয়েছে ধানের ক্ষেতে, সেখানেও মানুষের হাতে কৈ মাগুর মাছের নিষ্কৃতি নেই। জোর হাওয়া দিয়েছে। গাছে গাছে মহা দোলাদুলি— কোপাই নদী দুই তীর ডুবিয়ে দিয়ে খরধারায় ছুটে চলেচে।

বর্ষামঙ্গল অভ্যাসের পালা চলেচে। তুই একটা করে নতুন গানের সৃষ্টি এগোচ্ছে।

কলকাতায় হয় তো ২০শে নাগাদ একবার যেতে বাধ্য হব। এখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করে না। ইতি ২।৮।৩৯

দাদা

২৫৭

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার রচনাবলী আমি প্রকাশ করচি নে। বিশ্বভারতীর প্রকাশকসংঘ এর উদ্যোক্তা, সম্পূর্ণ এর কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে। এই বই যদি তুমি রাখ্‌তে ইচ্ছা করো রেখো— রাখবার পক্ষে যদি তোমার মনে কোনো দ্বিধা থাকে আমি তা জানতেও পারব না। ইতি ৪।৯।৩৯

দাদা

২৫৮

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সাহিত্যের ছেলেখেলার সময় উত্তীর্ণ হলে সেটাকে চির-স্মরণীয় করে রাখা শোভন নয়, যেমন শোভন হবে না বিশ

পঁচিশ বছর বয়সে তোমার নাচনের চোখের কাজল আর পায়ের ঘুঙুর লোপ করে না দেওয়া। বয়স হোলে ছেলেবেলা নেপথ্যে পড়ে যায় এইটেই নিয়ম— খোকার পরিচয়ে বয়স্ককে লাঞ্ছিত করা তার প্রতি সদ্ব্যবহার নয়। তুমি যাকে আদি রচনা বলো তার পিছনেও আদি আছে যেমন

কয়ে আকার কা

খয়ে আকার খা

গয়ে ইকার গি

ঘয়ে ইকার ঘি

এর ছন্দ ঠিক আছে অর্থেও দোষ হয় নি— কিন্তু এর প্রতিভাবান লেখক শিশুকে সাহিত্যসভায় কলরব করতে দেখলে মা সরস্বতীরও নারীহৃদয় বিগলিত হবে না, আমি তো এই রকম অনুমান করি। ইতি ৯।৯।৩৯

দাদা

২৫৯

২৪ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। এখানকার দিন এখন মেঘাচ্ছন্ন কুহেলিকাবগুণ্ঠিত নিবিড় শীতে আড়ষ্টপ্রায়। অসূর্যম্পশ্য হয়ে নিষ্কর্মা বসে আছি। ইতি ২৪।১০।৩৯

দাদা

২৬০

[? ডিসেম্বর ১৯৩৯]

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

জ্বরে পড়েছিলুম সেরে উঠেছি।

তোমার লেখার যে অংশ আমাকে পাঠিয়েছিলে তা প্রধানত বর্ণনা। তার মধ্যে আখ্যানের ঠিক আরম্ভ হয় নি। এর মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে কোনো ব্যক্তি কিম্বা কোনো শ্রেণী আঘাত পেতে পারে।

আমাকে মেদিনীপুরে অপহরণ করে নিয়ে যাবার চক্রান্ত হচ্ছে সে জন্যে চিন্তিত আছি। টানাটানি সহ্য করার যোগ্য বয়স পেরিয়ে গেছি— কিন্তু দোহাই পেড়ে লাভ নেই। ইতি

দাদা

২৬১

১৫ জানুয়ারি ১৯৪০

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ব্যস্ততায় জীর্ণতায় মিলে আমার সমস্ত অবকাশ অবরুদ্ধ করে রেখেছে— উদ্‌বৃত্ত সময়ের ছোটো বড়ো কাজগুলি সব স্থগিদ আছে। কর্ত্তব্যের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। সাধারণ-ভাবে স্বাস্থ্যের কোনো হানি হয় নি কিন্তু বার্দ্ধক্যের ভার

নিয়তই বহন করতে হয় এই অবস্থায় আমার প্রধান আশ্রয় ঘরের কোণ ও পা ছড়ানো কেদারা, এবং যথাসম্ভব নৈষ্কর্ম্য আমাকে একটু নড়ালেই বোঝা যায় আমার রথের স্প্রিঙ ভাঙা। ইতি ১ মাঘ ১৩৪৬

দাদা

২৬২

১৫ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

যে ক্লান্তি ও কর্মজালে জড়িত হয়ে আছি সেটা স্থায়ী হয়েই রইল এর মধ্যে কোনো পরিবর্তনের বৈচিত্র্য আশা করতে পারিনে। পা চলেছে অন্তিমের ঢালু রাস্তায় সমস্তটাই গড়ানে।

প্রমথর অনুরোধ রক্ষা করতে পারো যদি ভালোই হবে— গল্প একটা লিখো— কিন্তু ময়মনসিংহের যে ভাষার নমুনা দিয়েছ সে ভাষা অবলম্বন করলে সাংঘাতিক হবে। তোমার যে গদ্‌গদ-ভাষী প্রণয়ীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে বিরহাবস্থায় আছো তাকে তোমার গল্পের প্রধান নায়ক করলে লেখা সরস ও করুণ হতে পারবে। ইতি ১৫।৩।৪০

দাদা

২৬৩

২১ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার চোখের অবস্থা এখন এমন যে তোমার গল্পটি তুমি যে লিপিতে লিখেছ সে পড়ে ওঠা আমার পক্ষে অসাধ্য না হোক্ দুঃসাধ্য বটেই। তবু আধা অন্ধের মতো হাৎড়ে হাৎড়ে যতটা পড়েছি তাতে বুঝতে পারলুম যে রকম লেখায় তোমার সহজ দক্ষতা আছে এই গল্পে সেটা প্রকাশ পেয়েছে, ভালোই হবে।

ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট অসুস্থ হয়েছিলুম, তবু কাজ চালিয়ে চলেছি, কাউকে জানতে দিই নে কলমটা ধুঁকচে। ইতি ২১।৩।৪০

দাদা

২৬৪

১০ মে ১৯৪১

কল্যাণীয়াসু।

জরার প্রান্তসীমায় আমি আজ শয্যাগত। তোমরা যে অর্ঘ্য আজ আমাকে পাঠিয়েছ মুখে উপযুক্ত সমাদর প্রকাশ করতে পারলেম না। আনন্দ অন্তরে অব্যক্ত রইল। নিশ্চিত জানি তোমার কাছে তা অগোচর থাকবে না। তুমি আমার আশীর্বাদ-পূর্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করো। ইতি ১০।৫।৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লিখিত

পত্রসংখ্যা ১২

১৩ নভেম্বর ১৯২৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমাকে দেখ্‌তে চাও তার তো কোনো বাধা নেই— এক বাধা আমি প্রায়ই কলকাতায় থাকি নে— কখন যাব তাও নিশ্চিত বলতে পারি নে। তা হোক্‌ কলকাতায় গেলে হয় ত খবর পাবে— তখন অসঙ্কোচে আমার কাছে এসো। ইতি ২৭ কার্ত্তিক ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২৩ জুন ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ক্লান্তির বেড়া দেওয়া কাজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। একটু ফাঁক পাচ্চি নে। যদি পেতুম তাহলে আর কিছু না হোক,

এখানকার আকাশের সঙ্গে আর প্রান্তরের যে দিগন্তে দিগন্তে শ্যামল সরসতার সম্ভাষণ চল্‌চে সেই দিকে মন দিতে পারতুম। সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তোমার তীর্থদর্শন সার্থক হোক। একদিন ঐ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে পুরীর বেলাতটে লিখে-ছিলুম "হে আদিজননী সিন্ধু।" তখন বয়স অল্প ছিল। তোমার কবিত্ব চলচে তোমার সেতারে। তোমরা ভালো আছ শুনে খুসি হলুম। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৯ আষাঢ় ১৩৩৯

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

৩০ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ

খড়দহ

কল্যাণীয়েষু

তোমার তোলা ফোটোগ্রাফটি ভালোই হয়েছে। সই করে দিলেম।

আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১৩ কার্ত্তিক ১৩৩৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১৩ মে ১৯৩৩

ওঁ Glen Eden

Darjeeling

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

একটা কথা তোমাকে বলি, যেখানে আমার চরিত্রের সীমা তাকে অতিক্রম করে আমাকে যদি বাড়িয়ে দেখো তাতে ফল পাবে না। দুধে জল ঢেলে তার পরিমাণ বাড়িয়ে তুল্‌লে যে তার থেকে পুষ্টি বেশি পাওয়া যায় তা নয়। আমার যা কিছু পরিচয় তা নিঃশেষ হয়েছে আমার লেখায়। তার চেয়ে বেশি কিছু খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাদের দেশে প্রায় দেখ্‌তে পাই আমাদের একান্ত ইচ্ছার তাগিদে আমরা মানুষকে বাড়িয়ে বানিয়ে তুলি। আমাদের দেশে অনেক গুরুর উদ্ভব এই তাড়নায়। একান্ত প্রয়োজন বোধ করি বলেই চোখ বুজে নিজেকে ঠকাই। কোনোমতে একজন কাউকে আশ্রয় করতে পারলে বেঁচে যাই এই জন্যে বাংলাদেশে গুরুর বাজারদর এত বেশি বেড়ে গেছে।

আমি মানুষটা স্বভাবতই একা। নিজে নিজে চিন্তা করি, চেষ্টা করি, লেখায় প্রকাশ করি কিন্তু কাউকে চালনা করতে পারি নে। ছেলেবেলা থেকে সমাজ থেকে দূরস্থ বাড়িতে বাস করে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার আমার পক্ষে যথেষ্ট সহজ হয় নি। লোকে মনে করে সে আমার অহঙ্কার। কিন্তু আমার উপায় নেই।

যদি নিজগুণে তুমি আমার কাছে আস্‌তে পার, তবে আমার যতটুকু দেবার আছে সে হয় তো দিতে পারি। জানি নে সে তোমার প্রয়োজনের পক্ষে ঠিক জিনিষ কিম্বা যথেষ্ট কিনা। কিন্তু অগ্রসর হয়ে কিছু দিতে পারি এমন শক্তিই আমার নেই। আমার উপর নির্ভর কোরো না, আমি তোমার অগ্রবর্ত্তী নই, আমি তোমাদের সমান পথের পথিক।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৪০

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[শান্তিনিকেতন] ১২ অক্টোবর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম— আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। কলকাতার আবর্ত্ত থেকে দূরে গিয়ে নিশ্চয় শান্তিতে আছ। আমাদের এখানে অনেক কাল পরে এতদিনে শরতের প্রসন্ন শ্রী প্রকাশ পেয়েছে। বাতাসে শিশিরের আভাস এবং আলোতে কাঁচা সোনার রঙ লেগেচে। মেঘের দল আকাশে ঘোরাফেরা করে কিন্তু শ্রাবণের কালো উর্দ্দি খুলে ফেলেছে— দিগন্তের ধারে

ধারে জড় হয়ে অলসভাবে রোদ পোয়াচ্চে। ওদের এই নৈষ্কর্ম্যে যোগ দিতে ইচ্ছে করে— ছুটি মঞ্জুর হয় না।

আমার ঘরের প্রাঙ্গণে শিউলি মালতী এবং চামেলির উৎসব জমে উঠেছে— এখানে যেন শাদা আবিরের হোলি খেলা। এখনো পথের ধারে ও প্রান্তরে কাশগুচ্ছ দেখা দেয় নি— অকাল বর্ষার আড়ম্বরে চিনতে পারে নি তাদের সময় এসেছে।

এণ্ড্রুজ সাহেব এসেচেন—চিঠি বন্ধ করি। ইতি ১২ অক্টোবর ১৯৩৩

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২১ মে ১৯৩৪

ওঁ

পানাদৌরা

সিংহল

কল্যাণীয়েষু

রবীন্দ্রজয়ন্তীর বিবরণ পেলুম। আমার পরে তোমাদের শ্রদ্ধা অকৃত্রিম, তার পরিচয় পেলে খুসি না হয়ে থাকতে পারি নে, কিন্তু মনে মনে, এই রকম প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে, আমি সঙ্কোচ বোধ করি। বোধ হয় তার একটা কারণ, আমি স্বভাবত আনুষ্ঠানিক নই, আমি আপনার মধ্যে অত্যন্ত একলা। ছেলে-বেলা আমি সঙ্গ পাই নি, সেই অভ্যাস আমার মর্ম্মগত হয়ে

গেছে, সেই জন্যে আমি স্বয়ং সশরীরে অনুপস্থিত থাকলেও আমাকে কোনো উপলক্ষ্যে জনতার মধ্যে আলোচনার বিষয় করলে কুণ্ঠিত হই। বোধ হয় আর একটা কারণ এই যে এ রকম অনুষ্ঠানকে অনেকখানি অবাস্তব দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। আমাকে শ্রদ্ধা যাঁরা করেন তাদের সংখ্যা পরিমিত, যাঁরা করেন না বহুল পরিমাণে তাঁদের দিয়ে সভা ভরাট করতে না পারলে আসর জমে না।

বয়স আমার ৭৩ পেরোলো। এত দিন ধরে বাহির থেকে নিজের সম্বন্ধে ভালো মন্দ অনেক শুনেচি— নিজের মধ্যেও ভালো মন্দর দ্বন্দ্ব যথেষ্ট আছে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন স্বভাবতই নিজের সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য ছিল, এখন ক্লান্তি এসেচে, এখন নিজেকে নিয়ে তোলাপাড়া করতে আর ভালো লাগে না— এখন চুপচাপ করে ছায়ালোকখচিত তরুবীথিকায় মৃণ্ময়ী পৃথিবীর আতিথ্য ভোগ করতে ইচ্ছে করে। আমি কবি কি অকবি ভালোলোক কি মন্দলোক কী হবে সেই বিচার বিতর্কের উত্তেজনায়— নানা ভুলের মধ্যে ভালোব মধ্যে দিয়ে আমার কাজ তো শেষ করেছি— এখন চল্‌লুম নেপথ্যে— হাততালির শব্দটা অনাবশ্যক বোধ হয়। কর্ম্মের শেষ দণ্ড পুরস্কার দেবে ভাবীকাল, তখন তো উপস্থিত থাকবো না— তার পূর্ব্বে থেকেই যত দূর সম্ভব নিরাসক্ত হতে পারাই ভালো। আমার কাজের মধ্যে যেটুকু অংশ মহাকাল দক্ষিণ হাতে তুলে নেবেন সে তাঁরি মর্‌জি, তা নিয়ে আমার আর কোনো কর্ত্তব্য নেই, ভিড়ের লোকের নিন্দা প্রশংসারই বা মূল্য কতটুকু? বেঁচে থাক্‌তে যে কয়জনের

কাছ থেকে সত্যকার শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেয়েছি তাদেরই দান নিলেম বুকে তুলে বাকি থাক্ পড়ে। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ২১ মে ১৯৩৪

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

আডিয়ার

মাদ্রাজ

কল্যাণীয়েষু

আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। মাদ্রাজে এসে অবধি অভিবাদন প্রত্যভিবাদন বক্তৃতা প্রভৃতি চলচে। লোকের ভিড়ে পরিবেষ্টিত হয়ে আছি। অভিমন্যুর মনের ভাব কতকটা আন্দাজ করতে পারি। অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত এখানকার পালা চল্‌বে। এখন পূজোর ছুটি, কিন্তু আমার ছুটি সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে এই আবর্ত্তের মধ্যে। ইতি ২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

৯ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। তোমার মামা এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে— খুব আসর জমিয়েছিলেন— তাঁর বক্তৃতা সকলের ভালো লেগেছিল।

তুমি আমি উভয়েই যখন কলকাতায় সম্মিলিত হব সেই সুযোগে তোমার সেতার শুনতে পাব এই আশা রইল।

যন্ত্রসঙ্গীত শেখাতে পারে এমন কোনো লোকের সন্ধান তোমার আছে? যন্ত্রের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মাদকের অভ্যাস থাকলে চলবে না।

আমার শরীর প্রায় অচল অবস্থায় আছে। ইতি ২২ আশ্বিন ১৩৪২

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

২৬ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমরা উভয়ে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো, বাসন্তীকেও জানিয়ো।

শরীর অত্যন্ত উৎপীড়িত হওয়াতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি। নানা লোকের নানাবিধ দাবী আমাকে আক্রমণ করেছিল। তোমার সেতার শোনবার জন্যে সবুর করতে পারলুম না। কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ—ভবিষ্যতের সীমা নেই। ইতি ২৬ অক্টোবর ১৯৩৬

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুশি হলুম। ধর্ম্মের যে দিকটা বিশুদ্ধভাবে আধ্যাত্মিক, সেখানে ধর্ম্ম স্বপ্রতিষ্ঠ। যে দিক প্রাকৃতিক সে দিকে ইতিহাস বা বিজ্ঞানের বিচার চলবেই। যেখানে খৃষ্ট ভক্তের খৃষ্ট সেখানে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদে মহীয়ান, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নেই— কিন্তু যেখানে জেরুসালেমে তাঁর জন্মকথা কীর্ত্তিত হয়েছে সেখানে তাঁর জন্মবিবরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বিচার মান্‌ব, মান্‌লেও তাঁকে খর্ব্ব করা হয় না। বুদ্ধ সম্বন্ধেও সেই একই কথা ; বুদ্ধ যে পূজনীয় তার কারণ এ নয় যে তাঁর ইতিহাস অতিপ্রাকৃত, তার কারণ তাঁর চরিত্রমহিমা অলোকসামান্য। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণী মহীয়সী, ইতিহাস যদি বলে ব্যাধের হাতে তাঁর

মৃত্যু হয়েছিল তাতে কিছু আসে যায় না। আধ্যাত্মিক গৌরব আত্মায়, আধিদৈহিকে নয়। খৃষ্ট সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন বিজ্ঞান এ কথা অস্বীকার করলেই যদি ভক্তের ভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় তবে সে ভক্তি ছেলেমানুষী। আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভক্তেরা ভগবানের অবতার বলে ধরে নিয়েছেন, তাই বলে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুঘটনা এবং তাঁর প্রতিদিনের দেহ-যাত্রায় অলৌকিকত্ব আরোপ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ভক্তের আবদার রক্ষা করতে বা বিপদ থেকে রক্ষা করতে হঠাৎ বারো ঘণ্টার দিনকে আঠারো ঘণ্টা করেছেন বা করতে পারেন বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে ঈশ্বরকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয় না। ছেলে ভুলিয়ে যে সব ভক্তের ভক্তি উদ্রেক করতে হয় তাদের ভক্তির কোনো মূল্য নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে মান্‌লে ভক্তিকে খর্ব্ব করা হয় না তার কারণ এই যে সেখানে বিজ্ঞানেই ঈশ্বরের প্রকাশ— সর্ব-শক্তিমান আপনার প্রকাশের আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন না, যেমন আত্মহত্যা করা তাঁর সাধ্যের অতীত। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের যাথার্থ্য মানা তাঁরই যাথার্থ্য মানার অঙ্গ— বিজ্ঞান-বিরোধিতা নাস্তিকতা, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক— বিজ্ঞানেই তাঁর লীলা, অবৈজ্ঞানিক ছেলেমানুষীতে নয়। ইতি
৮ পৌষ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হলুম। ধর্ম্মের যে দিকটা বিশুদ্ধভাবে আধ্যাত্মিক, সেখানে ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ। যে দিক প্রাকৃতিক সেদিকে ইতিহাস বা বিজ্ঞানের বিচার চলবেই। যেখানে খৃষ্ট ভক্তের খৃষ্ট সেখানে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদে মহীয়ান, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নেই — কিন্তু যেখানে জেরুসালেমে তাঁর জন্মকথা কীর্ত্তিত হয়েছে সেখানে তাঁর জন্মবিবরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বিচার মানব, মানলেও তাঁকে খর্ব্ব করা হয় না। বুদ্ধ সম্বন্ধেও সেই একই কথা; বুদ্ধ যে পূজনীয় তার কারণ এ নয় যে তাঁর ইতিহাস অতিপ্রাকৃত, তার

বিজ্ঞান বিরোধিতা
মাধুর্য্যতায়, কর্ম্ম সুখ, দুঃখবরের
মুক্তি বৈজ্ঞানিক — বিজ্ঞানেই তাঁর
লীলা, অতিপ্রাকৃত জন্মোপাখ্যানটি নয়। ইতি ৮ পৌষ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কারণ তাঁর চরিত্র মহিমা অলোকসামান্য। ভাগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মহাবাণী মহীয়সী, ইতিহাস যদি বলে ব্যাধের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তাতে কিছু আসে যায় না। আধ্যাত্মিক গৌরব মাহাত্ম্য, আধিভৌতিক নয়। খৃষ্ট সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন বিজ্ঞান এ কথা অস্বীকার করলেই যদি ভক্তের ভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় তবে সে ভক্তি ছেলেমানুষী। আধুনিক কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভক্তেরা ভগবানের অবতার বলে ধরে নিয়েছেন, তাই বলে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ঘটনা এবং তাঁর প্রতিদিনের দেহযাত্রায় অলৌকিকত্ব আরোপ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ভক্তের মাথার রক্ষা করতে বা বিপদ থেকে রক্ষা করতে হঠাৎ মাঝে মাঝে দিনকে আটকে ধরেছেন বা করতে পারেন বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে ঈশ্বরকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয় না। ছেলে ভুলিয়ে যে সব ভক্তের ভক্তি উদ্রেক করতে হয়, তাদের ভক্তির কোনো মূল্য নেই। বিজ্ঞানের কোনো সিদ্ধান্তকে মানলে ভক্তিকে খর্ব করা হয় না তার কারণ এই যে সেখানে বিজ্ঞানেই ঈশ্বরের প্রকাশ — সর্বশক্তিমান আপনার প্রকাশের একান্ত প্রতিবাদ করতে পারেন না, যেমন আত্মহত্যা করা তাঁর সাধ্যের অতীত। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের যথার্থ মানা তাঁরই যথার্থ মানার অঙ্গ —

১১

৩০ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত অসময়ে এসেছিলে। কেবল যে আঘাটায় উত্তীর্ণ হয়েছিলে বলেই সেটা পরিতাপের বিষয় হয়েছিল তা নয়। দেশের যত সব পোলিটিকাল জনতার আবর্জনা স্তূপাকার হয়ে জমেছিল— শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাদের দরদের কোন যোগ নেই তারা ছুটির কন্‌সেশনের ধূলিআবর্তে এখানকার আকাশ আবিল করে জুটেছিল, শস্তায় কৌতূহল মেটাবার জন্যে।

আজকাল মাঝে মাঝে বৈকালিক দুর্গ্রহ আমার দেহ আশ্রয় করে। সেদিন ঘটল তাই— ব্যাপারটা গুরুতর নয়। রক্তের তাপ একশোর প্রান্তে এসে উঁকি মেরে যায় কিন্তু দুর্বলতা চাপিয়ে রাখে। এই সব উপদ্রবে কাজে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ধরে যায়। তাই ভাবচি পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান চুকিয়ে দিয়ে গিরিরাজের আশ্রয় নেব।

তোমাদের সঙ্গে একটা কথা নিষ্পত্তি করে নিতে চাই— কোনো একটা শান্ত সময়ে শান্তিনিকেতনের পরিচয় নিয়ে যেয়ো।

ইতিমধ্যে একজন মুসলমান অতিথি এখানে এসেছিলেন তিনি এখানকার সম্বন্ধে তন্ন তন্ন আলোচনা করে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন। পড়ে খুশি হয়েছি। কখন তিনি এমন সর্বাঙ্গীণ পরিচয় নেবার অবকাশ পেলেন জানি নে।

৩০।৩।৪০

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

[১০ মে ১৯৪০]

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

শরীর ক্লান্ত, মন ক্লিষ্ট। তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১৭ [২৭] বৈশাখ ১৩৪৭

স্নেহাবদ্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শ্রীমতী বাসন্তীদেবীকে ও

শ্রীনিখিলচন্দ্র বাগচীকে লিখিত

পত্রসংখ্যা ৩২ ও ১

২৭ জুন ১৯৩১

ওঁ

দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়া বাসন্তী

"জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি গো জানি তাও হয় নি হারা"—

গানটি আমার তাতে সন্দেহ নেই। এর স্বরলিপি কোথায় প্রকাশিত হয়েছে এখান থেকে নিশ্চিত বল্‌তে পারচি নে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে সন্ধান করে তোমাকে জানাব। আমি সুর রচনা করি, সুর ভুলি, স্বরলিপি করতে জানি নে। আমার জীবনে যত সুর বেঁধেচি তার অনেকগুলিই হয়েচে হারা— যারা শিখেচে এবং লিখেচে, আমার প্রয়োজন ঘটলে তাদের কাছ থেকেই আমার নিজের গান পুনরায় সংগ্রহ করে নিতে হয়। তোমার অনুরোধ শুনে বোধ হচ্চে, স্বরলিপি থেকে তুমি আপন কণ্ঠে গান তুলে নিতে পারো, সকলে ঠিকমতো পারে না। সুরটা পাওয়া যায় কিন্তু লয়টা ঠিক ধরা অনেকের পক্ষে কঠিন।

আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১২ আষাঢ় ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ জুলাই ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার মা আমাকে দাদা বলেন অতএব তুমি যদি মামা বলো তাহলে অসঙ্গত হবে না। একদা তোমার বয়সী একটি বালিকা আমার পিতৃদত্ত নাম বদলিয়ে দিয়ে নূতন নামকরণ করেছিল কিন্তু আমি যদিও খ্যাতনামা হবার উপদ্রব সহ্য করতে বাধ্য হয়েচি তবু বহুনামা হবার ইচ্ছে করি নে। তথাপি বিশেষ কোনো ডাকনাম তুমি যদি নিজে পছন্দ করে নিতে পারো আমি বিনা আপত্তিতে সেটা স্বীকার করে নেব— কিন্তু শ্রুতিকটু হয় না যেন। যে নাম নিয়ে সংসারযাত্রা সুরু করেছিলেম ধরাতলে সেটা একমাত্র আমারি ছিল, আজ ও নামটা অত্যন্ত সুলভ হয়ে গেছে— নামধারীরাও সকলেই যে স্বনামধন্য হয়েছেন তা নয়। সেই জন্য আমার আকাশের মিতার অনুসরণ করে রবিঠাকুর নামটা স্বীকার করে নিয়েছি, আমার স্পর্দ্ধা দেখে আকাশের রবিঠাকুর প্রচুর হাস্য করেন কিন্তু তাতে প্রসন্নতার অভাব লক্ষিত হয় না। আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

১ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। চিঠি লিখতে পারেন না বলে তোমার মা যেন কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা বোধ না করেন। সাধনের পথ সম্বন্ধে আমি অনেক কথা ভেবেছি এবং নিজের মনে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করেচি। কিন্তু তোমার মা যে পথ আশ্রয় করে শান্তি ও আনন্দ পান তার থেকে তাঁকে বিচলিত করার ইচ্ছা আমার মনেও হয় না। সত্যকে যে ভাবে স্বীকার করে নিয়েচেন সেটাতে তাঁর স্বভাবের সম্মতি আছে; তার থেকে স্খলনে তাঁর অপরাধ আছে বলে আশঙ্কা করেন। অতএব সত্যকে সেই বিশেষ সীমার মধ্যেই তিনি গ্রহণ করুন, তার বাইরে আসতে গেলে হয় তো তাঁর ক্ষতি হতে পারে। যে কোনো দিকেই মানবচিত্তের উৎকর্ষ, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, সব দিকেই আমাদের মন্দিরের দ্বার; সব দিক দিয়েই আমাদের অর্ঘ্য পৌঁছিয়ে দিতে হবে, নইলে আমাদের মানবাত্মার যিনি অধীশ্বর তাঁকে বঞ্চিত করা হবে— সুতরাং সেই সাধনার সঙ্কীর্ণতায় নিজেরাই দুর্গতিগ্রস্ত হব। জ্ঞানকে যদি খর্ব্ব করি, কর্ম্মকে যদি পঙ্গু করি, তবে একমাত্র ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলে আমাদের পরিত্রাণ নেই এ কথা আমি নিশ্চিত জেনেচি, সুতরাং এ কথা আমাকে জানাতেও হবে— কিন্তু গুরু হয়ে উঠে কাউকে মানাতেই হবে এমন আমার স্বভাব নয়। এক এক সময়ে আমার মনে হয় যে আমি পুরুষ বলেই এই সমগ্রমানবচিত্তের

সম্পূর্ণ পূজাকেই সত্য বলে সহজে উপলব্ধি করি। হৃদয়বৃত্তিই মেয়েদের স্বভাবে একান্ত প্রবল, এই জন্যে যে সাধনায় আর সমস্তকেই তিরস্কৃত করে একমাত্র ভক্তিবৃত্তিরই পরিতৃপ্তিকে বড়ো করে তোলা হয় মেয়েদের পক্ষে সেটাই হয় তো সহজ। তাই ভাবি মেয়েদের পূজা আরাধনায় ভক্তি ছাড়া মানবপ্রকৃতির অন্য সমস্ত ঐশ্বর্য্যই যদি বর্জ্জিত হয় তবে সেটা অগত্যা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া হয়ত উপায় নেই। কিন্তু মানুষের এই সব ঐশ্বর্য্য কার দেওয়া ? যিনি দিয়েচেন তাঁর কাছেও কি এর আদর নেই ? আমাদের দেশে পূজায় বিদেশী ফুল অব্যবহার্য্য, কিন্তু সে ফুল ফুটিয়েছেন কে ? ভক্তরা যদি তাকে অবমাননা করে তবে সেটা পৌঁছয় কোথা ? ঠাকুরকে আমরা যে অলঙ্কার দিই তার রত্নগুলি ঠাকুরেরই সৃষ্টি ; আমাদের পূজা তাঁকে ভূষণ পরায়,— সেই ভূষণের রত্নগুলি আমাদের মনে, সে তো একটি রত্ন নয়। যত রত্ন সাজাতে পারব ভূষণের মূল্য ত ততই বেশি হবে— অর্থাৎ পূজার ষোড়শোপচার ত ততই পূর্ণ হবে। রামচন্দ্রের পূজায় একশো পদ্ম থেকে একটি পদ্ম কম পড়েছিল বলে বিপত্তি ঘটেছিল। মানবপ্রকৃতিতেও একশো পদ্মই আছে, সবগুলিই পূজায় লাগে। কে বলবে তার নিরেনব্বইটাকে বাদ দিলেই ভগবানকে খুসি করা হবে ? তবে তিনি এত অপব্যয়ের আয়োজন করেচেন কেন ?— চিঠি লেখার সময় করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয় সেই জন্যে বলে রাখচি চিঠি লিখ্‌তে পারি বা না পারি তোমার জন্য আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি ১৬ শ্রাবণ ১৩৩৮

মামা

ওঁ ৩

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। চিঠি লিখতে পারবে না বলে তোমার মা যেন কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা বোধ না করেন। সাধনের পথ সম্বন্ধে আমি অনেক কথা ভেবেছি এবং নিজের মনে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করেছি। কিন্তু তোমার মা যে পথ আশ্রয় করে শান্তি ও আনন্দ পান তার থেকে তাঁকে বিচলিত করার ইচ্ছা আমার মনেও হয় না। সত্যকে যে ভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন সেইখানে তাঁর স্বভাবের সম্মতি আছে; তার থেকে সরালে তাঁর আত্মারই আঘাত দিলে অমর্য্যাদা করব। অতএব সত্যকে সেই বিশেষ সীমার মধ্যেই তিনি গ্রহণ করুন, তার বাইরে আনতে গেলে হয়তো তাঁর ক্ষতি হতে পারে। যে কোনো দিকেই মানবচিত্তের উৎকর্ষ, জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, সব দিকেই আমাদের মুক্তির দ্বার; ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ সব দিক দিয়েই আমাদের মধ্যে পৌঁছতে দিতে হবে, নইলে আমাদের মানবাত্মার নিত্য অধীশ্বর তাঁকে বঞ্চিত করা হবে — সুতরাং সেই সাধনার সংকীর্ণতায় নিজেরাই দুর্গতিগ্রস্ত হব। জ্ঞানকে যদি খর্ব্ব করি, কর্ম্মকে যদি পঙ্গু করি, তবে অন্যত্র ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলে আমাদের পরিত্রাণ নেই এ কথা আমি নিশ্চিত জেনেছি, সুতরাং এ কথা আমাকে মানতেই হবে — কিন্তু তুমি হয় উভয়কে মানাতেই হবে এমন আমার স্বভাব নয়। এক এক সময় আমার মনে হয় যে আমি

পুরুষ বলেই এই সমস্ত মানবচিত্তের সম্পূর্ণ পূজাকেই সত্য বলে সহজে উপলব্ধি করি। হৃদয়বৃত্তিই মেয়েদের স্বভাবে একান্ত প্রবল, এই জন্যে যে সর্ব্বদাই আর সমস্তকেই তিরস্কৃত করে একমাত্র ভক্তিবৃত্তিরই পরিতৃপ্তিকে বড়ো করে তোলা হয় মেয়েদের পক্ষে সেইটেই হয় তো সহজ। তাই ভাবি মেয়েদের পূজা আরাধনায় ভক্তি ছাড়া মানবপ্রকৃতির অন্য সমস্ত ঐশ্বর্য্য যদি লজ্জিত হয় তবে সেটা অগত্যা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া হয়তো উপায় নেই। কিন্তু মানুষ এই সব ঐশ্বর্য কার দেওয়া? যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছেও কি এর আদর নেই? আমাদের দেশে পূজায় বিদেশী ফুল অস্পৃশ্য, কিন্তু সে ফুল ফুটিয়েছেন কে? ভক্তরা যদি তাকে অবজ্ঞা করে তবে সেটা তাঁদেরই দোষ? ঠাকুরকে আমরা যে অলঙ্কার দিই তার অনুপাতে ঠাকুরকেই সাজাই; আমাদের পূজা তাঁকে ভূষণ পরায়, — সেই ভূষণের রত্নগুলি আমাদের মনের, সে তো একটি রত্ন নয়। যত রত্ন সাজাতে পারব ভূষণের মূল্য ও ততই বেশি হবে — সর্বাঙ্গ পূজার আয়োজনও ততই পূর্ণ হবে। রামচন্দ্রের পূজায় একশো পদ্ম থেকে একটি পদ্ম কম পড়েছিল বলে বিপত্তি ঘটেছিল। মানবপ্রকৃতিতেও একশো পদ্মই আছে, সবগুলিই পূজায় লাগে। কে বলবে তার বিবেকবুদ্ধিটাকে বাদ দিলেই ভগবানকে খুসি করা হবে? তবে তিনি এত অপব্যয়ে আয়োজন করেছেন কেন? — চিঠি লেখার সময় তো আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয় সেইজন্যে মনে রাখবি চিঠি লিখতে পারি বা না পারি তোমার জন্য আশীর্বাদ রইল। ইতি ১১ শ্রাবণ ১৩৩৮

দাদা

৪

১১ অক্টোবর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, শরীর যে ভালো আছে এমন কথা বল্‌তে পারি নে। অথচ কাজকর্ম্ম করতে হয়। শরীরের উপর জবরদস্তি করেই করি। সময়ও পাইনে বিশ্রামও পাই না। তাই স্থির করেচি দার্জ্জিলিং যাব। সেখানে আমার বৌমা আছেন এবং নন্দিনী নামে একটি নাৎনি আছে। তাকে পুপে বলে সবাই ডাকে। তার বয়স দশ। আমাকে গল্প বলিয়ে খুব খাটিয়ে নেয়। কাল তার একখানি চিঠি পেয়েছি— আমাকে ডেকে পাঠিয়েচে। সুতরাং যেতেই হবে। ইতি ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮

মামা

৫

১৯ ডিসেম্বর ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার মা যে অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে লেখেন সে আমি জানি। তোমার সম্বন্ধে অত্যুক্তিগুলি আমি বাদসাদ দিয়েই নেব। আমার কথাও তিনি কম বানিয়ে তোলেন নি। সে জন্যে মাঝে মাঝে ক্ষমাও চান। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন

নেই— কেননা যাদের সাহিত্যিক ধাত, বানিয়ে বলাই তাদের ব্যবসা— আমিও এ কাজ অনেক করেছি। আমার মুষ্কিল এই, তোমার মায়ের হাতে যত সময় তার এক অংশও আমার নেই, যদি থাকত তাহলে ঐ বানিয়ে তোলবার কাজে তাঁর উপরে আমিও শোধ তুলতুম। হয় তো কোনো এক সময়ে আমারও দিন আসবে।

অসম্ভব রকম ব্যস্ত আছি। তুমি বলেই চিঠি লিখলাম। তোমার মাকে তো কিছুদিনের মতো নিষ্কৃতি জানিয়ে রেখেচি।

তোমার মাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে জানিয়ো, আমার জন্মমুহূর্ত্তটা কি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজন য়ুরোপীয় গণক আমাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছে। তোমার মা নাড়ী নক্ষত্রের খোঁজ খবর রাখেন বলেই এই প্রশ্ন।

তোমার মাকে একটা খবর জানিয়ো— আমার এক প্রদৌহিত্রী তাঁর নিজের সৃষ্ট পদ্ধতিমতো চাপড়ঘণ্ট রেঁধে আমাকে খাইয়েচে তার অধিক আর কিছু বল্‌তে ইচ্ছে করি নে। আমার ভোজনস্থানে নিশ্চয় শনির দৃষ্টি পড়েচে। ইতি
৩ পৌষ ১৩৩৮

স্নেহাশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯৩১-৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, পিঠে পেয়ে খুসি হলুম। আমার জ্বর কাল থেকে ছেড়েচে। দুর্ব্বলতা দেহের উপর চেপে বসেচে। বোধ হয় পর্শু দিন খড়দহে গঙ্গার ধারের বাগানে যাব। তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি পৌষ ১৩৩৮

মামা

৭

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে তুমি যে দুটি গান পাঠিয়েছ সে দুটোই বড়ো এলো-মেলো— তার মধ্যে অর্থসঙ্গতি নেই। তুমি যদি আমার সামনে থাকতে তোমাকে, লাইন ধরে ধরে বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করতুম। পারতে না। হয় তো সুরে শুনতে ভালো লাগে। তেলেনা গানও তো মন্দ লাগে না, অথচ তোম্ তানানানার কোনো মানে নেই।— আমি হয় ত আর দু' তিন দিনের মধ্যেই কলকাতার দিকে যাব। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

মামা

৮

১১ মার্চ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি হয়ত আমার দেওয়া সেই কলমেই আমাকে লিখেচ। তাহলে আমার লক্ষ্মীছাড়া কলমটা তোমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেচে, কৃপণতা করেনি— খুসি হলুম। কিন্তু ওর অবস্থাটা কতকটা আমারই মতো— খানিকটা কাজ করতে পারে তার পরেই ওর শক্তি ফুরিয়ে যায়। স্মৃতিচিহ্নরূপে বাক্সতে তুলে রাখবার কাজই ওকে সব চেয়ে মানায়— লেখার চেয়ে বিশ্রাম করার দিকেই ওর ঝোঁক। ওর আরো একটি গুণ আছে, তোমার দাদার কলমের সঙ্গে যদি ভুল করে বদল করো তাতে তোমার লাভ ছাড়া লোকসান নেই। পরীক্ষা করে দেখতে পার। এখানে এসে চুপচাপ আছি— রবিঠাকুরের পাঁচালি একেবারে বন্ধ। ইতি ২৭ ফাল্গুন ১৩৩৮

মামা

৯

[শান্তিনিকেতন] ২০ মার্চ ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যস্ত তাই তোমাদের চিঠি লিখ্‌তে পারি নে। যেখানে তোমার মন প্রসন্ন থাকে

নিশ্চয়ই সেখানেই তুমি থাকবে— তোমার মা তো একলাই যেতে পারেন। নিজের ইচ্ছের বন্ধনে অন্যকে বাঁধা কিছুতেই ভালো নয়। যেখানে কর্ত্তব্যের দাবী অপরিহার্য্য সেখানকার কথা আলাদা। অনিচ্ছুক সঙ্গিনীকে হরণ করে না নিয়ে গেলে তোমার মা আরো আরামে থাকতে পারবেন।

বিশেষ কারণে আমার পারস্যে যাওয়া আরো এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। কলকাতায় থাকতে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমার করকোষ্ঠী দেখতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন অনতি-কালের মধ্যে আমার ভ্রমণ আছে কিন্তু যেদিন যাবার কথা তার পরে আরো সময় পিছিয়ে যাবে। তাই ঘটল। কিন্তু তোমার মা যে বর্ষফল তৈরি করিয়েচেন তার মধ্যে ভ্রমণের উল্লেখমাত্র নেই, আর আর যা আছে তাও কিছু মেলে না। তোমার মাকে বোলো তাঁর এক্‌জিমার ওষুধ কেলি সাল্‌ফ্‌ ও নেট্রম ম্যুর, ৬-এর পর্য্যায়ে। Kali Sulf, 6x Natrum Mur 6x। এখানে এসে আমার অনেকগুলি রোগী জুটে গেছে। তা ছাড়া একজন ভদ্রলোক গ্রামোফোনে স্বর ধরাবার বিদ্যা য়ুরোপে শিখে এসেছেন। তিনি এখানে এসেছেন আমার কণ্ঠ থেকে কিছু আদায় করবার প্রস্তাব নিয়ে। এই রকম সব নানাবিধ নিত্য ও নৈমিত্তিক কাজ চারদিকে ভিড় করেচে। দোলের সময় বসন্ত-উৎসব হবে সেও একটা দায়। ইতি ৭ চৈত্র ১৩৩৮

মামা

১০

[৩ জুন ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে

শরীরটাকে দূর দূরান্তরে ঘুরিয়ে নিলুম ঠিক ঘরের দুয়ারের কাছটায় এসে সে হরতাল করে বসল। এখন তাকে নড়ায় কার সাধ্য। ডাক্তার লাগিয়ে দিয়েছি তার পিছনে— আশা করচি দু চার দিনে শায়েস্তা হবে। ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনবার জন্যে তোমার ইচ্ছা— চিঠিতে কুলোবে না, ভাঙা শরীরেও নয়— কোনো এক সময়ে দেখা হলে গল্প করব। আপাতত চললুম বিছানায়। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ [১৩৩৯]

মামা

১১

২৮ অগস্ট ১৯৩২

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ভালোই আছি আমার জন্যে ভেবো না।

এখনো মীরার ফেরবার সময় হয় নি।

তোমাদের চিঠি লিখে কোনো সঙ্কট বাধাতে ইচ্ছে করে না।

আমারও শরীর ক্লান্ত, সময়ও অত্যন্ত অল্প। বিশ্রামের দরকার।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১২ ভাদ্র ১৩৩৯

মামা

১২

১৩ অক্টোবর ১৯৩২

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। তোমার মাকে কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি চিঠি দিয়েছিলুম, বোধ হচ্চে সেটা তিনি পান নি। গুরুতর কাজের ভিড় পড়েচে— চিঠি লেখবার অবকাশ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো। কিন্তু তা নিয়ে তোমরা আক্ষেপ কোরো না। তোমরা আমার হৃদয়ে স্নেহের আসন অধিকার করেচ সে সম্বন্ধে মনে সংশয় রেখো না! যদি শান্তিনিকেতনে আসা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হোত তাহলে দেখতে পেতে এখানে শরৎকাল কি সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েচে। চার দিকে খোলা আকাশ, অপর্য্যাপ্ত শিউলি ফুলের নিঃশ্বাসে সুগন্ধ বাতাস, গাছে গাছে প্রজাপতির দল মেতে উঠেচে, দিনগুলি সোনার আলোর পাল তুলে চলেচে ভেসে, আর রাতগুলি এখন শারদজ্যোৎস্নায় মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু তোমাদের মন

কলকাতার ইঁটকাঠের খাঁচায় আট্‌কা পড়ে আছে, এখানকার নিভৃত শান্তি হয়তো তোমাদের ভালোই লাগত না— অন্তত বেশিদিনের জন্যে না। আমার মনটা এখানে আছে সমুদ্রের মাছের মতো— কলকাতায় যখন যাই তখন মনে হয় পথ হারিয়ে ঘোলা জলের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছি। শীঘ্র কলকাতায় যাব সে আশঙ্কা নেই। পূজোর ছুটির পরে ইউনিভর্সিটিতে লেকচার দিতে একবার যেতে হবে— সে কথা মনে করলেই মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে। পূজোর কয়দিন তোমাদের ওখানে বোধ হয় খুব আমোদে গেছে। এখানকার কাছাকাছি গ্রামে পূজোর ধুম ছিল, কলকাতা থেকে যাত্রাও এসেছে। আমার এ জায়গাটি ছিল নিস্তব্ধ— শুক্লসন্ধ্যার আলোতে শান্ত নিঃশব্দ নির্ম্মল উৎসব হোতো সাম্‌নেকার ঐ বীথিকায়, লাল রঙন ফুলের মঞ্জরী ছাড়া আর কিছুতে রক্তের চিহ্ন ছিল না। ইতি ২৭শে আশ্বিন ১৩৩৯

মামা

১৩

১৪ এপ্রিল ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আজ নববর্ষের আরম্ভদিন। তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪০

মামা

১৪

২৫ জুন ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বাসন্তী, নির্জ্জীবকুমারের বিবাহের সমারোহ আমার কাছ পর্য্যন্ত এসে পৌঁচেছে— আমরা নির্জ্জীব নই তার প্রমাণ হবে। আয়োজন দেখে ইচ্ছা করচে আশীর্ব্বাদ করি কিন্তু শক্তির অভাব ঘটেচে। দেহ এবং কলম কিছুই সচল অবস্থায় নেই। তা ছাড়া আশীর্ব্বাদ করে যাদের লেশমাত্র বিচলিত করতে পারব না তাদের প্রতি ও জিনিষটার অপব্যয় করে কী হবে? তার চেয়ে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তুমিই গ্রহণ করো। ১১ আষাঢ় ১৩৪০

মামা

১৫

৫ নভেম্বর ১৯৩৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, তোমার মা এতকাল ধর্ম্মমত নিয়ে দুর্দ্দাম উৎসাহে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেচেন। আমি চুপ করে গেছি তাই তিনি বেকার। এখন তোমাকে খাড়া করে সেই ধামাচাপা ঝগড়া আবার জাগাবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হবেন

না, তোমার সঙ্গে আমি কিছুতেই ঝগড়া করব না। মতের মিল না হলেও আমি চুপচাপ থাকব।

শুনে আশ্চর্য্য হবে তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম্মের অমিল নেই। আমি দীক্ষা নিই নি, নেবও না। আমার ভগবান কোনো সম্প্রদায়ের ছাঁচে ঢালা ভগবান নন। তিনি নিরাকার তাই অন্তহীন আকার তাঁর— তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর আকার ছাড়া আকার আসবে কোথা থেকে। কারো হাতগড়া মনগড়া আকার নয় তাঁর— কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে বিশেষ রূপে সীমাবদ্ধ নন তিনি।

যে সব প্রচলিত আচারের কোনোই অর্থ নেই— যেমন গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নান করা— তাকে মান্‌তে গেলে নিজের বুদ্ধিকে অপমানিত করা হয়— এই বুদ্ধি ভগবানেরই দান। যারা অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম্মের মূঢ়তায় ভারগ্রস্ত তাদের মন শেওলায় বাধাগ্রস্ত জলের মতো গতিহীন, অন্ধ, অস্বাস্থ্যময়— তারা শত শত বৎসর পরের কানমলা খেয়ে অপমানে নত হয়ে থাকে, তারা অসংখ্য ব্যর্থতা দ্বারা শতধাবিভক্ত। জীবহত্যা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত— অনিচ্ছাক্রমে কখনো কখনো মাছ মাংস খেয়ে থাকি, সেটাকে আমি অপরাধ বলেই গণ্য করি। এক সময়ে সুদীর্ঘকাল নিরামিষাশী ছিলেম— এখনো আমিষভোজন ক্বচিৎ হয়।

মিলিয়ে দেখো, তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম্মমতের প্রভেদ নেই। তার কারণ তোমারও তরুণ মন, আমারও তাই। অন্যান্য রোগের মতোই মূঢ়তা দুর্ব্বল মনকেই অধিকার করে, এই

দুর্ব্বলতা মানসিক জরার লক্ষণ, সেই জরা ১৪।১৫ বছরেরই হোক্ আর ৮০।৮৫ বছরেরই হোক্। এই জরা চিরজীবন তোমাকে স্পর্শ না করুক, স্বচ্ছ থাক তোমার বুদ্ধি, প্রশস্ত হোক্ তোমার হৃদয়, উদার হোক্ মানুষের সঙ্গে তোমার ব্যবহার,— একদিন যাঁর সঙ্গে তোমার মিলন হবে তিনি যেন নির্ম্মল মুক্তির পথেই তোমাকে অগ্রসর করে দেন এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ৫ নবেম্বর ১৯৩৩

মামা

১৬

২৭ জানুয়ারি ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৎসে, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। তোমাদের করুণার মধ্য দিয়েই তো বিধাতার করুণা পীড়িত পৃথিবীর উপরে অবতীর্ণ হয়। তুমি অসংশয়ে কল্যাণকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছ তোমার এই কর্ম্মের যোগেই তুমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করচ। লোকহিতের আগ্রহ, এই তো জীবনের সার্থকতা। অনেক আছে বিদ্বান অনেক আছে ধনী তাদের হৃদয় পাথরের মতো, তাদের মতো হতভাগ্য আর কে হতে পারে ?

ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি কলকাতায় যাব, যদি তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় খুসী হব, নইলে দূরের থেকে মনে মনে কল্যাণ কামনা করব। ইতি ১৩ মাঘ ১৩৪০

মামা

১৭

১৬ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৎসে নববর্ষ প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। নানা অতিথি, নানা কাজ, নানা চিন্তা। এই মাসের শেষভাগে আমার গ্রহ সিংহলযাত্রার তাগিদ করেছে— এখন থেকে তার ব্যবস্থা করতে হচ্চে। খুব সম্ভব আমার জন্মদিন পড়বে সমুদ্রে কিম্বা বিভীষণের রাজত্বে। তাই আমার আশ্রমের বন্ধু ও ছাত্ররা এ বছর আমার জন্মদিন এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রে এবার দিনটা পড়ল পয়লা বৈশাখে। গ্রহদের কথা জানি নে কিন্তু দিনটি ছিল স্নিগ্ধ, আকাশ ছিল বৃষ্টিধারাবিধৌত, রবির প্রতাপ ছিল অপ্রখর— এর থেকে মনে করা যেতে পারে বর্ষফল কষ্টদায়ক হবে না। কী বল? তোমার মায়ের মত কী জানিয়ো। গৌরীপুরে যাচ্চ, সেখানে তোমার দাদামশায়ের আদরে থাকবে সন্দেহ নেই— যদি কোনো ত্রুটি দেখো তবে সেই উপলক্ষ্যে নাৎনীর দৌরাত্ম্য করবার অধিকার আছে এ কথা ভুলো না। তোমরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধার পত্রের উত্তর এই সঙ্গে পাঠাই।

১৮

১৭ জুন ১৯৩৪

ওঁ

জাফনা

সিংহল

কল্যাণীয়াসু

বৎসে তোমাকে চিঠি লিখিনি বলে রাগ করেচ। তোমার দাদামশায়ের আদরের নিবিড় পরিবেষ্টনের মধ্যে ফাঁক পাওয়া যাবে না আশঙ্কা করে নীরব ছিলুম। কিছু বানিয়ে এবং বাড়িয়ে বলা গেল। আসল কথা আমি নিজে আছি নিয়ত সমাদরের ব্যূহ-বেষ্টিত হয়ে, তার উপরে কাজ আছে যথেষ্ট— বক্তৃতা দিতে দিতে নিজের কণ্ঠস্বরের উপর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে— এখানকার এরা সরল ভাবুক স্বভাবের মানুষ, স্নিগ্ধ এদের মন— এদের খুসি করা দুঃসাধ্য নয়— বাঙালীদের মতো এরা সর্ব্বদা খুঁৎ-ধরা দুঃসহ বুদ্ধিমান নয়— এদের আনন্দ দিয়ে আনন্দিত হয়েচি।

কাল যাত্রা করব স্বদেশের অভিমুখে— দীর্ঘ পথ অতিবাহন করে কলকাতায় পৌঁছব বোধ করি ইংরেজি চব্বিশে তারিখে। ততদিনে দেশে বর্ষা নেমেছে, বর্ষার কবি পাবে আকাশের অভিনন্দন অভিষেক, সজল মেঘের নববারিধারায়।

আমার আশীর্ব্বাদ। ১৭ জুন ১৯৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

মাদ্রাজ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে বর্ষামঙ্গলের যে সূচনা পাঠিয়েছিলুম এতদিনে সেটা নিশ্চয় পেয়েছ। আসাম গৌরীপুরের দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে তার খোঁজ করতে বলেছিলুম। তিনি লিখেছেন বই দুটো সেখানকার পোষ্ট অফিসে অপেক্ষা করছিল তিনি ময়মনসিঙের ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

এখানে আমার বক্তৃতা চল্‌চে। পর্শু দিন থেকে অভিনয় সুরু হবে— অক্টোবর মাসটা এই রকম কাটবে। শাপমোচন যদি দেখতে, নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগত। তোমাদের ওখানে যে অভিনয়গুলি হয়ে গেছে তার চেয়ে মন্দ নিশ্চয়ই নয়। অনেক নতুন গান আছে।

তোমার গানের ছাত্রদের উন্নতির খবর পেয়ে আশান্বিত হয়েছি। ময়মনসিং জেলায় তুমিই আমার গানের প্রতিষ্ঠা করলে— আশা করি উচ্চারণ এবং সুর কিছুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকবে। ইতি ২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১৪ এপ্রিল ১৯৩৫

বৎসে,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো।

আমাদের ভারতীয় গানের কোনো কোনো সুরের হার্ম্মো-নিয়মের বাঁধা সুরের সঙ্গে ঈষৎ অনৈক্য হয়। তারের যন্ত্রে কোনো অসুবিধে হয় না। সে স্থলে হয় শুদ্ধ নয় কোমল লাগালেই চলে— তোমার নিজের কান তার পথ নির্দ্দেশ করে দেবে। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩৪২

মামা

শান্তিনিকেতনের ফটো আমার কাছে নেই
যদি পাই তোমাকে পাঠাব।

২১

২৮ অগস্ট ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমাকে আমাদের এখানকার চামড়ার কাজ কিছু পাঠাচ্চি। একটি হচ্চে অটোগ্রাফ বইয়ের মলাট— এই মাপের খাতা এর মধ্যে ভর্ত্তি করে নিলে এটা সম্পূর্ণ হবে। আর একটি

পোর্টফোলিয়ো। এটা আমার নিজের ব্যবহারে এতকাল নিযুক্ত ছিল— সেই বিশিষ্টতার জন্যেই এই পুরোনো জিনিষটা তোমাকে দিলুম— অন্য ঘরে যখন কুলান্তরিত হবে তখনো আমার স্নেহ তোমার স্মরণে থাকবে এই আশা করেই তোমাকে পাঠাচ্চি।

আজ প্রভাতে আকাশ নির্ম্মল, শরতের দাক্ষিণ্যে এখানকার বনশ্রেণী আনন্দোজ্জ্বল— রবির আশীর্ব্বাদের জন্য আজকের দিনই প্রশস্ত। ইতি ১১ ভাদ্র ১৩৪২

মামা

২২

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়া বাসন্তী

আমি চিঠিপত্র লেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার বিশ্রাম নেবার সময়— এতদিন ধরে কাজ কর্ম্ম অনেক করেছি। শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

কিছুদিন হোলো তোমার মামা এখানে এসেছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে আসবেন এমন আশা রইল। সঙ্গে যদি ভাগ্নীটিকে নিয়ে আসেন তাহলে আরো ভালো হয়।

তোমার মার চিঠিতে খবর পেলুম তুমি স্বহস্তে নানাবিধ ভোজ্য তৈরি করে আত্মীয়স্বজনের পরিতোষ বিধান করচ।

শুনে লোভ হয়— দূরে আছি অতএব ভাগ পাবার আশা করতে পারি নে। আমাকে পেটুক বলে যদি কল্পনা করো তাহলে ভুল করবে। আমি যতটা খাই তার চেয়ে গুণ গাই বেশি। যখন কলকাতায় যাব তখনকার জন্যে দাবী রইল। কাছের লোকদের পেটভরা মাপের পরিবেষণ করেও যেটুকু উদ্‌বৃত্ত থাকবে তাতেই আমার চলে যাবে। ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

মামা

২৩

৯ অক্টোবর ১৯৩৫

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

কল্যাণীয়াসু

সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ আশ্বিন

১৩৪২

২৪

৫ জানুয়ারি ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। কিছুকাল থেকে নানা কাজ এবং অতিথিসমাগম নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম শরীরও বিশেষ ভালো ছিল না। কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দিয়ে কোথাও পালাবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। কিন্তু যেখানেই যাই উপদ্রব সঙ্গে সঙ্গেই চলে— তাই চিরপরিচিত আরাম কেদারাটা আঁকড়ে পড়ে থাকি।

পরিশোধ গল্পটি ঐতিহাসিক নয়, বৌদ্ধ উপাখ্যান থেকে নেওয়া।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ৫ জানুয়ারি ১৯৩৬

মামা

ওঁ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী

নূতন সংসার সৃষ্টি করিবে আপন প্রতিভায়,
হে কল্যাণি, তব নারী-জীবনের চরিতার্থতায়
ধন্য হবে তুমি, বৎসে, ধন্য হবে বান্ধব আত্মীয়,
তোমার প্রীতির রসে নিত্য হবে সবাকার প্রিয়
আপন জগৎ তব ; হবে সত্য-প্রভায় উজ্জ্বল ;
অক্লান্ত সেবায় ত্যাগে পুণ্যে হবে শুভ্র সুনির্ম্মল।
জীবনযাত্রার পথে কল্যাণনিষ্ঠার ধ্রুবতারা
মোহকুহেলিকাজালে কখনো না হয় যেন হারা।
ভক্তির মাধুর্য্যে পাও অন্তরের কান্তি নিরুপমা,
বিশ্বেরে করিয়া ক্ষমা লভ' বিশ্ববিধাতার ক্ষমা।
বাহিরের আক্রমণ জয় তুমি কর' আত্মজয়ে,
এই মম আশীর্ব্বাদ তোমাদের শুভ পরিণয়ে॥

২রা ফাল্গুন
১৩৪২

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

৫ জুলাই ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হয়েছি। আমাদের এখানে চল্‌চে কখনো বৃষ্টি কখনো গুমট, এতক্ষণ পরে আজ দিয়েচে একটু হাওয়া— হয়তো সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ আস্‌বে খুব ঘটা করে বর্ষণ। জানো তো এবার এদেশে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি গেছে, ক্ষেতে ফসল নেই, লোকের পেটে নেই অন্ন, গায়ের বস্ত্র জীর্ণ। এসব দেখে সংসারের উপর ধিক্কার জন্মে। কিছু কিছু চেষ্টা করচি এদের বাঁচিয়ে রাখতে, কিন্তু আমাদের সাধ্যের অতীত। এখানে একটা সাবেক কালের দীঘি ছিল, সেটা প্রায় বুজে এসেছিল— খোঁড়াবার ব্যবস্থা করেছি, তাতে গেল দুই মাস ধরে পাঁচশো লোক খেটে খেতে পাচ্চে। যে পর্য্যন্ত না অঘ্রাণ মাসে ফসল ওঠে সে পর্য্যন্ত এদেশের লোকের অনাহার চলবে।

হয়তো শ্রাবণ মাসের মধ্যে কোনো এক সময়ে কলকাতায় যাওয়া ঘটবে— তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারবে।

তোমরা সবাই আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২১ আষাঢ় ১৩৪৩

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

৩০ অগস্ট্ ১৯৩৬

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। নানা কাজ নিয়ে আজকাল অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছি। তার উপরে শরীরটা যে খুব ভালো আছে তা বলতে পারিনে। কিন্তু আমার এই ভাঙা শরীরে কাজ কামাই হয় না। এখানে বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল। কথা ছিল কলকাতায় গিয়ে করব কিন্তু সুবিধে হোলো না। তবু হয়ত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে একবার কলকাতায় যাব। তুমি তো জানই যখন যাই বরানগরে গিয়ে থাকি, এবারেও সেখানেই হবে আমার বাসা। যদি পারো তো দেখা করতে এলে খুসি হব।

তোমার মা আর কতদিন পুরীতে থাকবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ৩০ অগস্ট ১৯৩৬

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮

[শ্রীনিকেতন] ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা বাসা বদল করেছ— বোধ হয় ভালোই লাগচে। আমিও কিছুদিনের জন্যে বাসা বদলিয়েছি, এসেছি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে। এখানে তেতলা বাড়ির তেতলার ঘরে নির্জ্জনে আরামে আছি। যতদূর দৃষ্টি যায় ধানক্ষেতে সবুজ রঙের সমুদ্র। ইতি ৩১ অক্টোবর ১৯৩৬

মামা

২৯

১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ডিব্রুগড় থেকে তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। সুন্দর জায়গাতেই গেছ, সুখে থাকবে। অনেকবার ইচ্ছা করেছি ষ্টীমারে করে ব্রহ্মপুত্র বেয়ে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসব— এ পর্য্যন্ত ঘটে ওঠে নি। হয় তো যাব কোনো সময়ে, তখন তোমাদের ঘরকন্নার আস্বাদ পাওয়া যাবে। খবরের কাগজে পড়েছিলুম যে আমি কলকাতায় যাব, কিন্তু আমি নিজে তার কিছুই জানি

নে। এখনো এখানেই আছি, ৭ই পৌষের জন্য প্রস্তুত হচ্চি। ইতি ১৪।১২।-৬

আশীর্ব্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

২২ এপ্রিল ১৯৩৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ডিব্রুগড় থেকে কলকাতায় ফিরে যে চিঠিখানি লিখেচ পেয়ে খুসি হলুম। তোমরা আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। আমরা আলমোড়া পাহাড়ে যাবার সঙ্কল্প করেছি। আগামী ২৬শে রাত্রে কলকাতায় পৌঁছব, ২৯শে সন্ধ্যাবেলায় যাত্রা করব পাহাড়ে। আমি সহজে নড়তে ইচ্ছে করি নে এবার শরীর বিশেষ ক্লান্ত বলেই তল্পি বাঁধচি। কিন্তু কাজ আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরবে, এবং ভিড় জমতেও বোধহয় দেরি হবেনা। ইতি ২২।৪।৩৭

মামা

৩১

২৬ অগস্ট্ ১৯৩৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় ক্ষণকালের জন্যে দেখা হয়েছিল খুশি হয়েছিলুম। পরের দিনেই পালিয়ে এসেছি। কলকাতা

আমার জন্মস্থান কিন্তু আমার আবাস্থ নয়। শরৎকালে আর্দ্রতাপ দুঃসহ হয়ে উঠচে— যত শীঘ্র পারি গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় নেব। পথের মধ্যে কলকাতায় চোখের চিকিৎসা উপলক্ষ্যে থাকতে হবে। তখন হয় তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারবে। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৬।৮।৩৯

স্নেহরত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২

২৯ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়াসু

তোমরা দুজনে মিলে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

আমার এখানকার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল। আগামী ৫ই নবেম্বরে এখান থেকে অবতরণ করব। চোখের চিকিৎসার জন্যে দু চার দিন কলকাতায় থাকতে হবে। তার পরে যাব আশ্রমে। এখানে যে কতটা শীত তোমাদের ওখান থেকে তা কল্পনা করতে পারবে না। ইতি ২৯।১০।৩৯

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যাত্রা করে বেরিয়েছিলুম কালিম্পঙের দিকে— কিন্তু দুর্বল দেহের প্রতি ভরসা করতে পারলুম না। ক্লান্তির ভয়ে কলকাতা থেকেই পালিয়ে এলুম। তোমাদের দেশের বর্ণনা শুনে লোভ হয়— কিন্তু পথের লীলা এবার থেকে সাঙ্গ হোলো।

সেদিন সন্তানসহ বাসন্তীকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। এখানে এখন বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব। আপাতত হাওয়ার মেজাজ ঠাণ্ডা -- আবার খেয়াল বদলাতে পারে। আশীর্বাদ জেনো। ইতি ১২।১০।৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রখানি শ্রীনিখিলচন্দ্র বাগচীকে লিখিত

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লিখিত

পত্রসংখ্যা ১০

১৯ অগস্ট ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে ওস্তাদের কথা লিখেচ তাঁকে পেলে আমাদের ভালোই হয়। কেবল একটিমাত্র ভাবনার কথা, আমাদের আশ্রম আর্থিক দুর্গতিগ্রস্ত। কি পরিমাণ বেতন পেলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন সেটা আমাকে জানিয়ো।

তোমার কন্যার অসুখের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হলুম।

আজ দিলীপকুমারের পত্র পেলুম। তাতে সে জানিয়েচে যে শ্রীঅরবিন্দ কবে সর্ব্বসাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন তা নির্দ্দিষ্ট করে বলেন নি— হয় তো আমি ভুল বুঝেছি কিম্বা আর কারো কাছ থেকে এ কথা শুনে থাকব। ইতি ২ ভাদ্র ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩ অগস্ট, ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমাকে হয় তো আর দিন দশেকের মধ্যে কলকাতায় যেতে হবে। বন্যাপীড়িত বাংলার সাহায্যের জন্যে কিছু চেষ্টা না করে স্থির থাকা অসম্ভব। বন্যায় আমাদেরও উপজীবিকা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এর আগে যে বন্যা হয়েছিল তাতে ঋণ করে প্রজাদের সাহায্য করেছি— দ্বিতীয় বার ঋণ বাড়াতে সাহস হয় না। তাই স্থির করেছি কলকাতায় বর্ষামঙ্গল দেখিয়ে বর্ষাজনিত অমঙ্গল কথঞ্চিৎ দূর করতে চেষ্টা করব। আট দশ দিনের পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হবে না— তার চেয়ে বিলম্ব করলে উৎসবের নামটাকে ব্যর্থ করা হবে। শরীর পীড়িত কিন্তু দেহের দোহাই মেনে কর্ত্তব্য মুলতবি রাখবার অবকাশ আমার আর নেই।

ডাক্তার সরসীলাল সরকার আমার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাবী করে পত্র লিখেচেন। প্রবন্ধ যদি কোমর বেঁধে লিখি পনেরো আনা লোক তার তাৎপর্য্য বুঝতে পারবে না অথবা ভুল বুঝবে। তোমার দিদিকে যে চিঠিগুলি লিখেচি তাতে আমার কথা যত সহজে ব্যক্ত হয়েচে কোনো প্রবন্ধে তা সম্ভব হবে না। যদি তার ব্যক্তিগত ও অবান্তর অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ঐ পত্রগুলি থেকে সার উদ্ধার করে গেঁথে দিই তাতে তোমাদের কি কোনো আপত্তির কারণ হবে? শুনেছি এ চিঠিগুলি এখনি ছাপানো সম্বন্ধে তোমার বাবার সম্মতি নেই। কিন্তু আমি যে ভাবে

ছাপতে ইচ্ছা করচি তাতে কারো সঙ্কোচের কোনো কারণ থাকবে না। একবার তাঁকে ও তোমার দিদিকে জানিয়ে আমাকে লিখো। এই ক্লান্ত জীর্ণ দেহে নতুন করে কিছু লিখতে উৎসাহ হয় না— অথচ আমার যা শেষ কথা তা আমাকে বলে যেতেই হবে। রচনাটি সঙ্কলিত হলে পর ছাপবার পূর্ব্বে তার এক কপি তোমাদের সম্মতির জন্যে পাঠিয়ে দিতে পারি। ইতি
৬ ভাদ্র ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২৯ জুলাই ১৯৩৩

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আয়েৎ আলি এসেছেন। তুই একদিন তাঁর বাজনাও শুনেছি। তাঁর হাত কাঁচা এবং সুর তাল সম্বন্ধেও তাঁর প্রবীণতা নেই। প্রথম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার সম্বন্ধে তাঁর যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আসরে তাঁর বাজনা চলবে না। লোকটি অত্যন্ত ভদ্র ও নির্ম্মল স্বভাবের— এখানে স্থান পাবার উপযুক্ত।

আমাদের পক্ষে সঙ্কটের কারণ এই যে তাঁকে আশি টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের অর্থাভাব সত্ত্বেও তা স্বীকার করেছিলুম তাঁর সবিশেষ যোগ্যতা কল্পনা ক'রে। এদিকে হেমেন্দ্রবাবু,

যিনি সঙ্গীত বিভাগের প্রধান, তিনি এতদিন ৭৫ টাকা বেতনে কাজ করেছেন। তিনি আরো উচ্চতর বেতনের যোগ্য,— নিতান্তই অশক্তিবশত তাঁকে যথোচিত বৃত্তি দিতে পারিনি, আমাদের অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। আয়েৎ আলির সঙ্গে বেতনের তুলনা ক'রে তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়েছে। আয়েৎ আলি যদি যন্ত্রবিদ্যায় যথার্থই পরদর্শী হোতেন তাহোলে সান্ত্বনা পাওয়া যেত। তা না হওয়াতে আমরা মুস্কিলে পড়েছি। এদিকে ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। শীঘ্র লোক পাওয়া যাবে এমন আশা দেখিনে, পূর্ব্বে চেষ্টাও করেছি। কী করা কর্ত্তব্য বন্ধুভাবে তোমার পরামর্শ চাই। তুমি এখন কোথায় আছ জানিনে। যদি পাহাড় থেকে নেমে থাকো এখানে এলে সমস্ত অবস্থা বুঝতে পারবে। এখানকার সঙ্গীতবিভাগের সঙ্গে তোমার যোগ থাকে এই আমার ইচ্ছা— আমাদের এই কাজটি তোমার আপন কাজ ব'লে যদি গ্রহণ করো তবে তা আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় হবে। ইতি ২৯ জুলাই ১৯৩৫ [১৩ শ্রাবণ ১৩৪২]

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২২ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ　　　　　　　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল থেকে দিলীপের চিঠিপত্র বন্ধ থাকাতে আমি শান্তিতে আছি। আমি ক্রমশই কাজ সংক্ষেপ করে আনছি— নিতান্ত জরুরি না হোলে চিঠিও প্রায় লিখিনি। আমার একান্ত দরকার অবকাশ— এতদিনকার কর্ম্মবহুল জীবনে যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটেছে তাকে শান্ত করে প্রস্তুত হোতে চাই শেষ পরিণামের জন্যে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ধারাকে একেবারে নিরস্ত করা যায় না, কিন্তু যাতে কূল ছাপিয়ে না ওঠে এমনতরো বাঁধ বেঁধে দেওয়া যেতে পারে।

যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষকের অভাবে উদ্বিগ্ন ছিলুম। পর্শু আয়াত [আয়েৎ] আলি তাঁর একটি ছাত্রের কথা লিখেছেন। সেতার এসরাজ বাঁয়া তবলা শেখাতে পারবে— বেতন মাসিক ৭০্ টাকা, সম্মতি দিয়ে তাঁকে পত্র লিখেছি। তুমিও তাঁকে দু লাইন লিখে দিতে পারো। এখানকার দাবী কী সে তিনি দেখে গিয়েছেন সুতরাং তাঁর নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করা চলবে ভেবে আর দ্বিধা করি নি— দ্বিধা ক'রে সময় অতিবাহিত করারও অবসর নেই।

যখন অবকাশ পাবে মাঝে মাঝে এখানে এলে খুসি হব। ইতি ২২ অক্টোবর ১৯৩৫ [৫ কার্ত্তিক ১৩৪২]

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২ জুলাই ১৯৩৮

Gouripur Lodge
Kalimpong
2. 7. 38

কল্যাণীয়েষু

এখানে শরীর অনেকটা ভালো, মনও আছে আরামে তার প্রধান কারণ এখানকার নির্জনতা— তোমাদের বাড়িটিরও গুণ আছে। দ্বিধা হচ্ছিল দীর্ঘকাল থাকলে পাছে তোমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটাই। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি। আমাকে কোনো কারণে একবার যেতে হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। বউমা এখানে রইলেন। আবার ফিরব। তোমার সাদর আমন্ত্রণ অনুসারে এইখানেই শরৎ-কাল যাপন করব— সকলেই বলচে সেই সময়টা মনোরম এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। [১৭ আষাঢ় ১৩৪৫]

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

১৭ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তানসেনের জীবনী দিয়ে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সংগীতের বিকাশ ও আলোচনার যে ধারাবাহিক চিত্র তোমার গ্রন্থে

প্রকাশ করেছ তা বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হয়েছে। গীতানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে এই সুখপাঠ্য গ্রন্থ আদরণীয় হবে সন্দেহ নেই। আমি পড়ে আনন্দলাভ করেছি। এ শ্রেণীর গ্রন্থ আর দেখিনি।

কিছুদিন আগে কালিম্পং অভিমুখে যাত্রা করে বেরিয়েছিলুম। শরীরের দুর্বলতা বাধা দিল। সেখানে আমার শরীর আরামে ছিল তা ছাড়া তোমাদের বাড়িটি উপভোগ্য— ওখানে নিভৃত বাসের সুযোগ পেয়ে কাজ করতেও পেরেছি। নানাপ্রকার কাজের তাগিদে ছুটির সময় বাধা পেলুম— ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে পারিনি। বৌমা রথীর শরীর অনেকদিন থেকেই অসুস্থ ছিল— সেজন্যে আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল। তোমাদের ওখানে গিয়ে যেমন উপকার পেয়েছেন এমন আর কোথাও পান নি। দৈবক্রমে এ রকম সুযোগ পাওয়া গেছে সেজন্যে তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ আছি। স্বাস্থ্যের সন্ধানে আমরা অন্য অনেক জায়গায় ঘুরেছি, এতদিন পরে ঠিক অনুকূল স্থানটি পাওয়া গেল। ওখান-কার নির্জনতাও আমার পক্ষে মনোরম। কিন্তু আমি যাওয়ার পরে কালিম্পঙের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়েছে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। এবার ছুটিতে যথেষ্ট লোকসমাগম বেড়ে গিয়েছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ১৭।১০।৩৮ [৩০ আশ্বিন ১৩৪৫]

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

২৯ মার্চ ১৯৩৯

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কিছুদিন পূর্বে, তোমাদের কালিম্পঙের বাড়িতে আমাদের আতিথ্যের প্রস্তাব করেছিলে। যদি ইতিমধ্যে কোনো বাধার কারণ না ঘটে থাকে তাহলে আমরা বৈশাখ মাসের আরম্ভেই সেখানে যাব সংকল্প করেছি।

১লা এপ্রেল প্রত্যূষের ট্রেনে কলকাতায় যাব। সেখানে সাক্ষাতে অথবা পত্রযোগে যদি তোমাদের সম্মতি পাই তাহলে কালিম্পঙে তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হব। ইতি ২৯. ৩. ১৯৩৯ [১৫ চৈত্র ১৩৪৫]

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

৬ এপ্রিল ১৯৪০

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এ বৎসর পাহাড় অঞ্চলে গমনেচ্ছুদের অত্যন্ত টান পড়েছে শুনে তোমাদের কাছে কালিম্পঙের কথা পাড়তে সংকোচ বোধ করছিলুম। যদি কোনো বাধার কারণ না থাকে তাহলে আমাদের কথা স্মরণ রেখো। নতুবা অপ্রাপণীয়তার সংবাদ জানাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা মনে

রেখো না। অনিবার্য ব্যাঘাতে তোমাদের পূর্ব সৌজন্যের গৌরব ক্ষুণ্ন হবে না। ইতি ৬।৪।৪০

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

৭ জুলাই ১৯৪০

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

দিলীপের কবিতা সহ তোমার পত্রখানি পেয়ে খুশি হলুম। এবারে শরীর ভালো ছিল না এখনো আছি ডাক্তারের শাসনাধীনে। চোখে কম দেখচি বলে লেখাপড়ার কাজে মন দিতে পারিনে। দৃষ্টি-শক্তিকে ক্লিষ্ট কর্‌তে সাহস করিনে। যে কাজ আমার আপন তাকে অবহেলা করতে মন যায় না বলে বন্ধুর রাস্তার উপর দিয়ে চলতে হয়।

আশা করি তোমরা যুগলে ভালো আছ। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৭।৭।৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

১৩ মার্চ ১৯৪১

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার দৃষ্টি ক্ষীণ, আমার শরীর অশক্ত। পড়তে শুনতে কষ্ট হয় এবং কোনো কঠিন বিষয়ে মন দেওয়া আমার পক্ষে দুঃখসাধ্য। তোমার পিতৃদেবের রচনা এইমাত্র পেলাম আমার শয্যাগত অবস্থায়। তবু একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। প্রশান্ত এর জ্ঞানের ক্ষেত্র, এর মননশক্তি সুগভীর, এর অধিক বলবার আমার সাধ্য নেই। তোমার পিতাকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাবে এবং তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। [২৯ ফাল্গুন ১৩৪৭]

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির আশীর্বাদ

নাচনচন্দ্র শ্রীমান কিশোরকান্ত -সহ পত্রালাপ

শ্রীমান কিশোরকান্ত

নবীন আগন্তুক,
নবযুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি।
জীবন-রঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে?
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামতরে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয় তো রচিবে মিলনতীর্থ শান্তির বাঁধ বেঁধে।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম আমরা বেড়াই খুঁজি
আগামী প্রাতের শুকতারাসম নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো এই বুঝি দিল আনি॥

৩০।৭।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ অক্টোবর ১৯৩৮

শ্রীচরণেষু,

দাদু, আপনি আমার প্রণাম জানবেন। আমাকে চেনেন কি? আমি 'নাচন', ভালো নাম 'কিশোরকান্ত'— আমি আপনার সারা জীবনের স্বপ্ন, চিরনবীন, চিরসুন্দর নটরাজ। কিন্তু নটরাজ তো ভাঙ্গনের দেবতা, আমি তা নই। আমি গড়নের ও স্থাপনের দেবতা, আমি তাই নাচন বা নটশেখর।

দাদু, আপনি মাকে, মামাকে, দিদিমাকে অনেক ভালো-ভালো বই দিয়েছেন, চিঠি লিখেছেন, সে সব চিঠি দিয়ে আবার বই তৈরী হবে। কিন্তু আমাকে আপনি, যদিও কবিতা দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করেছেন, নিজের প্রিয় নামটিই দান করেছেন আমাকে, কিন্তু আমাকে কোনো বই দেন নি। তাই আমিও ভেবেছি যে আপনাদের ভাষার কোনো বই আমি পড়বই না। আমি নিজেই কত ভালো ভালো বই রচনা করতে পারি, কত নতুন সুরে নতুন নতুন গান রচনা করতে পারি, সে সব রচনা আপনার মত লোহার কাঠি দিয়ে বাঁশ কাঠের মাড়ের সরের ওপর কালো রঙের আঁচড় কেটে বানাতে হয় না, আর রূপো কিংবা তামার চাক্‌তির সঙ্গে বদলাবদলি ক'রেও নিতে হয় না। আমার বই আমার গান প্রভাতী আলোয় পাখীর সুরের মত হাওয়ায় ভেসে ওঠে, হাওয়ায় ভেসে ভেসে চ'লে যায় দূর দূরান্তরে, আমার ভাষা বুঝতে পারে কেবল তারাই, যারা হাওয়ার ভাষা, গাছের পাতার ভাষা, আর পাখীর ভাষা পড়তে শিখেছে।

আমি নাচন কি না, তাই আমার সুরের লহর নাচতে নাচতে চ'লে যায় ওই গাছের পাতাকে মর্ম্মরিত দোলা দিয়ে দিয়ে নীল আকাশের শেষ পারে। সুরপরীরা আমার কাছেই সুর শিখতে আসে, নাচের তালে মঞ্জীরা বাজিয়ে তারা আমার কাছে শেখা গান গাইতে যায় আবার হয়তো ওই আপনারি কাছে। তাদের গান শুনে আপনি ভাবেন, ওরা বুঝি আপনিই শিখেছে। তা নয় গো মশায়···

১৮।১০।৩৮ নিবেদন ইতি

শ্রীমান নাচনবাবু

পুনশ্চ নিবেদন, বলেইছি, ও লোহার কাঁটা দিয়ে আঁচড় কাটা আর নকল বুলি দিয়ে কথা বানানো আমার আসে না। ভালোও লাগে না। তাই এ কাজের ভার দিদিমাকে দিলাম। নইলে আবার আপনি হয়তো বুঝতেই পারবেন না, আমি কি বলতে চাচ্ছি।

২০ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

নাচনবাবু,

একেবারে খাঁটি আধুনিক তুমি। পাঁজিও সেই কথা বলে, তোমার ভাষার থেকেও তার প্রমাণ পাই। এ ভাষায় শব্দ আছে যথেষ্ট কিন্তু অর্থ খুঁজে পাইনে। ভাষা যে কিছু বোঝাবার জন্যে সে দায়িত্ব বুঝি একেবারে অস্বীকার করেছ। আমি সেকেলে লোক আমার কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, যা বলব সেটা যেন পাঁচজনে বুঝতে পারে। যেন না ভাবতে বসে আমি পাগল হয়েছি, না, তারা পাগল হয়েছে। পাঁচজনের সম্বন্ধে তোমার মনের এই দীনতা নেই— তার থেকে প্রমাণ হয় তুমি আধুনিক। যারা সাধারণ ব্যক্তি তারা অন্যকে লক্ষ্য ক'রে যা বলে তা বোঝা যায়— তুমি অসাধারণ, তুমি আধুনিক, তুমি কা'কে লক্ষ্য ক'রে কী যে বলো তা যারা বোঝে তারাও তোমার মতোই অদ্বিতীয়। আমার শব্দের মধ্যে অর্থ ঢুকে পড়েছে— ওটা বয়সের দোষ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর থেকেই এই বিভ্রাট ঘটেছে। তোমার মতোই আধুনিকতার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলুম কিন্তু লজ্জা এসে গেছে। তোমার অজস্র ক্ষমতা আছে লজ্জা না পাবার। এর থেকে বুঝি তুমি খাঁটি। তোমার অসংলগ্ন বাক্যাবলীতে ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যায়। আমার সাহস নেই। আজ কিছু কালের মতো তোমারি জিৎ রইল নাচনচন্দ্র— কিন্তু কাল! বলা যায় না, যদি জাতশ্মশ্রু আধুনিকতার ছোঁয়াচ তোমার ভাষায় লাগে তাহলে আমাকে

লক্ষ্য ক'রে যা বলবে সেই শব্দভেদী বাণ গিয়ে পৌঁছবে একে-বারে বৈতরণীতীরে। দোহাই তোমার আমার কথার মধ্যে সহজ অর্থ খুঁজে পেয়ে তোমার মনে যদি অত্যন্ত ধিক্কার জন্মে তাহলে কথাগুলোকে উলটে পালটে দিয়ো— তোমাদের কাজ চলবে। একটা নমুনা দেখাই—

কূলে গরজে। গগনে বসে আছি।

মেঘ একা, ভরসা নাহি

ঘন বরষা।

মনে হচ্ছে না কি, কিছু যেন বলা হোলো, কিন্তু কী যে তা বোঝবার দরকারই নেই। তোমার অভিনন্দনপত্রে বীর হও এ আশা জানিয়েছি কিন্তু কবি হও এ কামনা করি নি। হোতে হোতে হয়তো তোমার ভাষা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে বলা যায় না, কোন্ অকথনীয়ে কোন্ অচিন্তনীয়ে, বাক্যকলেবরের কোন্ অসংযুক্তং অপঘাতে, তখন তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে, যে হেতু বুঝিয়ে বলার চির-প্রচলিত সংস্কারে আমি অভ্যস্ত। যে হেতু এ কালের পরে আমার বিশ্বাস ছিল না, আমার বিশ্বাস চিরকালের পরে।

পুনশ্চ নিবেদন :— আর বিশ বছর পরের তারিখের প্রতি লক্ষ্য ক'রে আমার এ চিঠি লেখা। ইতিমধ্যে তোমার কাকলীপর্ব শেষ হোক। তোমার এখনকার কলালাপ তর্জমা করবার ভার নিয়েছেন দিদিমা। কিন্তু ভুল করেছেন সন্দেহ নেই, কেননা তিনি যা ব্যাখ্যা করেছেন তার আগাগোড়া বোঝা গেল। হে অভাবিক, হে আধুনিক, এই আমার বুঝতে-পারা-ভাষার সহজ

সীমানা থেকেই আজ তোমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে গেলুম— এর পরে সেদিন যে-কোনো ভাষায় ইচ্ছা তুমি উত্তর দিয়ো, আমার আর প্রয়োজন হবে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে, বিনা ভাষায় নীরব চোখ মুখের আলাপ থেকে যারা প্রলাপ মথিত ক'রে তুলতে পারে, তারা নাচন নয়, তারা নাচনীর দল, তারই একটির জন্যে আবেদন জানিয়ে রাখলুম তোমার মায়ের দরবারে। হায় রে, বারবার ভুলে যাই— নাচনী আসবে, কিন্তু (একটা দীর্ঘনিশ্বাস) — ইতি ২০।১০।৩৮

সপ্তকপারবর্তী
কবি

[মন্তব্য]

আপন সম্বলের প্রতি যে শিশু-ভোলানাথের কোনো আসক্তি নেই, আনন্দমত্ত প্রলয়লীলায় যিনি তাঁর প্রতি মুহূর্তের নৈবেদ্য প্রতি মুহূর্তেই সগর্জনে ধূলিসাৎ ক'রে দেন তাঁর সেই বিলুপ্তি-ভাণ্ডের সদ্য ভাঙন নেশার প্রতি ভরসা রেখে সেই অবুঝ দেবতার অবোধ্য ভাষা সম্বন্ধে গোপনে একখানি পত্র লিখে-ছিলেম। শনিগ্রহের চক্রান্তে পত্রখানি ধূলির ঠিকানা এড়িয়ে পড়েছে সম্পাদকের ঝুলির ঠিকানায়। মনে আছে সংস্কৃত ভাষার একটি শ্লোকে পড়েছিলুম— চোখে যে কাজল ভূষণ, সেই কাজলই দূষণ মুখের উপরে। আমার কাজল ঠিকানাভ্রষ্ট হয়েছে

আমার দোষে নয়। চোখের কালিমা যে শিশুর মুখে লাগলেও মানায়, আমার লেখা তাকেই লক্ষ্য ক'রে। আর কেউ যেন আত্মাভিমানে এর প্রতি দাবী না করেন।

নাচনচন্দ্রের দাদু

—

আশীর্বাদ কবিতাটি মূল পাণ্ডুলিপি -অনুযায়ী এবং 'নাচনবাবু' কিশোরকান্তকে 'দাদু' রবীন্দ্রনাথের পত্র রবীন্দ্রসদনের অনুলিপির অনুসরণে মুদ্রিত। নাচনচন্দ্রের চিঠি ও কবির 'মন্তব্য' -সহ উভয়ই 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'অতি-আধুনিক ভাষা' এই শিরোনামে ও ভিন্নরূপ পারম্পর্যে মুদ্রিত। সে স্থলে কবির পত্রের তারিখ আছে ২১।১০।৩৮। 'শনিবারের চিঠি'তে উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর—

১ অসংশ্লিষ্ট

২ 'আর' স্থলে : বোঝবার আর

পরিশিষ্ট ১

পূর্বপত্রের পাঠান্তর ও রূপান্তর

কল্যাণীয়াসু

কাজের ঝঞ্ঝাট বেড়ে উঠেচে। নানা লোকের নানা রকমের ফরমাস খাটতে হয়; তবু সে আমার বহুদিনের অভ্যাসে কতকটা সহ্য হয়ে এসেচে।

কিন্তু নিরতিশয় পীড়িত ক'রে তোলে অত্যাচারের কথা। আমার বেদনাবহ নাড়ী এই রকম কোনও সংবাদের নাড়া খেয়ে যখন ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে, তখন সে যেন কিছুতে থামতে চায় না। সম্প্রতি দেহমনের উপর সেই উপদ্রব দেখা দিয়েচে।

এতদিন বন্যাপ্লাবনের দুঃখ দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে ছিল; তার উপরে চট্টগ্রামের বিবরণটা সাইক্লোনের মত এসে তার সমস্ত বাসাটা যেন নাড়া দিয়েচে।

আমাদের আপন লোক যখন নির্ম্মম হয়, তখন কোথাও কোন সান্ত্বনা দেখিনে। এর পিছনে আর কোনো দুর্‌গ্রহের যদি দৃষ্টি থাকে, তবে তা নিয়ে আক্ষেপ ক'রে কোনো লাভ নেই। বল্‌তে হবে— 'এহ বাহ্য।' সকলের চেয়ে আমাদের সংঘাতিক ক্ষতি এই যে, হিন্দুরা পাছে সমস্ত মুসলমান সমাজের প্রতি বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ কথা বলাই বাহুল্য, এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে এ আমি নিশ্চিত জানি মোটের উপরে ভাল-মত পরিচয়ের অভাব থেকেই আমাদের পরস্পর আত্মীয়তার ব্যাঘাত ঘটে। কোনো জাতের একদল মাত্র যখন অপরাধ করে, তখন সেই জাতের সকলের উপরেই কলঙ্ক লাগে এটা অনিবার্য্য— কিন্তু এ রকম ব্যাপক অবিচার কঠিন দুঃখেও আপন লোকের উপর করা চলবে না।

দেশের দিক দিয়ে মুসলমান আমাদের একান্ত আপন, এ কথা কোনো উৎপাতেই অস্বীকৃত হ'তে পারে না। একদিন আমার একজন

মুসলমান প্রজা অকারণে আমাকে একটাকা সেলামী দিয়েছিল। আমি বললুম, আমি তো কিছু দাবি করিনি। সে বল্‌লে, আমি না দিলে তুই খাবি কি। কথাটা সত্য। মুসলমান প্রজার অন্ন এতকাল ভোগ করেছি। তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, তারা ভালবাসার যোগ্য। আজ যদি তারা হঠাৎ আমাকে আঘাত করতে আসে, তা হ'লে পরম দুঃখে আমাকে এই কথাই ভাবতে হবে, কোনো আকস্মিক উত্তেজনায় তাদের মতিভ্রম ঘটেচে— এটা কখনোই তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি নয়। দুর্দ্দিনে এমন ক'রে যদি আমি ভাবতে পারি, তা হলেই এই ক্ষণকালের চিত্তবিকার দূর হতে পারবে। আমিও যদি রাগে অধীর হয়ে তাদেরই অস্ত্র কেড়ে তাদের উপর চালাই, তা হলেই এ বিকার চিরদিনের মত স্থায়ী হবে— শেষকালে আসবে বিনাশ।

মুসলমান যদি কোনোরকম প্রবর্ত্তনায় হিন্দুকে নিপীড়ন করতে কুণ্ঠিত না হয়, তা হ'লে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ শেল বাইরের নয়, এ মর্ম্মস্থানের বিস্ফোটক— এ নিয়ে রাগারাগি লড়াই করতে গেলে ক্ষত বেড়ে উঠ্‌তে থাকবে। বুদ্ধি স্থির রেখে এর মূলগত চিকিৎসায় লাগা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিলম্ব হলেও সে-ই একমাত্র পন্থা।

যে পরজাতির পক্ষে ভারতবর্ষ অন্নের থালি, তারা যদি সেই অন্ন হ্রাস বা নাশের আশঙ্কায় আমাদের 'পরে কঠোর হয়ে ওঠে, তা হ'লে বুঝতে হবে সেটা স্বাভাবিক, এবং সেটা স্বার্থের জন্যে। এস্থলে তাদের শ্রেয়োবুদ্ধি বিচলিত হ'লে পরমার্থের দিকে না হোক, অর্থের দিকে একটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু আপন লোকের কৃত অন্ধ অন্যায় তাদের নিজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধ। তারা চিরদিনের মত দেশের চিত্তে অবিশ্বাসকে আবিল ক'রে তোলে ; তাতে চিরদিনের জন্যই তাদের নিজের ক্ষতি। যে নৌকোয় সবাই পাড়ি দিচ্চি, দাঁড় মাঝি বা কোনো আরোহীর 'পরে রাগ ক'রে তার তলা ফুটো ক'রে দেওয়াকে জিৎ হওয়া মনে করা চলে

না। ইংরেজ যখন একদা সমস্ত চীনদেশের কণ্ঠের মধ্যে তলোয়ারের ডগা দিয়ে আফিমের গোলা ঠেসে দিয়ে তাদের আরাধ্য দেবতাকে চিরদিনের মত অপমানিত করলে, তখন এ পাপ থেকে অন্তত তারা বৈষয়িক পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু কল্পনা কর, দক্ষিণ-চীন যদি রাগের মাথায় উত্তর-চীনের মুখে বিষ ঢালতে থাকে, তাতে চীনের যে মৃত্যুর সঞ্চার হবে, তাতে দক্ষিণ তার থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। আত্মীয়দের শত্রুতাস্থলে জিৎলেও মৃত্যু, হারলেও মৃত্যু। আমাদের মধ্যে যে-কোনো সম্প্রদায় উগ্র উৎসাহে স্বাজাতিক সত্তার মূলে যদি কুঠার চালায়, তবে নিজে উচ্চ শাখায় নিরাপদে আছে মনে ক'রে খুসি হওয়াটা অধিকদিন টেঁকে না। দুঃখ এই, এই সব কথা দুঃখের দিনেই কানে সহজে পৌঁছয় না। যখন মানুষের রিপু যে-কোনো কারণেই উত্তেজিত হয়, তখন আত্মীয়কে আঘাতের দ্বারা মানুষ আত্মহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইতিহাসে শোচনীয়তম ঘটনা যা ঘটে, তা এমনি করেই ঘটে। মরবার বুদ্ধি পেয়ে বসলে মানুষ আপনিই মরবে জেনেও অন্যকে মারে। আমাদের সাধনা আজ কঠিন হয়ে উঠ্ল। আজ অসহ্য আঘাতেও আত্মসম্বরণ করতে যদি না পারি, তবে আমাদের তরফেও আত্মহত্যার আয়োজন করা হবে; শত্রুগ্রহের হবে জয়।

মন ক্ষুব্ধ আছে বলেই তোমার চিঠির মধ্যে এ-সব কথা লিখ্‌লুম। কথাটা এ স্থলে প্রাসঙ্গিক না হ'তে পারে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক। ইতি ২০শে ভাদ্র, ১৩৩৮। [৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীকে লিখিত ৩৯-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

শ্রীমতী হেমন্তবালাদেবীর তিনখানি পত্র

আপনার ব্যথা ভুলবার
সঙ্কেতটি আমি পরীক্ষা করে'
দেখব।

শ্রীশ্রীহরি

শুক্রবার

শ্রীচরণেষু— দাদা, আপনাকে দেখলে আমি সকল দুঃখ ভুলে' যাই, কোনো কথাই মনে থাকে না। মনে হয়, এক শান্ত নিস্তব্ধ গভীর মহাশূন্যে এসে পড়েছি। এখানে অনাহত প্রণবের ভাষায় শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। বৈষ্ণব-দর্শন বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত "মহাকালপুর" নামক জ্যোতির্ম্ময় কারণলোকে ব্রহ্মানন্দমগ্ন আত্মারাম ঋষিগণের চরম গতিস্থান। আপনাকে দেখলে সেই ব্রহ্মবাদী বেদজ্ঞ ঋষিগণের সত্তারই উপলব্ধি করি।··· দাদা, আপনি যে আমাকে মার সঙ্গে (আপনার বৌমা) পরিচিত করে' দেবেন বলেছেন, আমার ভারি লজ্জা করছে। মা কি তাঁর অযোগ্য সন্তানকে দয়া করবেন? কেন যে সঙ্কোচ করি দাদা, তার কারণ এই, আমি মূর্খ, তার উপর স্পর্দ্ধা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পার নেই। দাদা, আপনি মহান্, উদার, আপনি আমার দেবতা, আপনি এ বিশ্বের আপন জন, আমি মায়ার অঞ্জন চোখে দিয়ে আপনাকে দেখি, যেন আপনি আমার কল্পলোকের রাজা। আপনি সর্ব্বগুণাকর, আমি দোষের আধার, তবুও আপনার স্নেহের ডাকে আমি মায়ামুগ্ধ হয়ে আসি, নিজের ওজন ভুলে যাই, মনে থাকে না, যে, আমাদের মধ্যে বৈষম্য কতখানি! আপনি অভয় দিয়েছেন, সেই সাহসে যা' তা' লিখি, যা' তা' বলি, (আপনি আবার সেই সব চিঠিগুলো রেখে দিয়েছেন,

ছি, ছি) আপনি মহৎ অন্তঃকরণ নিয়ে আমাকে এতটা প্রশ্রয় দেন, তাই আপনার কাছে আমার কোনো লজ্জা— কোনো আবরণ নেই। যে চোখে একবার দেখে ফেলেছি, তা তো আর বদলায় না, সেইজন্যে এখন সম্পূর্ণরূপেই ঐ চরণে আত্মনিবেদন করেছি, আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে'। কিন্তু, কল্পলোক ছেড়ে একবার বাস্তবরাজ্যে নেমে এলে তখন এই পার্থক্যটা বিশেষভাবেই পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। তখন কি আর আপনার সামনেই দাঁড়াতে পারি ? কিন্তু, একমাত্র ভরসা, আপনার দয়া এবং স্নেহ। তাই বলছিলাম, মা তাঁর মূর্খ মেয়েকে আপনার মত করুণার চোখে দেখবেন কি ? মা যদি দয়া করে' আমার সব ত্রুটি মার্জ্জনা করেন, তা' হলে সেটা আশাতীত সৌভাগ্য মনে করব। আর একদিন আপনার চরণদর্শন করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু, পরাধীন অবস্থা, কাজেই ঠিক করে' কিছু বলতে পারছি না। দাদা, দর্শন পাই আর না পাই, আপনার চরণপ্রান্তে যেন আমার বাসা থাকে, যখন আসি, আশ্রয় পাই যেন। দাদা আমার, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক পান্থ-পাদপের গাত্র-নির্ঝর হ'তে জল খেতে চেয়েছিল, পেল না। তার ঘরের জলসত্র বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, আর কেন, সুখের অভিলাষ সর্ব্বত্রই বর্জ্জনীয়। সুতরাং ওই রাতুল চরণ দু'খানি আমার প্রণম্য হয়েই রইলেন। খেলায় কাজ নেই আর। হে ঋষি,— আমার কবি আমার ইষ্টদেবতার অঙ্গে লীন হয়ে রয়েছেন, যখন তাঁকে প্রণাম করব, সেই প্রণামেই কবিকে প্রণাম করা হবে। যখন সেই চিরকিশোরের সুন্দর চরণকমল আমার লীলাস্পদ হয়ে শিরে, নেত্রে, ললাটে, কপোলে পেলব-স্পর্শ দান করবেন, তখন আমি আমার কবির স্নেহস্পর্শ যুগপৎ অনুভব করব।

প্রণাম। নিবেদন ইতি সেবিকা

শ্রীশ্রীহরি

ভরসা—

শ্রীচরণেষু— দাদা, আপনি ভেবেছেন, আমি বিরক্ত হয়েছি, এটা সম্ভব? ঠাট্টা করি বলে', চঞ্চলতা ও দুষ্টুমি করি বলে', আপনার উপর বিরক্ত হতে পারি?··· আপনি জানবেন, আপনার সঙ্গে যে তর্ক করি, সে আপনাকে হারাবার দুরাশায় নয়, সত্যআবিষ্কারের জন্য। আমার গ্রহে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ভক্তি করার কথা হচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করি না যে নবগ্রহস্তোত্র পড়লেই গ্রহের গতি ফিরবে। কারণ, আমার মতে গ্রহ প্রাকৃতিক শক্তি, গ্রহের দেবতা থাকেন তো থাকুন, যেমন রাগ রাগিণীর দেবতা আছেন। সরস্বতীপূজার বেলায় তাঁদের পূজা হয় কিনা, জানি না। আমরা কেউ রাগ রাগিণীর পুজা করি না এটা সত্যি। তেমনি গ্রহও হয়ত কোনো কারণে কারো কারো পূজনীয় হতে পারেন, আমি নিজে সে পূজায় দীক্ষিত হইনি। আমার মতে চন্দ্রসূর্য্য যেমন প্রত্যক্ষ, বাকিগুলিও তাই। পূর্ণিমা অমাবস্যার ভরণের মতন সব গ্রহের শক্তিই এই পৃথিবীতে কাজ করে। রাষ্ট্রিক, সামাজিক, প্রাদেশিক, ব্যক্তিগত, সর্ব্বপ্রকার দৃষ্টিই গ্রহের আছে। গ্রহসংস্থান দ্বারা ম্যালেরিয়া দূর হবে কিনা তারও বিচার হয়। ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প, যুদ্ধবিগ্রহ, আকস্মিক দুর্ঘটনার বিচারও হয়। আপনি পরীক্ষা করে' দেখুন, এইমাত্র আমার নিবেদন। আপনি ভক্তি না করুন, ভক্তি চাই না। পুরুষকার দ্বারা গ্রহখণ্ডন হয় কিনা, জানি না। আমার মতে হয় না। যার কোষ্ঠীতে ঐ খণ্ডনের ব্যাপারও আছে অন্য গ্রহের যোগে, তারই গ্রহখণ্ডন হয়, অন্যের হয় না। বিশ্ববিধাতা আমাদের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারিত করে' দিয়েছেন, জন্মের ষষ্ঠ দিনে নয়, মাতৃগর্ভে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। সেইটেই সুব্যক্ত হয় ভূমিষ্ঠকালে। গ্রহ যেন

ঘড়ি। ঘড়ির হুকুমে সময় চলে না, সময়ের তালেই ঘড়ি চলে। তবুও, ঘড়ি দেখেই সময় ঠিক করতে হয়। তেমনি গ্রহ বিধাতার উপর টেক্কা দেয় না, বিধাতার ইচ্ছাকেই গ্রহ প্রকাশ করে। কোষ্ঠী দেখে সেটা আমরা বুঝতে পারি। আমার এই বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয়, সেটা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিন। গ্রহের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সম্পর্ক নেই। গ্রহ সকলের নিয়ামক। তবে হিন্দুরা এই শাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে' তাই জ্যোতিষ হিন্দুয়ানির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। আমি তর্ক করছি না, জানতে চাই যে, গ্রহ সত্যই বুজরুকির ব্যাপার কিনা? আপনার ন্যায় ব্যক্তি যে জিনিষটি উড়িয়ে দেন, সেটি অন্য পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান লোক কোন্ সাহসে আঁকড়ে আছেন? আমি সেইজন্য কোষ্ঠী বিচার করে' জানতে চাই যে, জ্যোতিষ সত্য কিনা? গোবর যে শুচি, এর প্রমাণ দেওয়া শক্ত, ওটা অভ্যস্ত সংস্কার মাত্র। কিন্তু, গ্রহ যে সত্য, এর প্রমাণ দেওয়া খুবই সোজা— বিচার করে' দেখলেই হ'ল। তবে কি পুরুসকার মান্‌ব না? মান্‌ব। সে এইভাবে, যেমন মুমূর্ষু রোগীরও চিকিৎসা করা হয়, সে মরবে জেনেও। আমার এত দৃঢ় করে' বলা স্পর্দ্ধা, কিন্তু স্পর্দ্ধা করছি না দাদা, আমার বিশ্বাসটা নিবেদন করছি মাত্র। আমার মনে হয়, যাচাই করে' দেখা ভাল যে সত্যি কিনা। ভক্তিশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই এতে।

আপনি ঠিক জানবেন, আপনার প্রতি আমার ভক্তি আছে। কেবল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে', আশ্রমের মুখ চেয়েই আমি নিজের বিশ্বাস নিয়ে আছি। নইলে, আপনি কি বিশ্বাস করেন দাদা, আপনার ডাক শুনবার পরও আমি নিজের গণ্ডীতে পড়ে' থাকতাম? যেদিন শ্রীগুরুদেবের ডাক শুনি, সেদিন কি আমার সংসার সমাজ আমাকে আট্‌কাতে পেরেছিল? সে সময়ে তখনকার অভ্যস্ত সংস্কার ও অভ্যাস কি আমি ছাড়িনি? আজকের এ দিনকে তার চেয়ে কম বলে' আমি

মনে করি না। আপনাকে আমি কারুর চেয়ে কম ভাবতে পারি না। তবে যে তর্ক করি, সেটা সত্যের সন্ধান পাবার জন্যে এবং আচারকে যে আঁকড়ে আছি, সে কেবল পুর্ব্ব প্রতিজ্ঞার জন্যে। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার পুর্ণ পুজা আপনার চরণে দিতে পারছি না। আপনি কি আমার মন দেখতে পাচ্ছেন না দাদা? এই আচার নিয়মের দরুন আমার ইচ্ছামত অনেক কাজই হয় না— আমি অলস, আমার এই আচারের জন্য আমার ইচ্ছামত খাওয়া দাওয়া হয় না। এইজন্যে আচার আছে যে, হয়ত কোন না কোন দিন আমি আশ্রমে যেতে পারব। আশ্রমে আমার শ্রীগুরুদেবের স্মরণতীর্থে যেতে পারলে সেখানকার পাঁচজনের একজন বলে' গণ্য হ'তে পারলে— শ্রীগুরুদেবের শেষ ইচ্ছা সার্থক হবে। তবে যে ওঁদের আজ্ঞা অমান্য করে' আপনার কাছে এসেছি, এটা ওঁদের মতে অপরাধ, এবং আমার মতে আমার প্রাণের টান। আমি এ অপরাধ মেনে নিলাম। আমি যদি আচার ত্যাগ না করি, তবে ওঁদের এ ক্রোধ চিরদিন থাকবে না— অন্ততঃ বাইরে থেকেও আমার পুজা নিবেদন করা চলবে। এইজন্য আচার করি। আপনার সঙ্গে তর্ক করি এই বলে' যে, এগুলি সত্য নয় তা' আপনি কি প্রমাণে সাব্যস্ত করলেন? স্ত্রীআচার দেশাচার লোকাচারে গলদ্ আছে হয়ত। কিন্তু, স্মৃতির আচারের দোষগুণ বিচারসাপেক্ষ। আমি চাই, এর দোষগুণের সম্যক বিচার হোক। ভারতকে প্রকৃতিদেবী পর্ব্বত ও সমুদ্র দিয়ে অন্য দেশের থেকে পৃথক করেছেন। অন্যান্য দেশের বিশেষত্ব মরু, সাগর, পর্ব্বত, তুষার, শ্যামলতা, একা ভারতে সবই আছে। ভারতের রীতি নীতি অন্য দেশের থেকে পৃথক। শাস্ত্রও তাই। এক্ষেত্রে ভারত কেন তার স্বকীয় রীতি নীতি নিয়েই উন্নতির চেষ্টা করবে না, আমার এই অভিযোগ। যদি সে অশক্ত হয়ে থাকে, স্পষ্ট জবাব দিক, আমি এই চাই। তাই আপনার চিঠি আমি

রক্ষণশীলদিগকে পড়তে বলি এবং আপনাকে বারংবার খোঁচা দিয়ে দিয়ে চিঠি আদায় করি। আমি চাই যে, প্রাচীন ও নব্য ভারত তর্ক দ্বারাই হোক বা যেরূপেই হোক, একটা মীমাংসায় আসুক। পণ্ডিতেরা যা' বলবেন তারি অনুমান করে' আমি আপনাকে বলি। কিন্তু, দাম্ভিক পণ্ডিত যাঁরা তাঁরা তর্কই করবেন না, বলবেন, "স্মৃতির বাইরের কারু সঙ্গে স্মৃতির বিচার কেন করব?" কিন্তু, এ দম্ভ অসার। আমি প্রাচীন ভারত বলতে মাত্র স্মার্ত্ত ভারতকে লক্ষ্য করে বলছি— কলির পূর্ব্ব যুগের ভারতকে নয়। যদি উপায় থাকৃত, আমার কাছে যে সব চিঠি আপনি লেখেন, তা' আশ্রমকে দেখাতাম। কিন্তু, নিরুপায়। তাঁরা গণ্ডীর বাইরের কোনো জিনিষ চোখে দেখতেও চাইবেন না।

আমি যে ঘরে বাইরে দোষী হয়েও এ সব চিঠি লিখছি আর চিঠি আদায় করছি, নব্য ভারত এর থেকে তার পথ চিনে নেবে। আমার উপকার না হোক, আমার দেশের আর সকলে উপকৃত হতে পারবে। সুতরাং আমার তর্ক দেখে আপনি আর কিছু মনে করবেন না। যদি আমি পণ্ডিত হ'তাম, বুদ্ধি করে' তর্ক করতাম।

আমার ক্ষুদ্র মাথায় যা' আসছে, তাই বলছি মাত্র। আমি স্মৃতি-শাস্ত্র মোটেই আলোচনা করি নি— মা ছেলেবেলায় উনবিংশতি সংহিতা প্রভৃতি একবার পড়তে দিয়েছিলেন, সে মনেও নেই। এটুকু মনে আছে যে, স্মৃতিসংহিতার বিধান আমাদের দেশাচার লোকাচারের নীচে চাপা পড়ে গেছে— আমরা ঠিক মনুর শিষ্য নই।··· ···

আমি আপনাকে মানি, তাই আপনার সঙ্গে এত তর্ক করি। আপনি আমাদের হিন্দুসমাজের নাড়ীনক্ষত্র জানেন, আপনার কথার দাম আছে— এবং আপনার বিধান মেনেই বাংলার ছেলেরা চলছে— অবশ্য আপনার সদুপদেশগুলো বাদ দিয়ে। কেননা, আপনি পরমাত্মা মানেন, উপনিষদ মানেন, সাধনা মানেন, সংযম মানেন, ওরা তার ধার দিয়েও যায় না।

গ্রহ সম্বন্ধে দু'খানা বই,— আপনি দয়া করে' একটু চোখ বুলিয়ে দেখবেন এবং অন্ততঃ একজনের জন্মসময় আমাকে জানালে আমি সমস্ত ফলাফল এনে দেব, মিলিয়ে দেখে যদি ঠিক না হয়, আমি গ্রহকে আর মানব না। আমার মঙ্গলের জন্যই আশা করি আপনি এটা করবেন।

আপনার স্নেহের ওপর নির্ভর করেই আমি এত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করছি দাদা— রাগ বা বিরক্তির কথা মনে আনবেন না— দুটি পায়ে পড়ি।

প্রণাম নিবেদন ইতি

আপনার

সেবিকা

বুধবার রাত্রি ও

বৃহস্পতি সকাল

শ্রীচরণেষু— শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন,

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণেও বলিয়াছেন,

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

"যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা"

ইত্যাদি-

এগুলি আমার জীবনে আসা অসম্ভব বলিয়াই আমার চিরদিনের ধারণা। কিন্তু, এমন মানুষ তো চোখে দেখিতে পাইলাম। যেদিন শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করি, তখন জ্ঞানবুদ্ধি বেশী ছিল না। পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ছিল না, আনন্দে মাতিয়া আত্মহারা ভাবে দিন কাটিত। যখন তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, তখন আমি তো সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছি। তিনি ২৫।২৬ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর ৩৩ বৎসর বয়সে আমি চলিয়া আসি। তাঁহাকে এসব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখি নাই কখনো। তিনি গম্ভীর, সরস, সুন্দর, আনন্দময়, সরল ও করুণার্দ্র ছিলেন, কিন্তু, প্রয়োজনমত উগ্র কঠোরও হইতে জানিতেন। শক্ত শক্ত কথা বলিয়া মানুষের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিতে জানিতেন—কাঁদাইতে জানিতেন। তখন একটুও দয়ামায়া আসিত না। রাশভারি ছিলেন, কণ্ঠধ্বনি ছিল গম্ভীর।··· এগুলি দেখিয়াছি, কিন্তু, অত বিচার করিয়া কখনো দেখি নাই।

আমার মনে হয়, আপনার প্রকৃতি অধিকতর দৃঢ়, স্থির, আত্মনির্ভর, ও সহিষ্ণু। আপনি প্রশান্ত, আপনার করুণার—স্নেহের অন্ত নাই, কিন্তু, তাহার আবেগ প্রচ্ছন্ন। আপনার বল এত বেশী যে, সে বল-প্রয়োগের জন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োজন হয় না। না মিনতি, না দণ্ডপ্রয়োগ। আপনার কঠোর আদেশেরও প্রয়োজন নাই। মুখের অতি সাধারণ কথাই যথেষ্ট। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আস্থা আছে বলিয়াই আপনি তার অপপ্রয়োগ দূরের কথা, প্রয়োগ করিতেও ইতস্ততঃ করেন। পাশুপত অস্ত্র ছিল বলিয়াই অর্জ্জুন যুদ্ধে অনিচ্ছু হইয়াছিলেন, যাঁদের সে অস্ত্র ছিল না, যুদ্ধোৎসাহ তাঁদেরই ছিল বেশী। আপনার ধর্ম্ম আমি হয়ত গ্রহণ করিব না। আপনার চেয়ে আপনার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা আমার অনুভবে আসে না। আপনি স্বয়ংই পৃথিবীর আশ্চর্য্য পদার্থ। আপনি নিজের চেয়ে বড় কোনো ইষ্টদেবতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন কিনা, জানি না। তাই,

আপনার চেয়ে আমার নিজের কল্পনাই ধর্ম্ম বিষয়ে আমার ভাল লাগে। আমি নিজের ইষ্টদেবতাকে নিজের চেয়ে বড় দেখি, নিজেকে দেখি হীন। আর, আপনার ইষ্টদেবতা যেন আপনার সম্মুখে প্রভাহীন হইয়া পড়েন। আমার তাই মনে হয়।... আপনি আমার জননীর মতই ভোগবিরক্ত উদাসীন। প্রয়োজনীয় ভোগ্য বিষয় অনাসক্তভাবে গ্রহণ করেন। আপনার হৃদয় তাঁহারই মত কারুণ্য ও মমতায় বিগলিত। কিন্তু, তাঁর মত অসহিষ্ণু হঠাৎক্রোধী আপনি নহেন। আপনি বুদ্ধদেবের মত বলিতে শিখিয়াছেন, "আসক্তি ও প্রেম হইতেই শোক হয়, ভয় হয়। উহা হইতে বিপ্রমুক্ত ব্যক্তির শোক নাই, ভয়ই বা কোথায় ?" আপনি আপনার প্রিয় দেবতা নটরাজের মতই সন্ন্যাসী ত্যাগী, অথচ অর্দ্ধনারীশ্বর। সে নারী আপনার অন্তরলোকবাসিনী। আপনি তাঁহার মতনই জ্ঞানী, ধ্যানী, যোগী, আবার সঙ্গীতকলারসিক, নটনাথ। আপনি কখনও মুসলমান ফকির, কখনও হিন্দু আর্য্য ঋষি, কখনও বা খৃষ্টান বিশপ। আপনি বলেন, আপনি গুরু নন, গুরুমশাই নন, পণ্ডিত নন,— কিন্তু, আপনিই যথার্থ আচার্য্য, শিক্ষক, অধ্যাপক। আপনিই পৃথিবীর দৈহিক মানসিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সকল রোগের চিকিৎসক। আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। শূদ্রও আপনি। যখন আপনি জ্ঞানদাতা, তখন ব্রাহ্মণ। যখন পালক ও শাসক, তখন আপনি ক্ষত্রিয়, চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌম, সম্রাট। যখন কৃষিশিল্পের উদ্ভাবক তখন বৈশ্য, যখন সেবাধর্ম্মশিক্ষক তখন শূদ্র। আপনি এত নিরাসক্ত অথচ এমন স্নেহকরুণ! আপনার টেলিফোনের কথাগুলি এমন স্নেহ ও করুণার অমৃতমাখা! কি সৌভাগ্যে আপনাকে আশাতীত কল্পনাতীত রূপে পাইলাম, কি দুর্ভাগ্যের দুর্ভোগে হারাইতেছি? আমার শৈশবে আপনি একজন সাধারণ লেখক বলিয়া গণ্য হইতেন, কিন্তু, তখনি চিরসুন্দর বলিয়া আপনার খ্যাতি ছিল। আপনি সৌন্দর্য্যের জনক, লক্ষ্মীর জনক। আমি আপনার বিরুদ্ধ পক্ষের কথাই চিরদিন শুনিয়া

আসিয়াছি, স্বপক্ষের কথা শুনিতে পাই নাই। কি মায়ামন্ত্রে আমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিলেন! আজ আপনি লেখক নন, হয়ত কবি, কিন্তু সে কোন্ কবি? কালিদাস কি? কদাচ নয়। কলিদাসের সঙ্গে আপনার তুলনা আপনার পক্ষে অবমাননাকর। আপনি কবি-সার্ব্বভৌম। এ উপাধি দিয়াছেন যিনি, তাঁর বুদ্ধিকে আমি বিস্ময়ভরে নমস্কার করি। সৌন্দর্য্যের, রসের, আনন্দের, প্রেমের, জ্ঞানের, কর্ম্মের, বুদ্ধিমত্তার, প্রাণের যেদিক দিয়াই হউক, আপনি প্রত্যেক ভূমিরই রাজা। আপনি কবির বিশেষ শক্তি দিয়া সব কিছু সৃজন করেন, রক্ষা করেন, আবার বিনাশও করেন (যিনি বন্ধমোক্ষরত, তিনিই কবি।) আপনি অনন্ত-কর্ম্মা, অনন্তরূপ। আপনি যে কি, কি যে নন, তা' তো বুঝিতে পারি না। এতদিন আপনি আমার অদেখা হইয়া কোথায় লুকাইয়া ছিলেন?··· আমার শ্রীগুরুর যে সকল সদ্‌গুণে আমি আকৃষ্ট, তাহার অনেকটাই আপনার হৃদয়-প্রসূত। এ কথা আশ্রম হয়ত স্বীকার করিবেন না— আমাকে দোষ দিবেন।···

আপনি নরদেহে ভগবৎবিভূতি, তাই আপনি বিশ্বের পরমাত্মীয়। আপনাকে কেহ স্বীকার করুন আর না'ই করুন, আপনি নিজমহিমায় চিরবিরাজিত। আপনি যদি হিন্দু আচারনিষ্ঠ হইতেন, বিশ্ব বঞ্চিত থাকিত। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মনিষ্ঠ হইতেন, নটরাজের বন্দনাগান হইত না— মানবরূপী ভগবান আপনাকে ধরা দিতেন না। সেদিন যখন আপনার অমৃতকণ্ঠে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র শুনিলাম, মনে হইল, কলির অতীত কোনও যুগে আসিয়াছি, মহর্ষির দর্শন পাইয়াছি। সেই পুণ্য মন্ত্রের সুমধুর ধ্বনি আমার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন তাহা বিস্মৃত না হই।···

আমি নিজেকে একটুও বিশ্বাস করি না, তাই আশঙ্কা হয়, আপনাকে বুঝি বা ভুলিয়া যাইব। কিন্তু,আমার লেখাগুলি জাগ্রত থাকিয়া সাক্ষ্য দিবে

যে, জীবনের কোনো এক অবসরে, আমি সারা জীবন যে রসের পিপাসু, তার উৎস খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম, খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। আমার শ্রীগুরুকে আমি আপনার হৃদয়নন্দনেরই অমূল্য পারিজাত বলি, অথবা আপনার হৃদয়কুঞ্জের মঞ্জুতুলসী। তিনি যখন তাঁহার হৃদয়দয়িতের কণ্ঠলগ্ন হইলেন, তখন তাঁহার জন্মস্থান হইতে ছাড়াছাড়ি হইল। তাঁর নবজীবন-ধারা নূতন খাতে বহিল, তথাপি তাঁর চলন বলন, সৌন্দর্য্যজ্ঞান কবিত্ব, ভাবুকতা, প্রেম, রস, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া তুলিলেও এ কথা ভুলিতে দিল না— যে, অমুক কাননকুঞ্জে তাঁহার জন্ম। তাঁর শৈশবের— বাল্যের কুলাচরিত প্রথায় সংপ্রাপ্ত শ্রীগৌরগোবিন্দ-উপাসনা সেদিন নবভাবে নবরূপে সুন্দর হইয়া উঠিল, যেদিন তিনি আপনার কাব্যরস পান করিলেন। আপনার "অন্তর্যামী" "জীবনদেবতা" আর তাঁর হৃদয়দয়িত ও প্রাণেশ্বরী সেদিন এক হইলেন। তাহার বহুকাল পরে, সংসারের নানা দুর্ব্ব্যবহারে তিনি যখন কাব্যের পুষ্পহার খুলিয়া ফেলিয়া কঠোর কর্ম্মের স্বর্ণশৃঙ্খল পরিলেন, তাঁর তখনকার রূপ আমার কাছে সুস্পষ্ট না হইতেই আমি চলিয়া আসিয়াছি। সেই চিরকিশোরের কৈশোর যৌবনকে না ছুঁইতেই প্রৌঢ়ত্ব তাকে গ্রাস করিল।··· ··· আজ সেই কাব্যের উৎসকে অকস্মাৎ অভাবনীয় রূপে পাইয়া আমি যত্ন করি নাই, জড়ত্বের তামসিকতার আয়েসে চক্ষু মুদিয়া চণ্ডু টানিতেছিলাম, ইত্যবসরে কোন্ কঠোর হস্তের টানে আমার ধন চলিয়া যায়! এ জন্মে আর আপনাকে দেখা, আপনার কথা শোনা, আপনাকে জানা চেনা আমার হইল না। আমার জীবন অসমাপ্ত সৌভাগ্যে, সুসমাপ্ত দুর্ভাগ্যে পূর্ণ রহিয়া গেল।— তবুও মনে রাখিবেন, আমি যতই কেননা অধম হই, আমি আপনার। কারণ, আমি আমার শ্রীগুরুর যে আনন্দসৌরভে মত্ত হইয়াছিলাম, তাহা শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গ-বাহিত হইলেও তাহার মূল বনিয়াদের অনেকখানি আপনারই হৃদরণ্য-প্রসূত। সেই গন্ধ ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আপনাকে পাইয়া গিয়াছিলাম,

রাখিতে পারিলাম না— নিজের কর্ম্মদোষে। আপনি আমার নন, আপনি বরঞ্চ ঐ য়ুরোপীয়দেরই। কিন্তু, আপনার বুকের অন্তস্তলে সেই কৃষ্ণতুলসীর শিকড় এখনো বর্ত্তমান— যার মঞ্জরী একদিন শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের বনমালাবৈজয়ন্তীর স্তবকে দুলিয়াছিল, আর শোভিত হইয়াছিল কনক-কিশোরীর দুটি চারুকর্ণে। আপনার মর্ম্মের সেই তুলসীমূলটুকু যেন বিল্ব বট অশ্বত্থ সহকারের শিকড়ের চাপে মরিয়া না যায়, এই আপনার সেবিকার শেষ নিবেদন।…

আপনি বিশ্বাস করুন, ব্রজের প্রেম কামনাদুষ্ট নহে। যাঁহারা তার নিতান্ত স্থূল দিকটা খুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে প্রণতি নিবেদন করিয়াও আমি আপনাকে জানাই, ব্রজের প্রেম কিরূপ। তাহা জানিতে হইলে পূর্ণব্রহ্মচারী শ্রীনবদ্বীপকিশোরের জীবনী যেন আলোচনা করেন। অর্থাৎ তাঁহার ভক্তভাবগত জীবনী নয়, স্বকীয় আনন্দময় জীবনী। শ্রীগৌরাঙ্গ যে অংশে পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, ভক্ত, যে অংশে তিনি শ্রীকৃষ্ণোপাসনামগ্ন, সে অংশে নয়,— যে অংশে তিনি প্রিয়মণ্ডলীকে লইয়া ব্রজের লীলানুকরণ করিতেছেন, রাসে, দোলে, ঝুলনে, শারদীয় রাসে,— সেইখানে দেখিবেন, তিনি পূর্ণ সংযমী, অথচ প্রেমের অফুরাণ অক্ষয় মানসসরোবর। আপনি আমার ঠাকুরকে এ দিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বাস্তবিক লালসাদুষ্ট নহে। নিরুপাধি প্রেমই তাহার বিশেষত্ব। সে প্রেম নিষ্কাম। ব্রজকিশোরকিশোরীদের চঞ্চলতা ছিল গৌণতম, প্রেমই ছিল মুখ্য। সেই যে প্রেম, তাহা অনাদি অনন্ত নিত্য সত্য সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মেরই অনুকরণ। সেই পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, হিরণ্ময় পরম পুরুষ। তিনি একাধারে নারী ও নর। তিনি আত্মারাম। তিনি রস ও আনন্দের নিত্য উৎস। তিনি বিশ্বকর্ম্মা, কিন্তু "কর্ম্মকার" নহেন— তাঁর কর্ম্মও কাব্যেরই রূপান্তর। আমার এ কথার সাক্ষ্য পাইবেন শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতের এই শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলেই।

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ
একাত্মানৌ অপি, ভুবি পুরা দেহভেদৌ গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥"

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি, অতএব উভয়ে একাত্মা। একাত্মা হইয়াও ভূমণ্ডলে অবতরণকালে দেহভেদে দ্বিধা হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ দুই এক হইয়া চৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছেন। সেই রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যকে প্রণাম করি।······

আমি আপনাকে স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করার স্পর্দ্ধা রাখি না। আমি শুধু বলি, আপনি যেন অনুকূলনেত্রেই ইঁহাকে দেখেন— প্রতিকূল না হন। আপনি যেন বিশ্বাস করেন, যে, আসল বৈষ্ণবধর্ম্ম যাহা, তাহা প্রকৃতপক্ষে কামনাকলুষিত নয়। তাহার অনুশীলনে নির্ম্মল ভগবৎপ্রেমানন্দ প্রাপ্তি হয়। আপনার অন্তরও তাহাই চায়, ভাবিয়া দেখিবেন। আমি নিজদোষে বঞ্চিত বলিয়া ধর্ম্ম দোষী নন। আমার ইচ্ছা করে, আমার সতীর্থগণ যাঁরা প্রকৃত নির্ম্মল ভক্তিমান্— তাঁহারা দেশে দেশে এই মঙ্গলবার্ত্তা প্রচার করুন। কিন্তু, তাঁহারা "প্রচার" ভালবাসেন না। যাক্।··· আমি একে দীনহীন মলিন, অলস জড় অকর্ম্মণ্য ও কামনাকলুষিত, তাহাতে আবার বন্দী। আমার বন্ধন কেহ দয়া করিয়া যদি খুলিয়া দেয়, তবে আমিও প্রাণ-স্পর্শে নির্ম্মল হইব, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য। আমাকে ছাড়িয়া দিক, আমি একবার দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া আসি। কিন্তু, যতদিন বাঁচিব, আমার নিত্য কারাদশা ঘুচিবে না। আমি মুক্তি পাইব না।

"গৌরনামের জয়পতাকা
উড়াইব দেশ বিদেশে"

এ বাসনা সফল হইল না। যাঁহারা এ কাজ করিতেছেন, সেই শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণ, তাঁহাদিগকে আমি বন্দনা করি, তবুও বলি, আসল জিনিষের সন্ধান তাঁহারাও পান নাই। তাঁহারাও বাহ্য অনুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত,—প্রকৃত সন্ন্যাসীর বাহ্য অনুষ্ঠান স্বল্প, ভাবই বেশী।

"প্রতি পুষ্প ধ্যানে করেন
কৃষ্ণে সমর্পণ।"

দিল্লীর বাজারের জিলাপীগুলি ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণসাৎ করিয়া দিলেন। বিশ্বের সর্ব্বত্র— "বন দেখি মনে হয়
এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে পড়ে
এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা
মানয়ে কালিন্দী।"

এই দৃষ্টি লইয়া, এই ভাব লইয়া যিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রজলীলা দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। তাঁর বাহ্যানুষ্ঠান কমিয়া যায়। পরিব্রাজক হইবার বাধা তাঁহার থাকে না। আনন্দ তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে সহজ। আজ তবে আসি।—

... ... [১]

প্রণাম।
নিবেদন ইতি
আপনার সেবিকা

১ শেষাংশ বর্জিত। তিনখানি পত্রের অন্য কোনো অংশ বর্জিত হয় নাই।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের পত্রব্যবহার প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবী (১৮৯৪-১৯৭৬ জুন) এক স্থানে লিখিয়াছেন—

'আমি যে ঘরে বাইরে দোষী হয়েও এ সব চিঠি লিখছি আর চিঠি আদায় করছি, নব্য ভারত এর থেকে তার পথ চিনে নেবে। আমার উপকার না হোক, আমার দেশের আর সকলে উপকৃত হতে পারবে।'

বস্তুতঃ শেষ জীবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রধারার মধ্যে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী কেবল যে সংখ্যাগৌরবেই বিশিষ্ট এমন নয়, রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত ও আত্মপরিচয়ের ব্যাখ্যানের দিক দিয়াও একটি স্বতন্ত্র স্থান ও মর্যাদা অধিকার করিয়া আছে।

'আমার যা শেষ কথা তা আমাকে বলে যেতেই হবে'— মতে স্বতন্ত্র কিন্তু শ্রদ্ধায় অনুগত পত্রলেখিকার সহিত বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের সেই 'শেষ কথা' বিশেষ একটি দীপ্তি ও দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইয়াছিল। জানা যায়— 'আচার বিচার' নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই ইহার অনেকগুলি পত্র গ্রন্থাকারে সংকলনের কথা হয়, সেজন্য কবি-কর্তৃক সম্পাদিতও হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, তবে প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।'

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পত্রব্যবহারের ও সাক্ষাৎ-পরিচয়ের যে বিবরণ, আমাদের নিকট প্রেরিত তাঁহার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রচনায় লিখিয়া দিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ অতঃপর মুদ্রিত হইল।—

আমি যখন কলিকাতায় পতিগৃহে তখন পারিবারিক ও অন্যবিধ অশান্তিতে কাতর হয়ে সাহিত্যের আশ্রয় নিই। আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলাম আমাদের পরিবারের মতের বিরুদ্ধে। এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে যাবার অনুমতি পাবার জন্য বহু চেষ্টা করেও অনুমতি পেলাম না। সেই উপলক্ষ্যে একটা দারুণ বিক্ষোভ ও অশান্তি চলছিল। বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করবার জন্য আমি অন্য পথ ধরলাম।

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও সঞ্চয় পড়ি, তাঁর কবিতা ও গান কিছু কিছু পড়া ছিল— অকস্মাৎ তাঁর একটি নূতন পরিচয় আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং আমার মানসিক অশান্তির সময় আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় উদ্‌বেল হয়ে তাঁকে একখানি পোস্টকার্ড্‌ লিখি— 'যোগাযোগের গ্রন্থকারকে অজস্র নমস্কার'— নিজের নামঠিকানাহীন পত্র।— তার পর তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, নিজের ছদ্মনাম 'জোনাকি' নামে, অন্য একটা ঠিকানা দিই। এ চিঠির উত্তরে[২] তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়ে খুশি হই। তার পর একটি কবিতা প্রার্থনা করি, এবং জানতে চাই, তিনি কার উদ্দেশে কবিতা লেখেন, ভগবান্‌ না মানুষ। উত্তরে কবিতাটিই পাই শুধু, কবিতাটির নাম 'নীহারিকা'।[৩]

এর পর থেকে নানা প্রশ্ন করে করে চিঠি লিখতে থাকি এবং উত্তরও পাই।

'আপনি এমন কবি ও ভাবুক হয়েও বৈষ্ণবধর্ম্মকে কেন সমর্থন করেন নি, এবং সাকার-উপাসনার বিরুদ্ধে বলেন কেন?' —এই একটি প্রশ্ন।

কবিগুরুর সঙ্গে আমার প্রথম পত্রালাপের সময় আমার একটি উপনাম 'জোনাকি' ও আমার রাশিনাম 'দক্ষবালা' এই নাম দুটির অন্তরালে আমার পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়, আমার

মনে তখন পরিতাপের উদয় হল, এই প্রাচীন প্রবীণ পূজনীয় ব্যক্তিটির সঙ্গে কপট ব্যবহার করেছি বলে', অভিভাবকদের ভয়েই[৪] অবশ্য আত্ম-পরিচয় দিই নি তখন। কিন্তু এখন সমস্ত ভয়-সংকোচের বাধা ঠেলে ফেলে একদিন তাঁকে নিজের পরিচয় আর প্রচলিত নামটি জানিয়ে দিলাম পত্রযোগে।

কবি আষাঢ় মাসে কলকাতায় এলেন। আমার ভাই[৫] গিয়েছিলেন দেখা করতে। কবি বললেন, 'বীরেন্দ্রকিশোর, তোমার দিদি ইস্কুল-কলেজে পড়েন নি, কিন্তু তাঁর লেখা দেখে তা বোঝা যায় না' ইত্যাদি, আমাকে একবার দেখতে চাইলেন। আমার ছেলে, বাড়ির অন্য সকলের প্রতিকূলতায় পাছে বিঘ্ন ঘটে এজন্য অন্য সকলের অগোচরে, ২৪ আষাঢ় ১৩৩৮ [৯ জুলাই ১৯৩১] আমাকে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় যান, সেই প্রথম দর্শন। সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমার জীবনে একটি স্মরণীয় পরিবর্ত্তন আসে। নানা কথা, সব মনে নেই ; আমি জপ করে থাকি শুনে স্মিতমুখে বললেন, 'আমিও জপ করি'— তার পর কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক এমন করে আবৃত্তি করলেন যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

প্রণাম করে যখন উঠে আসি, মনে হয়েছিল, আমি তীর্থস্নান করে উঠলাম।

১ প্রবাসীর 'পত্রধারা' সংগ্রহ করে বই ছাপাবার চেষ্টাও হয়েছিল কবি বেঁচে থাকতেই। কিন্তু বিরুদ্ধ অনেক কথা সাধারণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে ব'লে সে চেষ্টা তখন স্থগিত রাখা হয়।

—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। কবি-কথা (১৯৫১) পৃ ৪৮

অপিচ উক্ত গ্রন্থে বর্তমান 'পত্রধারা' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য পৃ ৪৭-৪৮

২ বর্তমান সংকলনের প্রথম পত্র।

৩ এই কবিতাটি ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত ও পরে 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে সংকলিত। রচনা : ১ এপ্রিল ১৯৩১।

৪ আমার অশিক্ষিত মনের স্পর্দ্ধায় তাঁরা অসন্তুষ্ট হতে পারতেন, কেননা, আমাদের বাড়ির কর্তৃপক্ষ এবং আমার মামাশ্বশুরবাড়ির সকলেই পূজনীয় কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিধিনিষেধ ছিল না তাঁদের মধ্যে। কিন্তু আমার মত মূঢ় গ্রাম্যবধূর অসম্ভব ধৃষ্টতা ও স্পর্দ্ধা তাঁরা সইবেন কি করে, এই ভয় আমার মনে ছিল।

—লেখিকা

৫ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ময়মনসিংহ গৌরীপুরের সুবিখ্যাত ভূমাধিকারী দেশপ্রেমিক ব্রজেন্দ্রকিশোরের পুত্র ও শ্রীহেমন্তবালা দেবীর অনুজ।

শ্রীগুরুদেব বহুদিন পূর্ব্বে অন্তর্হিত। তাঁর স্মৃতি শোকস্মৃতি। এবংবিধ মনের অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থিনী হইয়া কবিগুরুর কাছে আসি। কবিগুরু আমার নিকট হইতে কিছুই পান নাই বা প্রত্যাশাও করেন নাই, তিনি আমার ক্ষুধিত পিপাসিত বঞ্চিত চিত্তকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছিলেন; কিছু সৌহার্দ্দ্যের, কিছু করুণার, কিছু স্নেহের আস্বাদ দিয়াছিলেন। আমি শ্রীরাণী মহলানবিশ, শ্রীরাণী চন্দ, শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী এবং অন্যান্যদের মত উঁহার সেবাযত্ন শুশ্রূষা করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করি নাই।... আমি বাহিরের লোক, মাঝে মাঝে আসিয়া চোখের দেখা দেখিতাম ও বিশ্রামভঙ্গ করিয়া বিরক্ত করিতাম, তাঁর কোনো কাজেই আসি নাই।

উঁহার সংস্পর্শে আমি মুক্তির আনন্দ পাইতাম। তাই নানা কৌশলে পত্র আদায় করিতাম। জোড়াসাঁকোয়, বরানগরে, খড়দহে, বেলঘরিয়ায় মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা করিয়াছি। পুত্রকন্যা বধূজামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে করিয়াও আসিয়াছি। আমার মত ঘোর বিরুদ্ধপক্ষীয়া, অশিক্ষিতা, শিষ্টাচারে অনভিজ্ঞা, মূর্খ স্ত্রীলোককে তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া যাবতীয় দোষত্রুটি-সমেত সহ্য করিয়াছেন, আজ সে কথা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিতা হই।

দেশ কাল পাত্র, শিক্ষা ও মতামত, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মমত ও বয়স—প্রত্যেক বিষয়েই আকাশ পাতাল ব্যবধান ছিল। তবু তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষা কখনোই বাধাগ্রস্ত হয় নাই। বুদ্ধির দোষে কত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তাহাও সহ্য করিয়াছেন। আমার সন্তানদের কথা ভাবিয়াছেন, আমার কন্যাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিয়াছেন। এত বেশী ব্যবধানের দূরত্ব অক্লেশে অতিক্রম করিয়া তিনি আমাদের পরিবারের পরমাত্মীয় সমব্যথী দরদী বান্ধব হইয়াছিলেন, কত সময়

কথালাপে বিক্ষুব্ধ মনকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিতেন। কত হাস্য পরিহাস করিয়াছেন, সদুপদেশ দিয়াছেন, এমন-কি অর্থসাহায্য পর্য্যন্ত করিয়াছেন, তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা অবহেলা কখনো করেন নাই। আমার কোনো দিনলিপি রাখার সুবিধা ছিল না বলিয়া যথাযথ বিবরণ অবিকল দিতে পারিব না মনে করিয়া আমি বিশেষ কিছু লিখিতে সংকোচ বোধ করি।

যে ধর্ম্মনিষ্ঠা লইয়া তর্কবিতর্ক ছিল, তাহার পরিণামে এক সময়ে আধ্যাত্মিক অভিভাবকেরা আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া সাময়িক বিচ্ছেদ আনয়ন করেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে নিজের ধর্ম্ম নিজেই আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। সে ভবিষ্যদ্‌বাণী কিছুটা ফলিয়াছে, আমি এক রকম করিয়া মনের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া শান্তি পাইয়াছি। কিন্তু তিনি এখন তাহা জানিলেন না।

—শ্রীহেমন্তবালা দেবী

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হেমন্তবালা দেবীর নিকটে যেভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অপ্রকাশিত নানা রচনায় তাহারও আভাস পাওয়া যায়। বর্তমান **পত্রধারার** পরিপ্রেক্ষিতে সেরূপ একটি রচনা বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ও অনুধাবনযোগ্য মনে হয়, এজন্য পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় উহা সংকলিত হইল।—

আজ সমস্ত সভ্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কোন্ রবীন্দ্রনাথ? মানুষ দোষে গুণে সংগঠিত। তাঁহার মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, মিশ্র, নির্‌গুণ ও বিশুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট এই সমুদয় সত্তাই বর্ত্তমান। কিছু বা জাগ্রত, কিছু বা সুপ্ত। মানুষের আচরণে, বচনে, চিন্তায় এবং কর্ম্মে তাহার আপন বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে এবং কিছু পরিমাণে বৈশিষ্ট্য সে স্বেচ্ছায় অপ্রকাশিত রাখে, আর কিছু পরিমাণ বৈশিষ্ট্য তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। আমার জ্ঞানে কৌতুকপরায়ণ, মজলিসি স্বভাব -বিশিষ্ট, আপনাকে অতিরঞ্জনে **প্রকাশশীল**, এক রবীন্দ্রনাথ আছেন। তিনি অহেতুক পরচর্চ্চাকেও অনুপম বৈদগ্ধ্যের স্তরে উন্নীত করিয়া সভারঞ্জনে সমর্থ। আপাতদৃষ্টিতে (কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখিয়া প্রবঞ্চিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনাও আছে) তিনি বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি বৈষয়িক, তিনি কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন, তিনি বিপক্ষ জনকে সহজে অব্যাহতি দেন না। তর্ক-বিতর্কস্থলে তিনি বাক্যকৌশলে সূক্ষ্মরূপে মানুষকে আহত করিতেও জানেন। তিনি আপনাকে গোপন করিয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপে অভিব্যক্ত করিতেও পারেন— তিনি অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে, কিছুই তাঁহার পছন্দ হয় না, তিনি মানী এবং আত্মগৌরবে পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের চক্ষে তাঁহার নিজের সমস্তই যেন ভাল। তিনি গর্ব্বিত, অত্যন্ত অভিমানী, আবদার-পরায়ণ ইত্যাদি ইত্যাদি বহু। তিনি অভিজাতসন্তান, সুতরাং সমাজের উচ্চস্তরে আসীন থাকিয়া নিম্নস্তর সমূহকে বুঝিবা অবজ্ঞা করিতেও পারেন।

দ্বিতীয় এক রবীন্দ্রনাথ আছেন। তিনি সারগ্রাহী, গুণগ্রাহী, দোষবর্জ্জন ও গুণঅর্জ্জনে যত্নশীল, তিনি সতত আত্মসংশোধনে ও সাধনায়

তৎপর, তিনি পরোপকারী অনলস কর্ম্মযোগী, তিনি স্বার্থত্যাগী, তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য ক্ষমা দয়া সাম্য প্রভৃতি গুণ -বিশিষ্ট, তিনি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, তিনি আত্মবিচারপরায়ণ, আত্মসংযমী, তিনি আত্মবিশ্লেষণকারী, আত্ম-শাসকও বটে। তিনি নিরাসক্ত গৃহী, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পিতা পতি বন্ধু প্রভু ভূস্বামী প্রভৃতি। এক কথায় ইঁহাকে কর্ম্মযোগী বলা যায়। ইনি পরোপকারিতাকেই ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় এক রবীন্দ্রনাথ। যিনি সুকোমল ও সুকুমার, স্পর্শকাতর, অকৃত্রিম সরল প্রীতিস্নেহানুরক্ত, বিশ্বপ্রেমিক, প্রকৃতিপ্রেমিক, পুষ্প-প্রেমিক, যিনি মাতৃস্নেহলাভে বঞ্চিত তাই অতৃপ্ত, যিনি বন্ধুপ্রীতি ও আত্মীয়প্রীতির আদান প্রদানে কৃতার্থ হইয়াও অধিকতর আকাঙ্ক্ষা -পরায়ণ, যিনি সুশীল, সুরুচিসম্পন্ন, বিদগ্ধ, বিদ্বান, পণ্ডিত, মেধাবী, বাগ্মী, গুণী, যিনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, নিজে সুন্দর, অপরকেও রুচিরসুন্দর দেখিতে চাহেন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, সুগায়ক, রচয়িতা, সভামণ্ডনকারী, সুসভ্য, সুসংস্কৃত, সুন্দরস্বভাব, সুস্বর ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি রূপে গুণে সম-সাময়িক সকলের হৃদয়রঞ্জনকারী প্রিয় সুহৃদ।

চতুর্থ এক রবীন্দ্রনাথ। যিনি অদ্ভুতস্বভাব, কখনো আত্মকেন্দ্রিক, বর্ম্মাবৃতচিত্ত। এ ক্ষেত্রে তিনি আপনাকে গুটাইতেই ভালবাসেন, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের সহিত মনোভাববিনিময়ে অনিচ্ছুক, সাম্যমৈত্রীবিহীন, যার তার সহিত সর্ব্বদাই দহরম-মহরম করিতেও অসমর্থ। অথচ দরিদ্র অবহেলিত পীড়িত শোকার্ত্ত কোনো অতিতুচ্ছ জনেরও সেবা শুশ্রূষায় নিজমর্য্যাদা ভুলিয়া স্বহস্তে সকল প্রকার ক্ষুদ্রকর্ম্ম তুচ্ছকর্ম্ম -সম্পাদনেও তৎপর। তাহাদের দুঃখে তিনি অশ্রুল, অথচ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-শোকেও শোকপ্রকাশে কুণ্ঠিত ; আপনার ব্যথা অপরকে জানিতে দিতে চান না— এই ভাব। এক দিকে তিনি অতিতুচ্ছ জনেরও আপন, অন্য দিকে তিনি বিখ্যাত মহাজনেরও কেহই নহেন। এবম্বিধ অদ্ভুত স্বভাবকে সহজে

কেহই সম্যক্‌রূপে চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে, আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ নহে। কেননা কখন যে তিনি আকর্ষক এবং কখন যে বিকর্ষক হইবেন তাহা সহসা উপলব্ধি করা সহজ নহে। সুতরাং তাঁহার চরিত্র কাহারও বোধগম্য হইতে পারে না। কৌতুকচ্ছলেও এই ভাবে তিনি আপনাকে রহস্যময় করিয়া রাখেন। প্রসাদ বা অপ্রসাদ, সংশয় থাকিয়া যায়।

পঞ্চম এক রবীন্দ্রনাথ। তিনি ভাবুক, শিল্পী, কবি। তাঁহার কর্মও কবিত্ব, রচনাও কবিত্ব, জীবনও কবিত্বপূর্ণ। তিনি বহুবল্লভ, তাহাও কবিত্বের জন্য— তিনি ঐকান্তিক, একনিষ্ঠ, তাহাও কবিত্বের জন্য। তাঁহার হাস্য রোদন কবিত্বের জন্য। কবিতাই তাঁহার জীবনের সারাৎসার। তাঁহার সঙ্গীত এই কবিতাকোরকেরই পুষ্পিত পরিণতি। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ আপনাকে অন্তরালে রাখিয়াছেন, কিন্তু কবিতায় ও সঙ্গীতে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে, তাঁহার সঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র জীবন প্রস্ফুটিত বিকশিত হইয়া সুপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহার ভাবনা কল্পনা ও পরিবেশ-রচনায় তাঁহাকে কাব্য-বিলাসী, পদ্মমধুপায়ী, শৌখীন, ভাবুক বলিয়াই যেন মনে হয়।

ষষ্ঠ এক রবীন্দ্রনাথ। নিতান্তই পারিবারিক, স্নেহার্দ্রহৃদয়, শোক-দুঃখ-কাতর, স্নেহপাত্রের কল্যাণকামী, বিধুরহৃদয়, অতিপেলবস্বভাব। আত্মীয়স্বরূপে তিনি সকলেরই সুহৃদ্‌, হিতাকাঙ্ক্ষী, পরম বান্ধব।

সপ্তম এক রবীন্দ্রনাথ। ইনি আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন-পন্থী সাধকগণের সাধনার সার সংগ্রহ করিয়া এক অভিনব ভাবের প্রবৃত্তিতে শান্ত দাস্য সখ্য ও মাধুর্য্য রস -সাধনায় ব্রহ্মের একান্ত উপাসক। ব্রহ্ম তাঁহাকে জগজ্জনক, জগজ্জননী, বিশ্বরাজ, গুরু, প্রভু, প্রতিপালক, দণ্ডদাতা শিবরুদ্ররূপে— অথবা সুন্দর, বিদগ্ধ, সুকুমার, বন্ধু, প্রেমিক হৃদয়-বল্লভ রূপে দেখা দিয়াছেন। এই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রূপে, আপন হৃদয়ের অন্তর্য্যামী রূপে এবং সর্বত্র প্রকাশিত অসংখ্য সীমাবদ্ধ

বস্তুরূপসমূহের মধ্যে অসীম অব্যক্ত অথচ সুসঙ্গত সুষম সূক্ষ্ম পরমাত্মা রূপে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বাস্তববাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি -সম্পন্ন ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে সংশয়ী হইয়াও ভাবনেত্রে শ্রীভগবানকে সমস্ত মানুষের মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, সহসা বিজলীচমকে ক্বচিৎ উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন। গুণীর গুণের মধ্যে তাঁহার গুণগরিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কর্ম্মীর কর্ম্মে, ত্যাগীর ত্যাগে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, প্রেমিকের প্রেমে, সকলের সমস্ত সদ্‌গুণের মধ্যে, তিনি তাঁহারই সদ্‌গুণের বিকাশ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন। আবার মানুষের ও প্রকৃতির অধর্ম্মাত্মক প্রলয়াত্মক বিভীষিকাময় বীভৎসরূপের মধ্যেও তিনি ব্রহ্মেরই প্রলয়ঙ্কর ভীষণ রুদ্ররূপ দেখিয়াছেন। এখানে তিনি সাধক, তপস্বী, মরমিয়া ভক্ত। তাঁহার ব্রহ্ম সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মা, ভীষণ ও মধুর।

অষ্টম এক রবীন্দ্রনাথ। যিনি তুষ্ণীভূত, নিমীলিতনেত্র, মৌনী, বিবিক্ত, চিন্তাশীল, একক। তাঁহার মনের মধ্যে যে কি আছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। তিনি কি ভাবে নিমগ্ন, তিনিই জানেন।

আর এই-সমস্ত রূপেরই যথাযথ সংমিশ্রণে এক রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি, যিনি অতিথি অভ্যাগত আগন্তুকের প্রতি গৃহকর্ত্তা রূপে অথবা সমাজনেতা রূপে, কিংবা পরিব্রাজক অবস্থায় আপনিই অন্যের গৃহে সম্মানিত অতিথি অভ্যাগত আগন্তুক রূপে, সাধারণভাবেই মানুষের সহিত সামাজিকতা শিষ্টাচার ভদ্রতা ও সৌজন্যের আদান প্রদান করিয়া থাকেন। এখানে তিনি সকল সময়ে অকৃত্রিম হইতে পারেন না। দেশকালপাত্রানুসারে তাঁহাকে আত্মরচনা ও আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ একাধারে বাস্তববাদী, দেশকালপাত্রজ্ঞ, এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক অনুভবী।

এবং আমি মনে করি এই সমস্ত বর্ণনার পরেও আরও অনেকবিধ রবীন্দ্রনাথ আছেন, যাঁহাদের কথা এখন আমার স্মরণে তেমন করিয়া আসিতেছে না, যেমন— রোষদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ, মৌনী, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, ক্রোধের ঈষৎ উপক্রমে তাঁহার অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নৈর্ব্যক্তিক তিরস্কার।

ফলকথা রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে যুগপুরুষ— তিনি আন্তর্জ্জাতিক, আন্তর্দ্দেশীয়, নিরপেক্ষ, ন্যায়ের এবং অন্যায়ের নবীন ভাষ্যকার, নূতন-দৃষ্টি-ভঙ্গী-সম্পন্ন পরমবিস্ময়জনক তিনি, বিশ্বের সকলের তিনি আপনজন। তিনি ব্রাত্য, অনাচারী হইতে কার্য্যতঃ বাধ্য, কেননা তাঁহাকে সকলেই আত্মীয়রূপে লাভ করিতে চায়— তিনি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে বাধ্য। তাঁহার খাদ্যাখাদ্যবিচার থাকা সম্ভব নহে, কেননা পৃথিবীবাসী জনগণের গৃহে তিনি অতিথি। তাঁহার ইষ্টদেবতাকে বিশেষ স্থান কাল পাত্র গুণ অবস্থায় আবদ্ধ করিয়া বিশেষ নামে রূপে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের উপাস্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গণ্ডীবদ্ধ রাখাও তাঁহার সাধ্যাতীত। কেননা তিনি যে সকলেরই আত্মীয়। পৃথিবীর সকল ভাষায় ঈশ্বরকে অসংখ্য নাম গুণাদি দান করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পৃথিবীর মানুষ দেশ-কাল-পাত্র-স্বভাব-ভেদে বহুরূপী। তিনি যদি বিশেষ একটি গণ্ডীতেই আপনার ধর্ম্মকে ও আপনাকে আবদ্ধ রাখেন, তবে অন্য সকলের আপনজন হইবেন কিরূপে? যাহারা সেই বিশেষ ধর্ম্মের লোক নহে, তাহারা তাঁহাকে কি মনে করিবে? কাজেই তাঁহার ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষধর্ম্ম। এজন্য তিনি গৃহী হইয়াও ঠিক গৃহস্থ নহেন। তিনি কোনও দেশ কাল জাতি ধর্ম্মের ক্ষুদ্র সীমানায় আপনাকে চিররুদ্ধ রাখিতে পারেন না। তিনি অনন্ত অসীম বিশ্বদেবতার অন্তর্য্যামী পরমাত্মস্বরূপেরই উপাসক। অন্য রূপে তাঁহাকে দেখেন নাই। বাহিরে তিনি আত্মমর্য্যাদারক্ষায় তৎপর, আত্মকেন্দ্রিক, নিরাসক্ত, একক, আপনার চতুর্দ্দিকে আত্মগৌরবের গণ্ডী

রচনা করিয়া বর্ম্মাবৃত, কিন্তু এই বর্ম্মাবৃত অবস্থায়ই তিনি সকলের সহিত আদান-প্রদান-পরায়ণ। তিনি কৌতুকী সখা, তিনি সেবাব্রতী গৃহস্থ, তিনি পরোপকারী সুহৃদ্, তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মযোগী। এ ক্ষেত্রে আপনাকে অভিনেতার ন্যায় সাধনা-দ্বারাই, নানা ভাবে ভাবনায় ভাবিতবৎ করিয়া, নানা জনের মনোরঞ্জনে অথবা মানভঞ্জনে তিনি অভিনিবিষ্ট। ইহার মধ্যে যে আন্তরিকতা নাই এ কথাও বলা যায় না। বরং ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, এমতাবস্থাতেও তিনি আন্তরিক সহৃদয় পুরুষ। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের মতে রবীন্দ্রনাথ মহাসমুদ্র-বিশেষ। তাঁহাকে আয়ত্ত করা সহজ নহে। তাঁহার তত্ত্ব -নির্দ্দেশ অভিজ্ঞ অন্তরঙ্গ জনের পক্ষেও সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। কেননা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বহুভাব-সম্বলিত বহু রূপেই আপনাকে তিনি দেশ কাল পাত্র -অনুসারে, অবস্থা-অনুসারে, বিভিন্ন আকারে প্রকারে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুধা প্রকাশিত করিয়াছেন। যদি পৌরাণিক তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনো হিন্দু তাঁহার চরিত্রের বিচার করেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একাধারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক অথচ বিশ্বপ্রকৃতিতে-বিহরণ-শীল সেই নটরাজের ছায়াই দেখিতে পাইবেন। এমন অদ্ভুত চরিত্র অন্য কোনো দেবতার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, ব্রাহ্ম, বাউল, সুফী, বৌদ্ধ, ক্রীশ্চান সকল ধর্ম্মের সত্ত্বাই তাঁহার ধর্ম্মের মধ্যে নিহিত। আজ ধরিত্রী পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ভয়ে শঙ্কিতা। আজ মহাকাশযাত্রীরা গ্রহান্তরে গমনে উদ্যত। আজ যদি মানুষ তাহার অন্তঃকরণকে রিপুমুক্ত ও নির্দ্দোষ না করে, তবে মানুষই আজ বিশ্বসংহার করিয়া বসিবে। এখন মানুষের নিজের অন্তঃকরণকেই ভয় করা উচিত। পৃথিবীর এই দুর্দ্দিনে এই মহা-অশান্তি-শঙ্কিত সময়ে অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের বাণীকে আশ্রয় না করিলে পৃথিবীর জনগণের চিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্ম ভাব, পাপ-

ভয়, মানবোচিত সদ্‌গুণ-সকল— সাম্য, মৈত্রী, সৌহার্দ্দ্য, স্বার্থত্যাগ, পরোপকারপ্রবৃত্তি সহজে জাগরিত হইবে না। মহাত্মা গান্ধীও সাধক, কিন্তু তাঁহার সাধনা কঠিনতর— সাধারণ সংসারীজন সে সাধনা গ্রহণে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথের ঔদার্য্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা সকলকেই আলিঙ্গন করিয়াছে। তিনি পাপী তাপী দুষ্ট লোককেও অবজ্ঞা করেন নাই। তাঁহার মতে—

দুর্ল্লভ এ ধরণীর তুচ্ছতম স্থান।
দুর্ল্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ॥

তিনি মানুষের চরিত্রের প্রতি আস্থা হারান নাই। অবশ্য মহাত্মাজীও আস্থাবান, নতুবা তিনি সত্যাগ্রহ করেন কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি কঠোরকর্ম্মা, তাঁহাকে জগৎ শ্রদ্ধা করে এবং রবীন্দ্রনাথকে জগৎ ভালবাসে। রবীন্দ্রনাথকে তাহারা গান্ধী অপেক্ষাও আপনজন বলিয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে পারে। গান্ধী প্রণম্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তদপেক্ষা অধিকতর নিকটস্থ। শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, ইঁহারা রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম্মনীতির যে-সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বস্তরে রবীন্দ্রনাথের সহিত মতৈক্য দেখা যায় না। তাঁহারা কোনো না কোনো গণ্ডীতে জীবনকে আবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গণ্ডীবন্ধনের পক্ষপাতী নহেন।

রবীন্দ্রনাথ বিমুক্তচিত্ত বিশ্বপথিক। তাহার দাঁড়াইবার স্থান বা সময় নাই। ক্রমাগত নব নব ভাবে জীবনকে বিভাবিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে করিতেই এই বহুরূপধারী একদা অনন্তে, অসীমে, মহাকাশের অন্তরে হারাইয়া যাইবেন। ঐ অনন্ত আকাশই বহুবিচিত্ররূপ রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্ত প্রতীক। আকাশই রবীন্দ্রনাথ।

—শ্রীহেমন্তবালা দেবী

পত্র ১। "জোনাকি"। প্রথমে এই ছদ্মনামে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন; কখনো বা রাশিনাম 'দক্ষবালা' স্বাক্ষরেও লেখেন। এ বিষয়ে শ্রীহেমন্তবালা দেবী -লিখিত বিবরণ গ্রন্থপরিচয়ের সূচনায় মুদ্রিত।

পত্র ২। 'শিলাইদহের বোষ্টমী'। এই প্রসঙ্গে ৪৫-সংখ্যক পত্রে দ্রষ্টব্য— 'বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্প প্রসঙ্গে ঐ উক্তি। বোষ্টমী বা সর্বখেপীর বিষয় শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁহার 'রবীন্দ্রমানসের উৎসসন্ধানে' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। গল্পগুচ্ছ ৪ (১৩৬৯ ও পরবর্তী সংস্করণ) গ্রন্থপরিচয়ের 'বিভিন্ন ছোটোগল্প' অধ্যায়ে 'বোষ্টমী' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। ১৯৯-সংখ্যক পত্রেও এই বৈষ্ণবী উল্লিখিত।

পত্র ৫। 'আমি গুরু নই আমি কবি।'

পত্র ৬। 'আমাকে··· গুরু বলে গণ্য করলে ভুল করা হবে।'

পত্র ৭। 'গুরুমশায় আর গুরু ··· আমি উক্ত দুই জাতেরি বার।'

পত্র ৮। 'হঠাৎ আমাকে গুরু বলে ভুল কোরো না।'

—এই একটি কথা বর্তমান গ্রন্থে ধৃত অনেকগুলি পত্রেই রবীন্দ্রনাথ বারবার নানাভাবে বলিয়াছেন, যেমন ৩১, ৩২, ৯৯ ও ১০৫ -সংখ্যক পত্রে। ৮-সংখ্যক পত্র (১৯ বৈশাখ ১৩৩৮) লিখিবার কয়েক দিন পরেই, অর্থাৎ ২৫ বৈশাখের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে, রবীন্দ্রনাথ 'নিজের সত্য পরিচয়' দিতে গিয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে যাহা বলেন[১] তাহা ঐ পত্রেরই একাংশের রূপান্তর বলিয়াও গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার পূর্বদিন কবিতা রচনা করিয়াছেন—

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।[২]

বস্তুতঃ, 'আমি গুরু নই আমি কবি' রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি দীর্ঘজীবনে নানা সূত্রেই বলিয়াছেন ; এই প্রসঙ্গে, অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত একটি পুরাতন চিঠি (১৯১২) এ স্থলে উদ্‌ধৃত হইল ; ১০৫-সংখ্যক পত্রের অনুসঙ্গে, অজিতকুমারকে লিখিত আরও পুরাতন একটি চিঠি (১৯১০) অন্যত্র মুদ্রিত হইবে।—

[লণ্ডন ১৯১২]

…আমি এ পৃথিবীতে প্রণাম বাঁচিয়ে চলতে চাই ; যদি পাই তবে সেটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি নে— কেননা, ওটা কিছুতেই আমার পাওনা নয়। পৃথিবীতে কবির দাবির উচ্চ সীমা কোলাকুলি পর্য্যন্ত— প্রণামের দ্বারা তার জাত যায়— আমি কবি ছাড়া যে আর কিছু নই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। আমি তোমাদের হৃদয়ের সমভূমিতেই দাঁড়াতে চাই - সেইখানেই আমার যথার্থ স্থান— উচ্চ ভূমিতে আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমি তোমাদের বারবার বলেছি আবার বলচি— আমাকে ভুল আসনে তোমরা বসিয়ো না— সেটা হয়ত সম্মানের জায়গা হতেও পারে কিন্তু তেমন অসুখের জায়গা আর কিছু নয়— যে পাগড়ি মাথায় হয় না সেই পাগড়ি পরার মত— সর্ব্বদা মনে হয় পড়ে যাবে এবং মাথা ধরে ওঠে। আমি তোমাদের বন্ধু, কিছু দেব কিছু নেব। যদি আমার ভাগ্যক্রমে দেওয়া-বিষয়ে আমার জিত হয় তবু সে বন্ধুত্বেরই দান, সুতরাং তার জন্যে ফিরে আমি কিছু দাবি করব না। গুরুর পদ আমার নয়, নয়, নয়। আমি নিজে কিছু শিখি নি

এবং কাউকে শেখাতেও পারব না ;— আমি পৃথিবীতে সব জিনিষ যেমন করে নিয়েছি তেমনি করেই দিয়েছি অর্থাৎ নিতান্ত পড়ে-পাওয়া ভাবে— তার যদি কিছু দাম থাকে সে দামের পাওনা আমার নয়।

—রবীন্দ্রনাথ। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীকে লিখিত পত্র

বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আলোচ্য পত্রগুলির সমকালীন, শ্রীশৈলেন্দ্র-নাথ ঘোষকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতেও অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—

…আমার আশঙ্কা হয় পাছে আমাকে কেউ ভ্রমক্রমে গুরু ব'লে গ্রহণ করেন— আমার সে পদ নয়। …র কাছে আমি যে সঙ্কোচ জানিয়েছিলুম তার কারণই এই। তুমি যে সাধনার কথা লিখেচ আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। সেই সঙ্গে আমার একটি কথা বলবার আছে এই যে, অন্তরের সাধনার পরিণতি বাইরে— সঞ্চয়ের সার্থকতা দানে। একদিন আমি নিজের আত্মিক নির্জ্জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আনন্দকে সংহতভাবে লাভ করবার জন্যে সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলুম। যে কারণেই হোক সেই নিঃসঙ্গতা থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। অতিশয় একান্তভাবে নিজের সত্তার নিগূঢ় মূলে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া আমার চল্‌ল না, যে বিচিত্র সংসারে আমি এসেচি আপনাকে ভুলে সহজভাবে সেখানে আপনাকে লাভ করতে হবে এই দিকেই আমাকে ভিতর দিক থেকে ঠেলে পাঠালে। আমি স্বভাবতই সর্ব্বাস্তিবাদী— অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে— আমি সমগ্রকেই মানি। গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ ক'রে মাটির তলা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্য্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ ক'রে তবেই সফল হয়ে ওঠে— আমি মনে করি আমারও ধর্ম্ম তেমনি— সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ ক'রে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ ক'রে

সার্থক হ'তে পারবে। এই যে বিচিত্ররূপী সমগ্র, এর সঙ্গে ব্যবহার রক্ষা করতে হ'লে একটি ছন্দ রেখে চল্‌তে হয়, একটি সুষমা,— যদি তাল কেটে যায় তবেই সমগ্রকে আঘাত করি এবং তার থেকে দুঃখ পাই। বস্তুত যখনই কিছুতে উত্তেজনার উগ্রতা আনে তার থেকে এই বুঝি, ছন্দ রাখতে পারলুম না,— তাই সমগ্রর সঙ্গে সহজ যোগ-সূত্রে জটা পড়ে গেল। তখন নিজেকে স্তব্ধ ক'রে জটা খোলবার সময় আসে। এমন প্রায়ই ঘট্‌তে থাকে সন্দেহ নেই কিন্তু তাই ব'লে জীবনের সহজ সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ ক'রে নিজেকে নিরাপদ করা আমার দ্বারা ঘটল না। বিশ্বে সত্যের যে বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্থান পেয়েছি তাকে কোনো আড়াল তুলে খণ্ডিত করলে আত্মাকে বঞ্চিত করা হবে এই আমার বিশ্বাস। যদি এই বিরাট সমগ্রের মধ্যে সহজ বিহার রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারি তবে নিজের অগোচরে স্বতই পরিণতির পথে এগোতে পারব— ফল যেমন রৌদ্রে বৃষ্টিতে হাওয়ায় আপনিই তার বীজকে পরিণত ক'রে তোলে। আমি তাই নানা কিছুকেই নিয়ে আছি— নানা ভাবেই নানা দিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ঔৎসুক্য। বাইরে থেকে লোকে মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসঙ্গতি আছে, আমি তা অনুভব করি নে। আমি নাকি গাই, লিখি, আঁকি, ছেলে পড়াই— গাছপালা আকাশ আলোক জলস্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই। কঠিন বাধা আসে লোকালয় থেকে— এত জটিলতা এত বিরোধ বিশ্বে আর কোথাও নেই। সেই বিরোধ কাটিয়ে উঠতে হবে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার এই চেষ্টার অবসান হবে না। আমার নিজের ভিতর থেকে আশ্রমে যদি কোন আদর্শ কিছুমাত্র জেগে থাকে তবে সে আদর্শ বিশ্বসত্যের অবারিত বৈচিত্র্য নিয়ে। এই কারণেই কোনো একটা সঙ্কীর্ণ ফল হাতে হাতে দেখিয়ে লোকের

মন ভোলাতে পারব না— এই কারণেই লোকের আনুকূল্য এতই দুর্লভ হয়েচে এবং এই কারণেই আমার পথ এত বাধাসঙ্কুল। এক-দিকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে সুরুলের দরিদ্র চাষী পর্য্যন্ত সকলেরই জন্যে আমাদের সাধনক্ষেত্রে স্থান ক'রে দিতে হয়েছে— সকলেই যদি আপনাকে প্রকাশ করতে পায় তবেই এই আশ্রমের প্রকাশ সম্পূর্ণ হ'তে পারবে— তিব্বতী লামা এবং নাচের শিক্ষক, কাউকে বাদ দিতে পারলুম না।

মনে কোরো না যে, তোমার সাধনপ্রণালী ও সাধনফলের প্রতি আমার কিছুমাত্র সংশয় আছে। তোমার প্রকৃতি নিজের পথ যদি খুঁজে পেয়ে থাকে তবে আমার পন্থা তার প্রতিবাদ করবে এমন স্পর্দ্ধা তার নেই। সত্যকে তুমি যে-ভাবে যে-রসে পাচ্চ আমার প্রকৃতিতে যদি তা সম্ভব না হয় তবে সেজন্য পরিতাপ করা মূঢ়তা। ফলের গাছ তার রসের সার্থকতা প্রকাশ করে আপন ফলে, ইক্ষু করে আপন দণ্ডের মধ্যে, কেউ কারও প্রতিযোগী নয়,— বৃহৎ ক্ষেত্রে এক জায়গায় উভয়েই মিলে যায়। ইতি ১১ মার্চ্চ ১৯৩১

—সাধনার রূপ। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৮

'আমার এই চঞ্চলতা যদি না থাকৃত তবে কোন্‌দিন হয় তো হাল আমলের একজন অবতার হয়ে উঠে ভক্তব্যূহের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়তুম'[৩] —বর্তমান পত্রের এই উক্তির অপ্রত্যাশিত কদর্থ কেহ কেহ করিয়াছিলেন মনে হয়, তাহারই আভাস পাওয়া যায় এবং খণ্ডন দেখা যায় শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্র-নাথের একখানি চিঠিতে—

…তোমার লিপির প্রথম ছত্র পড়েই চমকে উঠেছিলুম।… শেষে প্রবাসীতে আমার "পত্রধারা" পড়ে বুঝলুম কোন লেখা থেকে তুমি আমার অপরাধ নিয়েছ।[৩]… তুমি জানো শ্রীঅরবিন্দকে আমি অকৃত্রিম

ভক্তি করি। তাঁকে আমি আধুনিক কালের ব্যবসায়ী অবতারের দলে গণ্য করতে পারি এমন কথা তুমি কল্পনাও করবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। এ কথা সকলেরই জানা আছে বাংলাদেশে অবতারের এপিডেমিক দেখা দিয়েছে তার কারণ সস্তায় মুক্তি পাবার জন্যে একদল লুব্ধ। এরা মোহবিস্তার করে এই মুগ্ধ দেশকে আরো আবিষ্ট করছে একথা তুমিও স্বীকার করবে। দেশে মেকি কবিত্ব অনেক চলছে, তার কাটতিও আছে—তার উপরে যদি শ্লেষকটাক্ষপাত কেউ করে তবে কি আমি বলব এটা আমারি উপরে লক্ষ্য করা হোলো? যাঁদের মহিমা ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করে তাঁদের ভক্তরা তাঁদের সম্বন্ধে যেন নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁরা স্বতই নিরাপদ। অন্তত তাঁরা আমার মতো লোকের অবজ্ঞার লক্ষ্য হতেই পারেন না একথা যদি না বোঝো তবে তাতে আমার প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে, তাঁদের প্রতিও। ভালো জিনিষের কৃত্রিমতা সকলের চেয়ে হেয়—তাকে প্রশ্রয় দিলে বড়ো জিনিষেরই মূল্য কমানো হয়।

—তীর্থঙ্কর (১৩৪৬)। ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২-এর পত্র

পত্র ১১। পৃ ২৯, শেষ অনুচ্ছেদে শ্রীমান্ শ্রীপতি বসুকে 'স্বহস্তে লিখে' পাঠানো যে কবিতার উল্লেখ, বহু বৎসর পরে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে ২৪ বৈশাখের আনন্দবাজার পত্রিকায় সেটির প্রতিচ্ছবি দেখা যাইবে / ১৩৭১ সনে বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রচারিত পঁচিশে বৈশাখের উৎসব-পত্রীতেও ঐ লেখাঙ্কনের রূপ। এ কবিতা সম্পর্কে সকল তথ্যই পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'বৈকালী' গ্রন্থের (আষাঢ় ১৩৮১) বিভিন্ন পৃষ্ঠায়; যথা পৃ ৪২-৪৪, সংখ্যা ৩৯ / যে দীর্ঘ কবিতা প্রথম লিখিত ও প্রচারিত প্রবাসী পত্রের ২৫ বর্ষ-পূর্তির আশীর্বচন রূপে (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ১-২) তাহারই লেখাঙ্কন রূপ। বৎসামান্য পাঠভেদ ছাড়া একটি স্তবকের বিন্যাসে (গ্রন্থে তৃতীয় আর প্রবাসীতে পঞ্চম)

পরিবর্তন ঘটে সত্য কিন্তু অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার নিকট বৈকালীর পাঠই অভ্রান্ত ও আদরণীয় মনে হইতে পারে। নব 'বৈকালী'র বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ে বিশদভাবে দেখানো হইয়াছে (পৃ ১০৪-১০৫) রবীন্দ্ররচনাশৈলীর গুণে পূর্বোক্ত একই কবিতার আধারে কিভাবে গীতবিতান-ধৃত দুইটি গানের আর বহু বৎসর পরে (২৫ বৈশাখ ১৩৩৮) একটি স্বাক্ষর-কবিতার উদ্ভব।

পত্র ১২, ১৩। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ পারস্যভ্রমণে গিয়েছিলেন; পূর্ব বৎসরেই যাইবার আয়োজন হইয়াছিল, অসুস্থতার জন্য সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই।

১৯৩২ সালে পারস্যভ্রমণের কথা ৮১-৮৪ ও ৮৬ -সংখ্যক পত্রে ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত ৯-১০ -সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত। রবীন্দ্রনাথের লেখা পারস্যভ্রমণ-বৃত্তান্ত সমকালীন 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে মুদ্রিত ও সম্প্রতি 'পারস্য-যাত্রী' গ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ১৮ ও ১৯। সৃজনী পত্রে (১৩৬৮) রবীন্দ্র-লেখাঙ্কন মুদ্রিত।

পত্র ২৮-৩০। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সময় রবীন্দ্রনাথ ভূপালে গিয়াছিলেন।

পত্র ৩৬। 'বীরেন্দ্রকিশোরকে পত্রে জানিয়েছিলুম'— বীরেন্দ্রকিশোরকে লিখিত পত্রটিও (২৩ অগস্ট্ ১৯৩১) এই গ্রন্থভুক্ত (পৃ ৪২২)। ১৩৩৮ কার্তিক সংখ্যা হইতে প্রবাসীতে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী 'পত্রধারা' নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে থাকে। ৮৬-সংখ্যক পত্রে তাহার উল্লেখ আছে। এই সময় (আশ্বিন ১৩৩৮) প্রবাসী পত্রে 'নরদেবতা' নামে' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়— 'আমার ধর্মমত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা'র প্রসঙ্গে উহাও দ্রষ্টব্য।

পত্র ৩৮। 'কলকাতায় বন্যার দুঃখ দূর করে একটা অভিনয়'— 'বিশ্বভারতী দুর্গত সহায়ক সঙ্ঘ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত' 'গীতোৎসব', 'অভিনয়রাত্রি ২৮শে, ২৯শে, ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন ১৩৩৮।' ৪১-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'চটি' বা অভিনয়পত্রী হইতে উপরি-উদ্‌ধৃত তথ্যগুলি দেওয়া হইল। ৪২ ও ৪৩-সংখ্যক পত্রেও এই গীতোৎসব উল্লিখিত। এই উৎসবের দ্বিতীয় ভাগে ছিল তৎকালে-লিখিত শিশুতীর্থের নৃত্যাভিনয়।

পত্র ৩৯। 'দেশে বন্যাপ্লাবনের দুঃখ'। ইহার কিছুকাল পূর্বে প্লাবন ও দুর্ভিক্ষে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে সহস্র সহস্র লোক নিরাশ্রয় নিরন্ন হইয়াছিল— ইহাদেরই আনুকূল্যার্থ অভিনয়ের উল্লেখ পূর্বপত্রেই আছে।

তদেব। 'চট্টগ্রামের বিবরণটা'। ইহার কিছুকাল পূর্বে চট্টগ্রামে একজন মুসলমান পুলিস ইন্‌স্পেক্টর একজন হিন্দু তরুণ বিপ্লবী -কর্তৃক নিহত হইলে চট্টগ্রামের মুসলমান-ধর্মাবলম্বী অনেকে দাঙ্গা লুণ্ঠন প্রভৃতিতে লিপ্ত হয়। পুলিস-কর্মচারী অবশ্য সাম্প্রদায়িক কারণে নিহত হয় নাই, অত্যাচারী বলিয়া রাজনৈতিক কারণে নিহত।—

চট্টগ্রামে সম্প্রতি যে লুণ্ঠন, গৃহদাহ, সম্পত্তিনাশ হইয়াছে, তাহাতে এক কোটি টাকার অধিক সম্পত্তি অপহৃত বা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া হিসাব বাহির হইয়াছে। বহুসংখ্যক হিন্দু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। ক্ষতি অপমান কেবলমাত্র হিন্দুদেরই হইয়াছে।

—বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮

'এর পিছনে আমাদের মর্ত্যলোকের বিধাতা পুরুষেরা রয়েচেন'— এ সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' লেখেন—

…শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত মহাশয় টাউনহলের সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার কেম্‌-এর বিরুদ্ধে অতিশয় গুরুতর অভিযোগ

উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বার-বার বলিয়াছেন—মিষ্টার কেম্ ইচ্ছা করিয়া কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, এবং তাঁহার আচরণ হইতে প্রমাণিত হয়, যে, তিনি জানিয়া শুনিয়া চট্টগ্রামের নিরপরাধ শহরবাসীদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুঠ করিবার জন্য (গুণ্ডাদের) প্ররোচনা দিয়াছেন।…

কলিকাতা টাউন হলের সভায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে…যে, চাটগাঁয়ে লুটেরারা যাহা করিয়াছে, তাহা সরকারী কোন কোন কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্ররোচনা বা প্রশ্রয়েই করিয়া থাকিবে ; নতুবা এমন নির্ভয়ে বিনা বাধায় এমন ভয়ানক বে-আইনী এত কাজ তাহারা কেমন করিয়া করিতে পারিল ?

—বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮

তদেব। 'এই চিঠি থেকে কথাগুলো নিয়ে চিঠির আকারেই প্রবাসীতে পাঠাব স্থির করেচি।' ১৩৩৮ আশ্বিনের প্রবাসী পত্রে 'আত্মীয়বিরোধ' নামে ইহা প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে সংকলিত। ১৩৩৮ শ্রাবণের প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত ও কালান্তর গ্রন্থে সংকলিত 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য। সর্ববঙ্গ মুসলিম্ ছাত্রসম্মিলনীর উদ্দেশে প্রেরিত লেখা নিয়ে মুদ্রিত হইল—

সর্ব্ববঙ্গ মুসলিম্ ছাত্রসম্মিলনীর প্রতি সম্বোধন

আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েচে। তাই অবুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গ'ড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভ চেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হ'য়ে দেশকে আহত করচে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মঘাত যে কি সর্ব্বনেশে সে কথা বুঝেও বুঝিনে। যে-শিক্ষা লাভ করচি ভাগ্যদোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হ'য়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্চে।

এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তা'র নিঃশ্বাস রোধ ক'রতে প্রবৃত্ত এ পাপ প্রাচীন যুগের, এই অন্ধ বার্দ্ধক্য যাবার সময় হ'ল। তা'র প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্য্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চিতানল জ্বালিয়েচে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখ পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হ'য়ে যাক্ নিঃশেষে ভস্মসাৎ। বহু যুগের পুঞ্জীকৃত অপরাধ যখন আপন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করে তখন তা'র দুঃখ অতি কঠোর, —এই দুঃখের দ্বারাই অপরাধ আপন বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে উদাসীন চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। একান্ত মনে কামনা করি এই দুঃসহ পরিচয়ের কাল যেন এখনি শেষ হয়, দেশ যেন আত্মকৃত অপঘাতে না মরে, বিশ্বজগতের কাছে বারবার যেন উপহসিত না হ'ই।

আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক্ তরুণদের নবজীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্ম্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হ'য়ে তা'রা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক্। যে দুর্ব্বল সেই ক্ষমা ক'রতে পারে না, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত ক'রে দিক্, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সর্ব্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।

—রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৮

পত্র ৪৭। 'হিজলি হত্যা নিয়ে...পাক খেয়েছি।' হিজলী বন্দীশালায় দুইজন রাজবন্দী -হত্যার প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখের জনসভা ও তথায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের কথা সুবিদিত। এই সভা প্রথমে টাউন হলে হইবার কথা ছিল; জনতা এরূপ বিশাল হয় যে, অবশেষে মনুমেন্টের পাদদেশে সভার অনুষ্ঠান করতে হয়। এ

প্রসঙ্গে ১৩৩৮ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রবাসীতে মুদ্রিত, প্রচলিত কালান্তর গ্রন্থে সংকলিত, 'হিজলি ও চট্টগ্রাম' প্রবন্ধ এবং চতুর্বিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপরিচয়-অংশ দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫৭। 'নাটোরের মহারাজ পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলেন।' রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে ইহার কিছু বিবরণ দিয়াছেন—

With the arrival of Maharaja Jagadindranath of Natore our rustic camp on the sands of the river-bank took on a lively appearance.··· While father would be entertaining the Maharaja, Mother with the help of Amaladidi, who was an expert in the cooking of East Bengal dalicacies, would be busy preparing the meals. Father knew that the Maharaja was a connoisseur in the matter of food and she was determined to satisfy his palate.

–*On the Edges of Time* (1958), p. 31

'কিন্তু নতুন খাদ্য উদ্ভাবনের ভার নিয়েছিলুম আমি।' ১২৫-সংখ্যক পত্রেও এই প্রসঙ্গ পুনশ্চ উল্লিখিত। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ ও দ্বিপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী শ্রীহেমলতা দেবীর 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' (প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬) প্রবন্ধ হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত হইল—

কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার।··· নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া

নিয়ে ব'সে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেকবার। শুধু ফরমাস ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মাল মসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব ক'রে বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।' তিনি চটে গিয়ে বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।'

—শ্রীহেমলতা দেবী। সংসারী রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬

তদেব। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে—'এক টুকরো রূপকথা পাঠিয়েছ। সম্পূর্ণ করো না কেন?... যত পারো রূপকথা সংগ্রহ করে একখান বই যদি বের ক'রো খুব কাজে লাগবে।' ফলে হেমন্তবালা দেবীর লেখা কয়েকটি রূপকথা রবীন্দ্র-দপ্তরে তথা রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে সঞ্চিত হইয়া থাকিলেও, গ্রন্থ প্রকাশ ঘটে নাই কবির আয়ুষ্কালে। তাঁহার অন্তর্ধানের বহু বৎসর পরে ১৩৭২ কার্তিকে হেমন্তবালা দেবীর সচিত্র 'নতুন রূপকথা' আদ্যন্ত-ছাপা হওয়ার পরেও প্রকাশিত হয় নাই/কেননা, একেবারেই প্রচার হয় নাই, আমরা যতদূর জানি। সংকলিত সাতটি রূপকথার উৎকর্ষ যতই থাক্, তাহার স্বরূপ পরিচয় জানেন নাই সুধীজন বা সর্বসাধারণ। এক্ষেত্রে গ্রন্থকর্ত্রীর গ্রহবৈগুণ্য ছাড়া আর কী কারণ থাকিতে পারে আমরা জানি না। আমাদের এ আক্ষেপ কিছুটা দূর হয় শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী -প্রকাশিত ও প্রচারিত হেমন্তবালা দেবীর 'কিশোর-রূপকথা'য় (ভাদ্র ১৩৯৬)। 'নতুন রূপকথা'র দুয়েকটি কাহিনী কেবল এ বইয়ে পাওয়া যাইবে।

সময়ান্তরে প্রকাশিত হেমন্তবালা দেবীর আর দুটি নিবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখ থাক্ এখানেই— অনন্ত চিন্তা (ফাল্গুন ১৩৮১) ও হেমন্তবেলায় (আষাঢ় ১৩৮০)।

'অপূর্ণ' কবিতাটি[৪] (১২০ ও ১২১ পৃষ্ঠার অন্তর্বর্তী) সম্পর্কে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী আমাদের জানাইয়াছেন—

২৪ কার্ত্তিক [৯ নভেম্বর ১৮৯৪] আমার জন্মদিন। আমি পরিহাসচ্ছলেই আবেদন জানালাম যে, কবিগুরুর জন্মদিনে তিনি তো কত কবিতা উপহার পেয়ে থাকেন, কিন্তু আমার জন্মদিনে কেউ কবিতা লেখে না। তিনি যদি আমার জন্মদিনে একটী কবিতা লিখে আশীর্ব্বাদ করেন, তো আমি বিশেষ খুশি হই। সেই প্রার্থনা পূরণের জন্য ১৩৩৮ সালে (সম্ভবতঃ) কার্ত্তিক মাসে এই কবিতাটি লিখে পাঠান আমাকে। আমি নূতন বিস্ময়ে আনন্দে অধীর হই।··· আমার জীবনের একখানি ফোটো-চিত্র ঐ কবিতায় তোলা আছে।··· কবিগুরু কি করে অন্তর্য্যামীরূপে অত কথা লিখলেন তাই ভাবি।

—শ্রীহেমন্তবালা দেবী। শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র

'আমার ফোটো-চিত্র' কথাটা অত্যুক্তি ঠিক নয় তাহা সমঝদার পাঠক (বিশেষতঃ হেমন্তবালা দেবীকে যাঁরা জানেন বা জানিতেন) সহজেই বুঝিবেন। 'জন্মদিন' শিরোনামে ১৩৩৮ পৌষ প্রবাসী পত্রের সূচনায় যে সম্পূর্ণ পাঠ মুদ্রিত তাহার উনশেষ স্তবকে 'হবে কি' স্থলে 'কি হবে', শেষ স্তবকে 'বদ্ধ' স্থলে 'বন্ধ' মুদ্রণপ্রমাদ মনে হয়। (প্রবাসী'তে কবিতার প্রতিলিপি যদি প্রেরিত হইয়া থাকে, লিপি-প্রমাদ নয় তাহাও বলা যায় না।)

পত্র ৬৩। 'জয়ন্তীর প্রবেশিকা'—কলিকাতায় ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সপ্ততিপূর্তি-উৎসব বা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সদস্যপদের দক্ষিণা ছিল পাঁচ টাকা।

পত্র ৭১। 'মহাত্মাজির পত্র পেয়েছি।' ১৯৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক-অন্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত

হন। এই সময় দেশের নানা স্থানে যে অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতেছিল তাহার ফলে অবিলম্বেই তাঁহাকে পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে উদ্যোগী হইতে হয়; ফলে ১৯৩২ সনের ৪ জানুয়ারি তারিখে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাহার পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিম্নমুদ্রিত চিঠিখানি[৫] লেখেন—

Laburnum Road,
Bombay,
3 Jan '32

Dear Gurudev

I am just streching my tired limbs on the mattress and as I try to steal a wink of sleep I think of you. I want you to give your best to the sacrificial fire that is being lighted.

With love
M K Gandhi

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে লণ্ডনের Spectator পত্রে যে বিবৃতি দেন, তাহার মুখ্যাংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

Mahatmaji has been arrested without having been given a chance of coming to a mutual understanding with the Government. It only shows that of the two partners in the building of the history of India the people of India can be superciliously ignored, according to our rulers. However, the fact has to be accepted as a fact, and we must prove to the world that we are important, more important than the other factor which is merely an accident. But if we lose our head and give vent to a sudden fit of political

insanity, blindly suicidal, a great opportunity will be missed. The despair itself should give us the profound calmness of strength, the grim determination which silently works its own fulfilment without wasting its resources in puerile emotionalism and self-thwarting destructiveness. This is the moment when it should be easy for us to forget all our accumulated prejudices against our kindred, when we must do our best to combine our hands in brotherly love even with those who have roughly rejected our call of comradeship, when we must claim of ourselves an intense urge of co-operation with all different parts of our Nation. This is the kind of catastrophe which rarely comes to a people, with a shock that brings to a focus our scattered forces and shortens the difficulties of our creative endeavour in the building of its freedom

The primitive lawlessness of the law-makers should forcibly awaken us to our own ultimate salvation in a love undaunted by the menace of a power which baricades itself with an indiscriminate suspicion that its blind panic cannot define. This is the time when we must never forget our responsibility to prove ourselves morally superior to those who are physically powerful in a measure that can defy their own humanity.

—from Modern Review, Feb. 1982

রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের নিকটেও এই তার-বার্তা প্রেরণ করেন—

The sensational policy of indiscriminate repression being followed by Indian Government starting with imprisonment of Mahatmaji is most unfortunate in causing permanent alienation of our people from yours making it extremely difficult for us to co-operate with your representatives for peaceful political adjustment.

—Modern Review, Feb. 1932

পত্র ৭৯, ৮০। এই সময় কলিকাতার গভর্মেণ্ট্‌ আর্ট্‌ স্কুলে তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমুকুলচন্দ্র দের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। ৮০-সংখ্যক পত্র উক্ত আর্ট্‌ স্কুল হইতে লিখিত।

পত্র ৮১। 'নিজের পদবীগুলোকে মনেও রাখি নে'। উল্লিখিত প্রদর্শনী-সংক্রান্ত কাগজপত্রে, রবীন্দ্রনাথ Sir Rabindranath Tagore বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয় নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল[৬]—

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাইয়াছেন যে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে তাঁহার চিত্রসমূহের যে প্রদর্শনী হয় তাহার আমন্ত্রণীপত্রে এবং ক্যাটালগে তাঁহার সম্মতি কিংবা অনুমতি না লইয়া তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'সার' উপাধি ব্যবহার করা হইয়াছিল। যে উপাধি তিনি স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিয়াছেন তাহা পুনরায় গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

—২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২। আনন্দবাজার পত্রিকা

এই প্রসঙ্গে, ইহার কয়েক বৎসর পূর্বের অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।—

রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' প্রবন্ধের (সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩৩২) অনুবাদ 'The cult of the Charkha' ১৯২৫ সেপ্টেম্বরের মডার্ণ্‌ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইলে, মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে তাহার উত্তর দেন। এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে Sir Rabindranath বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৯২৫ ডিসেম্বর ও ১৯২৬ জানুয়ারি -সংখ্যা মডার্ণ্‌ রিভিউ পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যে এ বিষয়ের কিছু আলোচনা হয়। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য মডার্ণ্‌ রিভিউ'এর নিম্নসংকলিত প্রবন্ধে (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) প্রকাশ পায়—

Rabindranath Tagore and Knighthood

Being aware that a discussion has been raised in regard to my knighthood, I feel it right to put clearly my own view of it before the public. It is obvious that it was solely to give utmost emphasis to the expression of my indignation at the Jallianwalla Bagh massacre and other deeds of inhumanity that followed it that I asked Lord Chelmsford to take it back from me. If I had not fully realised the value of this title, it would have been impertinent on my part to offer it as a sacrifice when such was needed in order to give strength to my voice. I have not the overweening conceit discourteously to display an insincere attitude of contempt for a title of honour which was conferred on me in recognition of my literary work. I greatly abhor to make any public gesture which may have the least suggestion of a theatrical character. But in this particular

case, I was driven to it when I hopelessly failed to persuade our political leaders to launch an adequate protest against what was happening at that time in the Punjab

A title of personal distinction for some merit that has a universal value is never a reward of favour. To show honour where it is truly due is the responsibility of the party who does it and any token of it should not be thrown away, unless for an exceptional occasion or purpose which is painfully imperative. I am not callously insensitive to the approbation which I have been fortunate enough to gain from outside my own country, and for the same reason, I also feel proud that men like Jagadish Chandra Bose and Prafulla Chandra Ray have won a title valuable like any other real recognition which our country may rightfully claim The only complaint that can be made is that this title is fast losing its distinction through its heterogeneous association and that the above-named illustrious countrymen of ours are made to put up with too many strange bedfellows in their career of glory. While concluding, I confess to an idiosyncrasy, which has already been pointed out by the Editor of this journal, that I do not like any addition to my name,— Babu or Sriyut, Sir or Doctor, or Mr., and, the least of all, Esquire.

A psycho-analyst may trace this to a sense of pride in the depth of my being and he may not be wrong.

Rabindranath Tagore

পত্র ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬। ১৯৩২ সালের ১১ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ পারস্যযাত্রা করেন, ৩ জুন তারিখে দেশে ফেরেন। এই চিঠি কয়খানিতে ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত ১০ -সংখ্যক চিঠিতে তাহারই প্রসঙ্গ আছে।

পত্র ৮৯। ১৩৩৯ মাঘের প্রবাসী পত্রে বহুশঃ পরিবর্তিত পাঠ।

পত্র ৯০। 'ইউনিভার্সিটি থেকে নিমন্ত্রণ'। ১৯৩২ সালের ৬ আগস্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন, পারস্য-যাত্রী (১৯৬৩) গ্রন্থে (পৃ ১৬৮-৬৯) মুদ্রিত আছে।

পত্র ৯৭। 'শিবারামের গল্প'— দ্রষ্টব্য 'সে' গ্রন্থ। 'কালের যাত্রায় তোমার বর্ণিত ব্রাহ্মণকন্যা'— 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে 'রথের রশি' নাটিকা দ্রষ্টব্য। বর্তমান প্রসঙ্গে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে এক পত্রে লিখিয়াছেন— 'কৌতুককর ইতিহাস এই যে পূজনীয় কবিগুরু যেন আমার কাছে পত্র লেখাটা কমিয়ে দিতে চান, এই আশঙ্কা মনে আসায় পত্র আদায়ের ফন্দীরূপে আমি ঐ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করি··· যেন আমাকে বিদ্রূপ করেই ঐ সব লিখিয়াছেন।'

পত্র ৯৯। চিঠি লেখার তারিখ ২২ আশ্বিন— 'প্রবাসী' পত্রে ছাপা হয়, মূল পত্রেও দেখা যায়। (মূল পত্রেই তারিখটি কেহ বদল করিয়া থাকিবেন।) কবির স্বহস্তের '২২ আশ্বিন'ই ঠিক হইলে, উহা খৃস্টীয় হিসাবে ৮ অক্টোবর ১৯৩২ হইবে।

পত্র ১০১। 'আমি যখন "স্বদেশী সমাজ" লিখেছিলুম'। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থে (১৩৬৯) সংকলিত হইয়াছে।

পত্র ১০১। 'তারা জানে···প্রতিসুখকর নয়' (পৃ ১৭৭)। ১৯১৬ সালে জাপানে গিয়া জাপানের পাশ্চাত্যানুকরণ সম্বন্ধে কবি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন Nationalism গ্রন্থে এবং জাপান-যাত্রীর (১৩৬৯ সংস্করণ) গ্রন্থপরিচয়ে তাহা মুদ্রিত আছে। জাপানীদের অনেকে এসকল উক্তি অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন নাই। আমেরিকায় মার্কিনী সভ্যতা সম্বন্ধে প্রতিকূল উক্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথ মার্কিন পত্রিকাদির কিরূপ অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, অধ্যাপক স্টিফেন হে সম্প্রতি সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

তদেব। 'যখন জালিয়ানবাগ ব্যাপারে আমি ছাড়া আর সকলেই নীরব ছিলেন'। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -লিখিত একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হইল—

১৯১৯ সাল। গরমের ছুটি হয়ে গিয়েছে। কলেজ বন্ধ। বাইরে যাইনি। পাঞ্জাবের কথা অল্প অল্প করে আসছে লোকমুখে। কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কিছু খবরের কাগজে, কিছু চিঠিতে, জালিয়ানালা-বাগের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। রুচিরাম সাহ্‌নির কাছ থেকে অনেক কথা একদিন বনোয়ারিলাল চৌধুরী কবিকে এসে শুনিয়ে গেলেন। কবি সেই সব শুনে ক্রমেই এমন অস্থির হয়ে পড়লেন যে আমাদের ভাবিয়ে দিলে। রথীবাবুরা বাইরে। আমি মেজোমামাকে (সার নীলরতন সরকার) ডেকে আনলুম। কবির শরীর তখন এমন দুর্বল যে দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। সারাদিন একটা লম্বা চেয়ারে শুয়ে। লেখা বন্ধ। কথাবার্তা কম বলেন। হাসি-গল্প তো নেই-ই। মেজোমামা দেখে complete rest-এর হুকুম দিয়ে গেলেন। শুয়ে থেকে কবি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। Andrews সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটছে, তা নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজন লোকও প্রতিবাদ করবে না, এটা কবির পক্ষে অসহ্য।

Andrews সাহেবকে মহাত্মাজির কাছে পাঠালেন এক প্রস্তাব নিয়ে। তখন বাইরে থেকে পাঞ্জাবে লোক প্রবেশ করা নিষেধ হয়েছে। কবির ইচ্ছা যে মহাত্মাজি যদি রাজী থাকেন, তবে মহাত্মাজি আর কবি দুজনে দিল্লীতে গিয়ে মিলবেন। সেখান থেকে দুজনে একসঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন। ওঁদের দুজনকেই তা হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হবে ওঁদের প্রতিবাদ। Andrews সাহেব মহাত্মাজির কাছে চলে গেলেন।

এদিকে কবির দিন কাটে না। Andrews সাহেবের পথ চেয়ে বসে আছেন।··· ইতিমধ্যে Andrews সাহেব গান্ধিজির কাছ থেকে ফিরে এলেন।··· Andrews সাহেব আসতেই অন্য সব কথা ফেলে [কবি] জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হোলো ? কবে যাবেন ?" Andrews সাহেব একটু আস্তে আস্তে বললেন, বলছি সব— গুরুদেব কেমন আছেন এই সব কথা পাড়ছেন ; কবি আবার বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে কী হোলো ? তখন Andrews সাহেব বললেন যে, গান্ধিজি এখন পাঞ্জাব যেতে রাজি নন্— I do not want to embarrass the Government now— শুনে কবি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বললেন না।

···বিকালবেলা··· জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শুনি কবি একটু আগে একটা ঠিকে গাড়ি ডাকিয়ে বেরিয়েছেন। কোথায় কেউ জানে না। কবি যখন যেখানে যান আমিই ব্যবস্থা করি— আমাকে কোনো খবর দেন নি।

···বেশ যখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে— সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা হবে— কবি একটা ঠিকে গাড়িতে ফিরে এলেন।·· দেখলুম কবি খুব বিচলিত।··

···রাত্রে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয় নি— হয়তো চারটে

হবে— উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের সমাজপাড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে সরকার লেনের রাস্তায়। গলিতে তখনো গ্যাসের আলো জ্বলছে। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। গরমের দিন, দরোয়ানরা বাইরে খাটিয়াতে শুয়ে। তাদের জাগিয়ে দরজা খুলিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির উপরের জানলা দিয়ে দেখলুম বসবার ঘরের উত্তর-পুবের দরজার সামনে টেবিলে বসে কবি লিখছেন। পুব দিকে মুখ করে বসে আছেন। পাশে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো ? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু-তিন মিনিট। তারপরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন পড়ো। বড়লাটকে লেখা নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি। আমি পড়লুম।

কবি তখন বললেন— সারারাত ঘুমাতে পারিনি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার, তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজি রাজি হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ করে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে ? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে— বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তারপরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সব চেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা-ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না। তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই বলে চলে এলুম। অথচ

আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি, তবে লোক জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা নিজের মতো করে বলাই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য করে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।

—'লিপিকা'-র সূচনা। শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৬৭

এই প্রবন্ধ কবির জীবদ্দশায় লিখিত; বক্তব্য অনুমোদন-পূর্বক ৬ জুলাই ১৯৪১ তারিখে তিনি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন; ঐ স্বাক্ষর-সংবলিত অংশের প্রতিলিপিও ঐ প্রবন্ধের সহিত দেশ পত্রে মুদ্রিত। প্রবন্ধটির নাম ''লিপিকা'-র সূচনা' দিবার কী তাৎপর্য, প্রবন্ধের শেষ অংশে ব্যাখ্যাত—

আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। Andrews সাহেব এলেন। বড়ো লাটকে তার পাঠানো— খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামানন্দ বাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এই সব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। দুপুরের দিকে আর জোড়াসাঁকোয় যাইনি। বিকালে গিয়ে শুনি কবি দোতলা থেকে তিনতলায় চলে গিয়েছেন। দক্ষিণের শোবার ঘরে গিয়ে দেখি একটা ছোটো বাঁধানো খাতা, লাল মলাট দেওয়া। তাতে কী লিখছেন। আমি যেতেই বললেন, এই শোনো আরেকটা লেখা, লিপিকার প্রথম যেটা লেখা হয় "বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এল"। তখন পাঞ্জাব কোথায়, জালিয়ানালা-বাগ কবির মন থেকে মুছে গিয়েছে। দিনের পর দিন এক একটা করে "লিপিকা"র লেখা চলতে লাগলো। শরীরের ক্লান্তি, সমস্ত অসুখ তখন একদিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছে।

—'লিপিকা'-র সূচনা। শারদীয় দেশ, ১৩৬৭

'নাইট'পদবী-ত্যাগ-পত্র প্রেরণের পর রবীন্দ্রনাথের ধীরভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কর্তব্য করিবার বিবরণ আরও কেহ কেহ লিখিয়াছেন, অথচ ঐ পত্রের জন্য রাজরোষভাজন হইবার সম্ভাবনা সেদিন প্রভূতভাবেই ছিল—

অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব লিখে গিয়েছেন— মনে রাখতে হবে যে, তখন ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বলবৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, যে তিনি তাঁর এই চিঠির জন্য গ্রেপ্তার, সরাসরি-বিচার ও জেল-এর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠিক সেই সময়েই পাঞ্জাবে অনেকেই এর চেয়ে অনেক কম গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী কাজের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তিবাজেয়াপ্ত শাস্তি পেয়েছেন।

—শ্রীঅমল হোম। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

জালিয়ানওয়ালাবাগ ও রবীন্দ্রনাথ -প্রসঙ্গে বহু তথ্য ও বিবরণ শ্রীঅমল হোম -প্রণীত 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও দ্রষ্টব্য।

'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (১৩৬৪ মুদ্রণ, পৃ ৭৬-৭৭) গান্ধীজি কেন তখন পঞ্জাবে আসিতে চাহেন নাই, সে সম্বন্ধে মহাত্মাজির সহিত গ্রন্থকারের আলোচনার নির্যাস এবং দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের বক্তব্যও মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রতিবাদে সভার আয়োজন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব ১৯২৭ সালে একটি প্রবন্ধে তাহা লিখিয়াছিলেন; 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (পৃ ৭৬) ঐ প্রবন্ধের উল্লেখ আছে।

'নাইট'-উপাধি ত্যাগ করিবার উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ রাজপ্রতিনিধি চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌কে যে চিঠিখানি ইংরেজিতে[৭] লেখেন তাহাও এ স্থলে সংকলন-যোগ্য; পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—

6, Dwarkanath Tagore Lane,
Calcutta, May 30, 1919.

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers. possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been

praised by most of the Anglo-Indian papers, which have, in some cases, gone to the brutal length of making fun of our sufferings without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain, and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor,

for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully,

Rabindrrnath Tagore

পত্র ১০৫। 'আমি কি আজ পর্য্যন্ত কাউকে… আলো দিতে পেরেছি?' অনুরূপ প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের অংশ পূর্বে উদ্‌ধৃত হইয়াছে (পৃ ৪৬৯-৭০), এ স্থলে অপর একখানি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হইল—

…তুমি লিখেছ আমি তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু দিতে পারি নি। সে কথাটা ঠিক— আমি কাউকেই সেরকম ভাবে কিছু দিতে পারিনে— কারণ আমার জীবনে কোনো বড় জিনিষ সচেষ্ট সাধনার ভিতর দিয়ে পাইনে। যখনি আমার কল্পনাদৃষ্টির সামনে কোনো বিশেষ আঘাতে কোনো বিশেষ আবরণ ছিন্ন হয়ে সত্যের কোনো একটি মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েছে তখনি আমি তাকে প্রথম দেখেছি— মনে হয়েছে জগতে এই যেন তার প্রথম প্রকাশ— তাকে আবাহন করে আনবার জন্যে আমি কোনো আয়োজন করিনি— আমি একবারেই না না জেনে তার মধ্যে এসে পড়েছি। আমার জীবনে বরাবর এমনি করে চলে আস্‌চে।

এমন যার অবস্থা সে অন্যকে কোনো মতে চালনা করতে পারে না। ভিতর থেকে প্রকাশ করাই তার কাজ; বাইরে থেকে বিকাশ করানো তার ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতীত।

অর্থাৎ জগতে যদি আমার কোনো সত্যকার স্থান থাকে তবে সে কবি হিসাবে— গুরু হিসাবে একেবারেই না। অথচ কেমন একটা দুর্বি-পাকে আমাকে তোমরা পাঁচজনে মিলে একটা গুরুর আসন দিয়েছ

—এটাকে আমি কোনো মতেই ঠিকভাবে অধিকার করতে পারচিনে—আমি মনে মনে তোমাদের ভক্তির প্রণাম গ্রহণ করিনে— বার বার কুন্ঠিত হই— আপত্তি করেও কোনো ফল পাইনে।

এটা কারো পক্ষেই ঠিক ভাল হচ্চে বলে মনে হয় না। এতে এক দিকে যেমন অন্যায় প্রত্যাশা জন্মে তেমনি অন্য দিকে সেই প্রত্যাশাকে মেটাবার জন্যে একটা অধিকার বহির্ভূত ব্যর্থ চেষ্টার উৎপত্তি হতে পারে। সে রকম চেষ্টা অন্যের পক্ষে যেমনি হোক্ আমার পক্ষে ভাল নয়। কারণ, আমার প্রকৃতিতে চেষ্টা জিনিষটা সত্য পাবার উপায় নয়, বরঞ্চ ব্যাঘাত।

কেবল একজন লোককে মনে পড়ে যে আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করতে পারত। সে হচ্চে সতীশ। তার কারণ, তারও গ্রহণ করবার ইন্দ্রিয় আমার সঙ্গে এক। যিনি ওস্তাদ তিনি সকল তারকেই বাজিয়ে তুল্‌তে পারেন— কিন্তু যে শুদ্ধমাত্র তার, সে নিজে বেজে উঠে' কেবলমাত্র এমন তারকেই বাজাতে পারে, যে তা'র সঙ্গে সমান সুরে বাঁধা। সতীশের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ এ সেই তারের সঙ্গে তারের সম্বন্ধ, কবির সঙ্গে কবির সম্বন্ধ— সাধকের সঙ্গে সাধকের নয়।

আমি অনেক দিন থেকেই ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা করে আস্‌চি তিনি যেন আবুহোসেনের মত আমাকে এমন সিংহাসনে না বসান যেখানে আমার অধিকার নেই। সকলের নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর মন্দিরের সোপান ঝাঁড় দিতে যদি পারি তাহলেই বেঁচে যাই— কিন্তু দশ জনে পড়ে যদি একটা কাজ সেরে নেবার জন্যে মন্দিরের বেদীর উপরে অযোগ্যকে চড়িয়ে দেয়— তাহলে নীচে দাঁড়িয়ে ঝাঁড় দিয়ে যে সেবা করা, সে কাজটা জীবনে আর হয়ে ওঠে না— অথচ তারই মধ্যে গভীর একটি রস আছে— কারণ সে রসের মূল্য মানুষে দেয়

না, তিনিই দেন। আমি সত্যই তোমাকে বলচি কোনো উচ্চ আসনে বসবার জন্যে আমার অন্তরতম আত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা নেই--- কিন্তু এই আসনটাকে যদি অনেকে মিলে অভ্যস্ত করিয়ে তোলে তা হলে বাইরের দিক থেকে সে মানুষকে পেয়ে বসে। বাইরের সঙ্গে অন্তরের এই অসামঞ্জস্য এ ক্ষেত্রে কোনো মতেই কল্যাণকর নয়।

এইজন্যেই মাঝে মাঝে আমার এক একবার বিদ্যালয় থেকে দূরে চলে যেতে ইচ্ছা করে। এবার এই হিমালয়ে এসে আমার মনে হচ্চে, সকলের সব দাবি কাটিয়ে কিছুকাল একলা এইরকম জায়গায় থেকে গেলে আমার যা আবশ্যক তা অনেকটা পূরণ হতে পারে। দৃষ্টিকে সর্ব্বতোভাবে নিজের দিক থেকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সত্য দৃষ্টি পাওয়া যায়— অনন্তের আনন্দরূপ অমৃতরূপ তখনি চারিদিকে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সেই রূপটিকে আমি চোখ মেলে দেখে যাব— এরই জন্যে আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত ক্রন্দন। এই কথাটাকেই সুস্পষ্টভাবে না বুঝেও কৌতুকের ছন্দে আমি লিখেছিলুম—

আমি চাইনে হতে নবযুগে
নব বঙ্গের চালক
যদি পরজন্মে পাই রে হ'তে
ব্রজের রাখালবালক।

ব্রজের বালকের সেই সরল দৃষ্টিটি আছে যাতে না বুঝে না জেনেও সমস্ত সুন্দর করে দেখতে পাওয়া যায়— যে দৃষ্টির কাছে অনন্ত আপনিই দিনে রাতে কাজে খেলায় অতি সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দেন।

কিন্তু রাখাল বালকটাকে গুরুমশায়ের আসনে কে বসালে! এ কৌতুক তার সঙ্গে কে করচে! এ কৌতুক চিরদিন কখনই চল্‌তে পারে না— সে যে রাখাল এ কথাটা কখনই চিরদিন চাপা থাক্‌বে না— ধরা পড়বেই— তার গুরুগিরি একদিন সমস্ত ভেঙে যাবে। এ গুরুগিরি

তার ভালও লাগ্‌চে না। বাঁশের বাঁশিই তার পক্ষে, আর ভাল যমুনার ধার। ঈশ্বর কবে তার সব অহঙ্কার ভেঙে দিয়ে সব আসবাব কেড়ে নিয়ে তাকে তাঁর সেই বনের ছায়ায় ডাক দিয়ে নিয়ে যাবেন! সেইখানেই তো তাকে নিয়ে তিনি বরাবর খেলা করেছেন— এ আবার তাকে কোন্ মুল্লুকে এনে ফেলেছেন! সেই ডাকের অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু ডাক কি আস্‌বে না? তিনি তাঁর খেলার সাথীকে ভোলেন নি— সেই ধূলোখেলার ক্ষেত্রেই তিনি তাকে ডাক দিচ্চেন। কিছুই তাই ভাল লাগ্‌চে না— মন চার দিকে পথ খুঁজে বেড়াচ্চে। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

—রবীন্দ্রনাথ। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

পত্র ১০৫। 'পাশ্চাত্য দেশে এমন কথা অনেকের কাছেই শুনেচি, আমার বাণীতে আমি যে কেবল তাদের খুসি করেছি তা নয়, তারা জীবনের অন্ন পেয়েছে তার থেকে'। প্রথম-বিশ্বমহাযুদ্ধে-নিহত কবি Wilfred Owen-এর জননীর লেখা একখানি চিঠিতে ইহার এক মর্মস্পর্শী আভাস

পাওয়া যায়। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *On the Edges of Time* (pp. 127-28) গ্রন্থ (1958) হইতে ঐ পত্রের কিয়দংশ সংকলন করা গেল—

Shrewsbury.
August 1st, 1920.

...It is nearly two years ago, that my dear eldest son went out to the War for the last time and the day he said Goodbye to me— we were looking together across the sun-glorified sea— looking towards France, with breaking hearts— when he, my poet son, said those wonderful words of yours – beginning at 'When I go from hence, let this be my parting word'— and when

his pocket book came back to me— I found these words written in his dear writing— with your name beneath. Would it be asking too much of you, to tell me what book I should find the whole poem in ?

My precious boy was killed one week before the awful fighting was over— the news came to us on Armistice day. A small book of my son s War Poems will be published very soon— his heart was torn with sorrow at the suffering he saw "out there" and the *callousness* of the majority at home —the futility of War— he speaks not of his own sufferings but any one who loved him can tell from his poems what he had passed through, to be *able* to write as he did. He was only 25. Wilfred loved all that was beautiful, his life was beautiful and of great influence for good. Our God knew but when he took him "hence"— and I must not murmur— for I *know* He is a God of love— and would have answered my constant prayers— if, to come back to me, would have been *best*.…

With great respect and admiration…

Susan H. Owen.

পত্র ১০৭। 'কমলা লেকচার … প্রোফেসারি পদের প্রথম অভিভাষণ'। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে এই সময় 'মানুষের ধর্ম্ম' বিষয়ে কমলা বক্তৃতা দিবার ও বাংলার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

পত্র ১০৭। 'প্রফুল্লজয়ন্তী'। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ('আমরা দুজনে সহযাত্রী' ইত্যাদি) বিশ্বভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (৪০৬ পৃষ্ঠার পরে) তাঁহার হস্তাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত আছে। কবি *Mahatmaji and the Depressed Humanity* পুস্তিকাও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।

পত্র ১১৭। 'নির্জীবকুমার'। শ্রীবাসন্তী দেবীর পুতুল-জামাতা। কন্যার নাম 'অচেতনা'। ইহাদের 'বিবাহ'-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ শ্রীবাসন্তী দেবীকে লিখিত ১৪-সংখ্যক পত্রে দ্রষ্টব্য।

পত্র ১২১। 'ডাকাতকে ভয় করবার' —এই সময়ে শান্তিনিকেতনে একবার ডাকাতি হইয়াছিল।

পত্র ১২৭। 'যে কবিতা পাঠিয়েছ··· কোনো একটা কাগজে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি।' দ্রষ্টব্য চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদ/সে কবিতাটি এ স্থলে সংকলন-যোগ্য—

ব্যর্থ

"জোনাকী"

মরণের আগে প্রার্থনা রেখো, প্রিয়,
একদিন শুধু একদিন মোরে
কঠিন বাঁধনে বেঁধে নিয়ো।

একদিন শুধু পুরায়ো মনের বাসনা,
নয়নে নয়ন মিলায়ে নীরব ভাষণা,

কম্প্র অধরে সাধিয়া সাদরে
একটু অমিয় রমণীয়।

যুগযুগান্তে নব নব রূপে
আসিয়াছ মোর সাধনে,
পড়িয়াছ বাঁধা এই ক্ষীণ বাহু-
বাঁধনে।

চিরজনমের পিয়াসী দুজন
চাপিয়া গিয়াছি মরমকূজন—
এসেছে বাসর, হয় নি পূজন
বনের কুসুমে রমণীয়।

ফিরিয়া গিয়াছে ব্যর্থ রজনী
কাঁদিয়া গিয়াছে পাপিয়া
বৃথাই অলস জাগর যামিনী
যাপিয়া।
তোমার আমার মিছা দেখাদেখি
দিঠিতে দিঠিতে চিঠি লেখালেখি
পুলকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

কাটিয়াছে বেলা অকাজে
আলসে অবশে সলাজে
পূজার লগন হয়েছে মগন
অতীতে,

প্রসাদ লভে নি এ চিত পরমারতিতে
দোঁহে এক হয়ে, সম স্বরে লয়ে
গাহি নাই স্তুতিগীতিকা,
রচি নাই দোঁহে পূজার অর্ঘ্য-
বীথিকা।
সফল সাধনে চির আরাধনে
হেরি নাই চিরবরণীয়
জীবনে মরণে স্থচির স্মরণে
শরণীয়।

—বিচিত্রা। মাঘ ১৩৪০, পৃ ২৪

পত্র ১৩২, ১৩৩। ১৩৩-সংখ্যক পত্রে মহাত্মা গান্ধীর যে মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন, উহা অতঃপর মুদ্রিত হইল—

It has caused me a painful surprise to find Mahatma Gandhi accusing those who blindly follow their own social custom of untouchability for having brought down God's vengeance upon certain parts of Bihar, evidently specially selected for his desolating displeasure. It is all the more unfortunate because this kind of unscientific and materialistic views of things are too readily accepted by large sections of our countrymen.

I keenly feel the indignity of it when I am compelled to utter the truism in asserting that physical catastrophes have their inevitable and exclusive origin in a certain combination of physical facts. Unless we believe

in the inexorableness of universal laws in the working of which God himself never interferes, imperilling thereby the integrity of His own creation, we find it impossible to justify his ways on occasions like the one which has sorely stricken us in an overwhelming manner and scale.

If we associate the ethical principles with cosmic phenomena we shall have to admit that human nature is morally superior to Providence that preaches its lessons in good behaviour in orgies of the worst behaviour possible. For we can never imagine any civilised ruler of menmaking indiscriminate examples of casual victims including children and members of the untouchable community in order to impress others dwelling at a safe distance who possibly deserve severer condemnation. Though we cannot point out any period of human history that is free from iniquities of the darkest kind, we still find citadels of malevolence yet remain unshaken, that factories that cruelly thrive upon the abject poverty and ignorance of famished cultivators, or prison houses in all parts of the world where the penal system is pursued, which most often is a special form of licensed criminality, still stand firm. It only shows the law of gravitation does not in the least respond to the stupendous load,of callousness that accumulates till

the moral foundation of our society begins to show dangerous cracks and civilisations are undermined.

What is truly tragic about it is the fact that the kind of argument that Mahatmaji used by exploiting an event of cosmic disturbances, far better suits the psychology of his opponents than his own and it would not have surprised me at all if they had taken this opportunity of holding him and his followers responsible for the visitation of divine anger. As for us we feel perfectly secure in the faith that our own sins and errors, however enormous, have not got enough force to drag down the structure of creation to ruins. We can depend upon it, sinners and saints, bigots and breakers of conventions. We who are immensely grateful to Mahatmaji for inducing, by his wonderful inspiration, freedom from fear and feebleness in the minds of his countrymen, feel profoundly hurt when any words from his mouth may emphasise elements of unreason in those very minds, unreason which is the fundamental source of all blind powers that drive us against freedom and self-respect,

Rabindranath Tagore

এই বিবৃতির উত্তরেও মহাত্মা গান্ধী Harijan পত্রে (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) স্বীয় মন্তব্যে তাঁহার গভীর বিশ্বাস দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন।

পত্র ১৪৩। ‘আমি সীতার নিন্দা করেচি’ এই অপবাদ ‘ঘরে বাইরে’ প্রকাশের সমকালীন; এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে ‘ঘরে বাইরে’র গ্রন্থপরিচয়ে, ১৩২৬ চৈত্রের প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত ‘সাহিত্যবিচার’ প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন-কি আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না।’

পত্র ১৫০। দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের পরলোকগমনে (৫ এপ্রিল ১৯৪০) শান্তিনিকেতন-মন্দিরে উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহার অনুলিখন (‘দীনবন্ধু এণ্ডরূজ’) ১৩৪৭ বৈশাখের প্রবাসীতে মুদ্রিত। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব শান্তিনিকেতনে যোগ দিলে ১৯১৪ সালে তাঁহার সংবর্ধনা-উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লেখেন, এ স্থলে সংকলিত হইল—

চার্ল্‌স্‌ এণ্ডরূজের প্রতি

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।

—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

Letters to a Friend গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে লিখিত অনেকগুলি পত্র মুদ্রিত আছে।

পত্র ১৫২। ‘তোমার প্রেরিত ফলের ঝুড়ি এই মাত্র এসে পৌছল।…

শীতলপাটিও ব্যবহারে লাগ্‌বে।' এ বিষয় সম্পর্কে শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েক দিন পূর্বের চিঠিখানি দ্রষ্টব্য—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সবিনয় নমস্কার সম্ভাষণ

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমার কোনো লোক এখন থাকে না। আমাদের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী প্রতাপচন্দ্র তলাপাত্রকে লিখে দিয়েছি তিনি ফল পাঠাবার ভার নিতে পারবেন। কাল অর্থাৎ শনিবারে যে কোনো সময়ে সেখানে জয়নারাণ দরোয়ানের কাছে ঝুড়ি রেখে গেলে প্রতাপ পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। হেমন্তবালাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্ষয়বাবু ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি ও পরিবারের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। ৯।১ এ, কালু ঘোষ লেনের ঠিকানা হইতে ৭ অক্টোবর রবিবারে ১ খানি শীতলপাটী ও নানাপ্রকার ফল প্রেরিত হয় জোড়াসাঁকোর বাটীতে।

পত্র ১৮১। 'ভিক্টোরিয়া'— ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, 'বিজয়া' নামে ইহাকে পূরবী গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত। (বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: শ্রীমতী প্রতিমা দেবী -প্রণীত 'নির্বাণ'।) সাহিত্য আকাদেমি -কর্তৃক রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত Rabindranath Tagore: 1861-1961 গ্রন্থে 'Tagore on the Banks of the River Plate' প্রবন্ধে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্র-স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পত্র ১৮৩। এই পত্র লিখিবার কিছু কাল পূবে কালীঘাটে পশুবলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র শর্মা অনশনব্রত আরম্ভ করিলে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন—

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা

প্রাণ-ঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার,
তোমারে জানাই নমস্কার।

হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সংকোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার
ক্ষালন করিবে তুমি সংকল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার

মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন
মুখরিত করে মাতৃ-মন্দিরপ্রাঙ্গণ।
অবলের হত্যা অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—
এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশমাতার,
তোমারে জানাই নমস্কার

নিঃসহায়, আত্মরক্ষা-অক্ষম যে প্রাণী
নিষ্ঠুর পুণ্যের আশা সে জীবেরে হানি',
তারে তুমি প্রাণমূল্য দিয়ে আপনার
ধর্ম্মলোভী হাত হতে করিবে উদ্ধার—
তোমারে জানাই নমস্কার

১৫ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

—প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৪২

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানিতে চাহিলে তিনি উত্তরে লেখেন—

…সম্প্রতি একটি পত্রের উত্তরে এ সম্বন্ধে যা **লিখেছি**[৮] আপনাকে পাঠাই। শক্তিপূজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনও কখনও ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে। পশুহত্যাও রহিত হবে এই আশা করা যায়। ইতি ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

—রবীন্দ্রনাথের পত্র। প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২

পত্র ২০৮। 'সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞানের বই আমি বেশি পড়ে থাকি।' এই প্রসঙ্গে, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর 'The Poet at Work' প্রবন্ধের অংশবিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইতে পারে—

It is said that a man's library betrays the intimacies of his mind. Certainly the Poet's peregrinations in the world of printed matter have left their mark in the Visvabharati Library…Browsing in its cool chambers… we have stumbled upon strange data,…We have discovered, to mention only **a few items,** that the Poet in his tendencies is not only a farmer but a philologist ; historian as well as physician ; a keen student of astrophysics, geology, bio-chemistry, entomology. We find him actively engaged in co-operative banking, experimenting with sericulture, indoor decoration, production of hides, manures, sugar-cane and oil ; organizing local pottery, weaving-looms, lacquer-work ; introducing tractors, formulating new schemes of village economics, and new recipes for cooking. Books on lighting and drainage system, calligraphy,

plant-grafting and meteorology show unmistakable signs of pencilled perusal; synthetic dyes, parlour games, not to speak of whole encyclopaedias and comparative dictionaries have been probed by his lance-like intellect. Egyptology, road-making, incubators, wood-blocks, elocution and Jiu-jitsu have competed with printing presses and stall-feeding for equal claims on his attention.

—**The Golden Book of Tagore (1931), p 45**

পত্র ২১৮। টাউনহলে বক্তৃতার উপলক্ষ্য— দেশে ফিরাইয়া আনিবার দাবিতে আন্দামানে রাজবন্দীদের স্বেচ্ছায় অন্নগ্রহণ ত্যাগ।

'আন্দামানের ১৮৭ জন বন্দী প্রায়োপবেশন করায় সর্ব্বত্র জনগণের মন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহা প্রথম প্রকাশ পায় কলিকাতার টাউন-হলের বহুজনাকীর্ণ সভায় [২ অগস্ট্ ১৯৩৭] যাহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মন্তব্য পাঠ করেন।'* রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সারাংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

It is more than a week since about 200 political prisoners have gone on hunger-strike in the Andamans. The news of the hunger-strike was withheld from us for a long time. This callous indifference to public sentiment is a sad reminder of our national helplessness. In England or in any other democratic country government would not dare keep a fact of such national importance as this hunger-strike secret for such a long time.

The political prisoners have demanded repatriation to India from the Andamans. Their demand is just and modest. When the power is not responsible to the people of this country, it is only natural that the people will be apprehensive of the treatment that is meted out to political prisoners exiled in an island thousands of miles away from India and demand that these political prisoners should be kept in India where at least some kind of popular control can be exercised to soften the inhuman rigour of prison life in India.

It appears that the Government of India have shifted their own responsibilities regarding the question of repatriation of the Andaman prisoners on to the shoulders of the Bengal Government. Moreover, the Government of India have rejected the petition of the political prisoners on the plea of their inability to consider the collective petition of all prisoners.

Once again the heartless inflexibility of the Government machinery has triumphed over its sense of humanity and justice.

In those Provinces of India where the representatives of the people have taken up the reins of administration, political prisoners have been unconditionally released and all encroachment on the civil liberty of the people has been removed.

It is only in the Province of Bengal that hundreds of boys are detained without trial. The Press is now and then gagged to remind us of the power that is not answerable to the will of the people of this country, and the civil liberty that the people of Bengal enjoy has become as unreal as a mirage in the desert.

We all know that once before in the past, during another hunger strike amongst the political prisoners in the Andamans, three young lives were lost. Two of them were the direct victims of the cruel system of forced feeding. Shall we or the Bengal Government allow the same tragedy to occur in a larger number this time once again ?

I appeal to the Bengal Government to line up with the Governments of Bombay, Madras and the Central Provinces and to treat with broad-minded sympathy and humanity the case of political prisoners and detenus.

The pitiless method of punishment that still persists in most parts of the world in their penal system is enough to condemn human civilisation, but of late an aggravated spirit of vindictiveness has suddenly grown in virulence in some of the Western countries in their dealings with political victims. India has not altogether

escaped in her government from manifesting in some degree such Fascistic infection which has scant respect for the law and for the legitimate claim of human freedom.

And, the gloom of despair has spread from hundreds of stricken homes over this unfortunate province when men and women of tender age are made to suffer an indefinite period of detention without trial, undergoing various modes of penalty, physical and psychological.

On this present occasion I am requested by my countrymen to lend my voice in asking our rulers, not for any radical change in the administration of the law, which no doubt is sorely needed, but for some mitigation in its severity.

—Madras Mail, August 3, 1937

অতঃপর শান্তিনিকেতনে আন্দামান-দিবসে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' নামে তাহা কালান্তর গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্র ২০৯। '২৫ বৈশাখ এত ঊর্দ্ধে আমাকে··· আক্রমণ করতে আসবে না'।

পত্র ২১১। 'এখানে এসেও জয়ন্তীর হাত এড়াতে পারি নি।'

রবীন্দ্রনাথ এই বৎসর ২৯ এপ্রিল আলমোড়া যাত্রা করেন; ২৯ জুন পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়কার বিবরণ A.K.C. [শ্রী অনিলকুমার চন্দ] -লিখিত 'With Rabindranath in Almora' প্রবন্ধে মুদ্রিত আছে। তাহা হইতে এই বৎসরের জন্মোৎসবের বিবরণ পরপৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত হইল।—

On the 8th of May we had the pleasant function of a small afternoon party in honour of Gurudeva's 77th birthday. Just about 30 local representative residents, Indian and European, came in the afternoon with their greetings and we entertained them to tea. It must have been one of the quietest birthdays of his life ; we were too shy even to put a garland round his neck, but the day did not pass off entirely barren for him. A very young child came to tea with his father and he had thoughtfully brought a garland for him.

—Visva-Bharati News, June, 1937

এই বৎসর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলমোড়ায় রচিত কবিতা ('জন্মদিন' ২২ বৈশাখ ১৩৪৪) সেঁজুতি গ্রন্থে সংকলিত আছে।

পত্র ২১৯। 'আমার যে অনুচর ছিল সে বিস্তারিত বিবরণ লিখবে'। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরীর 'পতিসরে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৯৩৭ সালের ২৬ অগস্ট্ রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরে পতিসরের জমিদারিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে লিখিয়াছেন 'আমার প্রতিও তাদের [প্রজাদের] ভালোবাসা অকৃত্রিম ও গভীর', শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরীর প্রবন্ধে তাহাই সুপরিস্ফুট—

...নরজগতে হঠাৎ দেবতার আবির্ভাব হ'লে মানুষ যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং দেবতাকে কি দিয়ে খুশী করবে সেই কথাই ভাবে, প্রজারাও (শতকরা ৯৯ জনের চেয়েও বেশী মুসলমান) রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে সেই রকম খুশী হয়ে উঠল। তারা কবির কাছে কোন রকমের আর্থিক উপকারের প্রার্থী নয়। তারা কবিকে অনেক দিনের পরে নিজেদের মধ্যে পেয়ে পরমানন্দিত, এ যেন হারাধন ফিরে পাওয়া।... এঁদের কথা-

বার্তার ভিতর দিয়ে বার বার একটি প্রার্থনাই বেজে উঠছিল, সেটি তাঁদেরই ভাষায় বলি—

"আমরা ত হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চলতি পথে, আপনিও চলতি পথে, বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।…" এঁদেরি মধ্যে একজন সাশ্রুনয়নে ব'লে উঠলেন, "হুজুর, আমরা হিন্দুদের মত জন্মান্তরবাদ মানি না,— মান্‌লে খোদার কাছে এই প্রার্থনাই জানাতাম, বার বার যেন হুজুরের রাজ্যেই প্রজা হয়ে জন্ম নিই।" এই সব প্রজাদের অবস্থা ভাল, এঁরা কেউ কবিকে এসব কথা খোসামোদ-ছলে বলেন নি। রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা থেকেও বুঝেছি যে, তিনিও তাদের কোন দিন অবজ্ঞা করেন নি,— তাদের নিজের অন্নদাতা হিসেবে মনে করেন। অতীতের পুরনো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে আনন্দের অশ্রুবাষ্পে।

—পতিসরে রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

পত্র ২২৩। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ গুরুতর-ভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন, এই পত্রে তাহারই উল্লেখ আছে। গল্পটি গল্পসল্পের অন্তর্গত 'চন্দনী'; তাহার সূচনায় ও শেষে সেই সন্ধ্যার কাহিনী বর্ণিত আছে। গল্পের অন্যতম শ্রোত্রী 'ক্ষিতিমোহন বাবুর স্ত্রী' শ্রীকিরণবালা সেন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

…১৯৩৭ সালে গুরুদেব হঠাৎ যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেদিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। সেই গল্পটা তিনি গল্পসল্প বইতে 'চন্দনী' নামে লিখেছেন।…

…হঠাৎ গুরুদেব বাইরের চেতনা হারিয়েছিলেন। আড়াই দিনের উপর অচেতন ছিলেন। সেদিনের কথা মনে আছে। তখন তিনি উত্তরায়ণের নীচের তলায় দক্ষিণের ঘরে থাকতেন। বিকেলে

সেই ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় এসে বসতেন। অনেকে তাঁর কাছে সন্ধ্যায় গিয়ে বসতেন। সেদিন বাদলার জন্য পুবদিকের বারান্দায় এসে বসেছিলেন। কেউ কেউ গিয়েছিলেন কিন্তু বেশি সেদিন কেউ যান নাই।

কথা হচ্ছিল, তিনি আগে কারো কারো অনুরোধে তখন তখনই বানিয়ে মুখে গল্প বলেছেন কত। এখন আর সে শক্তি নাই। মুখে মুখে তৈরি করে তখনই গল্প বলতে পারেন না এখন। বলেছিলাম কেন পারবেন না। একটা গল্প বলুন। আমরা শুনতে চাই।

তারপর একটি গল্প আরম্ভ করলেন। বেশ খানিকটা বলে শেষের দিকে বললেন আজ এই পর্যন্ত থাক।[১০] গল্পের শেষের দিকটা কাল আবার বলব। তারপর তিনি শুতে যাবার জন্য ঘরে গেলেন। সুধাকান্ত-বাবু সঙ্গে রইলেন। আমরা চলে এলাম। অল্প পরেই খবর এল যে গুরুদেব অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। অদ্ভুত কথা। সেন মশায় হোমিওপ্যাথী আর বায়োকেমিক ওষুধ নিয়ে ছুটলেন উত্তরায়ণের দিকে।

…বড়ো গল্পই ফেঁদেছিলেন মনে হয়। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার পর গল্পটা ওঁকে লিখতে বলেছি আমরা। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন আমি তো বলেছি এখন তোমরা লিখে দিও। যাই হোক তিনি লিখেছেন 'চন্দনী' নামে গল্পটা।[১১]

—শ্রীকিরণবালা সেন। শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত পত্র

পৃ ২৪০। 'সর্বসাধারণের কাছে আমি বিশ্রাম কামনায় ছুটি চেয়েছি'। দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ২ (১৩৪৯), পৃ ১১৩ ও তৎসহ ২৫ জুন ১৯৩৮ তারিখের ইংরেজি বিবৃতির খসড়া।

শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত

পত্র ২। 'একদা তোমার বয়সী একটি বালিকা'— 'রাণু অধিকারী', বর্তমানে লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১৯, ২১।

পত্র ৮। 'রবিঠাকুরের পাঁচালি'। শ্রীহেমন্তবালা দেবী জানাইয়াছেন— 'আমার পরিচারিকা নিরক্ষরা নলিনী পর্য্যন্ত উঁহার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সে 'রবিঠাকুরের পাঁচালী' শুনিতে ভালবাসিত।'

পৃষ্ঠা ৪১১। ডাক্তার শ্রীনিখিলচন্দ্র বাগচীর সহিত 'শ্রীমতী বাসন্তী দেবী'র বিবাহোপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী কবিতা।

পত্র ২৬। 'এখানে একটা সাবেক কালের দীঘি ছিল'। 'এখানে' অর্থে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থে 'জলোৎসর্গ' ও 'প্রসঙ্গপরিচয়'।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লিখিত

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লেখা কেবল দুখানি চিঠি ছিল বর্তমান গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ -কালে। নূতন সংস্করণে আরো আটখানি চিঠি যোগ করার ফলে নূতন এক অধ্যায়ের সৃষ্টি। ভারতের ধারাবাহী সংগীত লইয়া কবির সহিত বীরেন্দ্রকিশোরের যে আলাপ-আলোচনা তাহার কিছুটা রূপরেখা ফুটিয়া উঠে বীরেন্দ্রকিশোরের উত্তরকালীন যে নিবন্ধে, এ স্থলে তাহার অনেকটাই সংকলনযোগ্য[১]—

ওস্তাদ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে বলতেন—'আমাকে কবি, গায়ক বা যে

---

১ স্মৃতিচারণ হওয়ায় সন-তারিখের নির্ভুল হিসাব যদি না মেলে, ক্ষতি নাই। এ লেখার বিশেষ গুরুত্ব তবু অবশ্যস্বীকার্য। বানান, পদচ্ছেদ, যতিচিহ্ন প্রায় সর্বত্রই আধুনিক। অংশবিশেষ অনাবশ্যক-বোধে এ স্থলে বর্জিত। অনুচ্ছেদভাগ আমাদের প্রয়োজন-উপযোগী।

আখ্যাই দাও··· ক্ষতি নাই কিন্তু আমি ওস্তাদ নই। আমার বাল্য-বয়সে ও কৈশোরে আমাদের বাড়িতে দাদারা ওস্তাদি সংগীতের যথেষ্ট চর্চা করতেন। আমি তাঁদের গান ও যদু ভট্ট প্রভৃতি মহা গুণীগণের গান শোনবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম।··· মুগ্ধ হয়ে তাঁদের গান শুনতে যেতাম কিন্তু তাঁরা যখন আমাকে রাগ-রাগিণী ও তাল বিধিবদ্ধ-ভাবে শিখতে ডাকতেন তখনই পালিয়ে যেতাম।'

১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের জন্য একজন যন্ত্রসংগীত-শিক্ষক নির্বাচনের ভার আমার উপরে রবীন্দ্রনাথ ন্যস্ত করে-ছিলেন।··· আমার সংগীতগুরু-ঘরানার বড়দাদা আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কথাই মনে পড়ল।··· রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় তাঁকে লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন সাক্ষাৎভাবে গুরুদেবের সহিত আলাপের জন্যে?··· আলাপের পর আলাউদ্দীন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আয়েৎ আলী খাঁ'কে (সেতার ও সুরবাহার -বাদক) শান্তি-নিকেতনে রাখার ব্যবস্থা করে এলেন··· এই পরিস্থিতির পর আমি রবীন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে একবার যাওয়ার মনস্থ করলাম ; তিনিও আমাকে ডেকে পাঠালেন সংগীতভবনের যন্ত্রসংগীতের বিধিব্যবস্থায় আলোচনার জন্য।··· আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়ার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। আমি আমার সুরশৃঙ্গার যন্ত্রটি নিয়ে গিয়েছিলাম গুরুদেবকে আমার যন্ত্রালাপের অর্ঘ্য নিবেদন করতে··· তা ছাড়া ওস্তাদী সংগীত সম্বন্ধে তাঁর সঠিক মতামত জানার ইচ্ছাও আমার ছিল।

পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাতঃকালে রবীন্দ্রনাথকে সুরশৃঙ্গার বাজিয়ে শুনাবার সৌভাগ্য আমার ঘটল।··· সুরশৃঙ্গারে ভৈরব ও আলাইয়া বিলাবল এই দুটি রাগ প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বাজিয়েছিলাম। আমি আমার সংগীতগুরু স্বর্গীয় মহম্মদ আলী খাঁ রবাবীর··· শিক্ষা-অনুযায়ী ঐ দুই রাগের বন্দেজী আলাপ ও কিছু জোড়-ঝালা বাজিয়েছিলাম।

…এঁরা মিঞা তানসেনের পুত্রবংশের যথার্থ উত্তরাধিকারী… এঁদের ঘরের কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীত শুদ্ধ বাণীর ধ্রুপদের উপর প্রতিষ্ঠিত… অলঙ্কারবাহুল্য কম কিন্তু রাগের অন্তর্নিহিত রস[২] সুপরিস্ফুট।… আলাপ শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, রাগসংগীতে শুদ্ধ বাণীর গান-বাজনাই তিনি পছন্দ করেন।… রবীন্দ্রনাথ বললেন, তাঁর প্রথম জীবনে ও যৌবনকালে ধ্রুপদ ও পাখোয়াজের সর্বোচ্চ আসন ছিল।…তিনি আরো বললেন যে, বর্তমানে ওস্তাদরা কয়েকটি সুরের মধ্যে তানের বিস্তার দেখাতে গিয়ে একই সুরসমষ্টির সামান্য সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বারবার প্রয়োগে যে কারিগরি দেখাতে চান, তাতে রাগের রস আর কিছু থাকে না।… তাঁর প্রথম জীবনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে বসে তিনি যে তৃপ্তি পেয়েছেন, আজকালকার বড় বড় সংগীত সম্মিলনীতে তা তিনি মোটেই পান না।… তাঁর যৌবনকাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে পাথুরিয়াঘাটায়… বহু বিখ্যাত ওস্তাদের গান বাজনা তিনি সাগ্রহে শুনতেন। তবে কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে রাগের রসসৃষ্টি ও রসমাধুর্যে যদু ভট্টের তুল্য সংগীত পরিবেশন অন্য কোনো ওস্তাদের কাছে তিনি পান নি।… যন্ত্রসংগীতের প্রসঙ্গে তিনি কাশেম আলী খাঁ রবাবী, সৈয়দ মহম্মদ সেতারী ও উজীর খাঁ বীণকারের বিশেষ তারিফ করলেন। এঁদের সকলেরই বাজনা তিনি শুনেছেন।

এরপর তাঁর কাছে আমাদের এক নতুন আবদারের পালা চলল। তাঁর কণ্ঠে দু-একটি প্রাচীন রাগসংগীত শুনতেই হবে। তিনি বললেন, 'ওস্তাদী গান যদু ভট্টের কাছে ঘন ঘন শুনেছি তাঁর সুরের মায়ার আকর্ষণে— খানিক ভুলে গেছি খানিক মনে আছে। তবে তোমরা হচ্ছ ওস্তাদ, আমি তো ওস্তাদ নই। আমার কাছে ওস্তাদী গান

২ 'রাগ' দেখা যায় পত্রিকায়। মুদ্রণপ্রমাদ নয় কি?

শোনবার অত জেদ কেন ?' আমি বললাম, 'আপনার যা মনে আছে তা একটু শোনান।'—

আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে তিনি মিঞা তানসেনের রচিত দরবারী কানাড়ায় একটি চৌতাল চার-তুক-বিশিষ্ট ধ্রুপদ গাইলেন। এই গানে তানসেন ও আকবর বাদশাহের নাম উল্লিখিত··· গান শুনে আমার বিস্ময় শতাধিক পরিমাণে বর্ধিত হল। কেননা তিনি গাইলেন তানসেনের পুত্রবংশের বন্দেজী মীড়বহুল একটি নিখুঁত উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ। আমি ইতিপূর্বে মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব ব্যতীত এরূপ ঢঙের ধ্রুপদ কখনো শুনিনি। সম্ভবতঃ রাধিকা গোস্বামীজি এই রীতিতেই গাইতেন। এই জাতীয় ধ্রুপদকে আমরা গৌড়হার বাণীর ধ্রুপদ ব'লে থাকি। আমি আমার মনের কথা তাঁকে নিবেদন করলাম ও বললাম, 'যিনি এরূপ গান গাইতে পারেন তিনি যদি ওস্তাদ না হন, তবে ওস্তাদ কাকে বলব ?' রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্যসহকারে বললেন,— শুনে শেখা বহু গান তিনি ভুলে গেছেন, তবে বোধ করি শ'খানেক এখনও তাঁর মনে আছে।[৩]

যথাসময়ে প্রণামান্তে তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলাম। ···সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি ভেবে এসেছি— রবীন্দ্রনাথকে সবাই কবিগুরুরূপে মানে, অনেকে তাঁকে আধুনিক সংগীতের গুরু ব'লে স্বীকার করেন, কিন্তু ওস্তাদ রবীন্দ্রনাথকে জেনেছে কয়জন ?

—তৌর্যত্রিক (মাসিক পত্র), পৃ ১১৭-১৮
রবিপ্রদক্ষিণ সংখ্যা, মে ১৯৬৬

৩ নিম্নরেখা আমাদের।

১ আত্মপরিচয়, ৪-সংখ্যক প্রবন্ধ।

২ 'পান্থ', পরিশেষ। সমকালীন 'প্রবাসী' ও পঞ্চদশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

৩ দ্রষ্টব্য প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮, পৃ ৪৬৭।

৪ এই কবিতাই প্রথম ও শেষ দুই স্তবক বাদ দিয়া 'অপূর্ণ' নামে পরিশেষ কাব্যে মুদ্রিত।

৫ প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য—D. G. Tendulkar, *Mahatma*, Vol. III (1952)

৬ বিজ্ঞপ্তিতে 'রবীন্দ্রনাথ ইহাও জানাইয়াছেন যে, ক্যাটালগে তাঁহার চিত্রগুলির যে নাম দেওয়া হইয়াছে এগুলি তাঁহার প্রদত্ত নাম নহে। তাঁহার কোন চিত্রের নাম নাই।'

৭ শারদীয় দেশ পত্রে (১৩৬৭) রবীন্দ্রহস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-রূপে ইহার খসড়া মুদ্রিত। সমকালীন মডার্ন রিভিউ (জুলাই ১৯১৯, পৃ ১০৫) দ্রষ্টব্য। শ্রীঅমল হোম -প্রণীত 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ইহার সমকালীন বাংলা অনুবাদও সংকলিত। শুনা যায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই তর্জমা করেন, কিন্তু অনুবাদের ভাষাভঙ্গি দেখিয়া তাহা মানিয়া লওয়া কঠিন।

৮ শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত ১৮৩-সংখ্যক পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ।

৯ দ্রষ্টব্য—'বিবিধ প্রসঙ্গ', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ ৭৩৭। এই সভানুষ্ঠানের ইতিহাস ও সভার বিবরণ, ১৩৬৮ বৈশাখ সংখ্যা 'সমকালীন' পত্রে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ও আন্দামান রাজবন্দী-মুক্তি-আন্দোলন' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১০ গল্পসল্প দ্রষ্টব্য। 'দস্যুকন্যাটি এদের [ডাকাতদের] গোপন করে ছেলেটিকে ঐ বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিয়ে পালাবার ব্যবস্থা করে দিল। এই পর্যন্তই বলেছিলেন।'

—শ্রীকিরণবালা সেন

১১ দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৭ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় মুখে-মুখে বলা অসম্পূর্ণ কাহিনী, দীর্ঘকাল পরে 'গল্পসল্প' গ্রন্থে সংকলনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়; রচনাকাল: ২ মার্চ, ১৯৪১। সংখ্যা-দ্বারা-চিহ্নিত -সূত্রে টীকা ১ বা ২। এরূপ সর্বত্র।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত অনেকগুলি পত্র ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা যতদূর সন্ধান পাইয়াছি তদনুযায়ী প্রকাশ-সূচী মুদ্রিত হইল।

শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত কতকগুলি চিঠি 'পত্রধারা' নামে প্রবাসী পত্রে ১৩৩৮-৪০ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সূচীতে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীবাসন্তী দেবীকে লিখিত একখানি চিঠিও (পত্র ৩) উক্ত পত্রধারার অন্তর্গত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবাসীতে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক কতকগুলি চিঠিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত এবং কোনো-কোনোটির অংশবিশেষ পরিবর্জিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে পূর্বানুসৃত রীতিতে প্রত্যেক পত্রই যথাসাধ্য মূলানুযায়ী মুদ্রিত, তবে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অনেক স্থলেই বর্জিত।

শ্রীহেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী

প্রবাসী[১]—

	পত্রসংখ্যা
আশ্বিন ১৩৩৮	৩৯[২]
কার্তিক ১৩৩৮	২
অগ্রহায়ণ ১৩৩৮	৩,৪
পৌষ ১৩৩৮	৫,৬,৭
মাঘ ১৩৩৮	৮,১১
ফাল্গুন ১৩৩৮	১৪,১৭,১৮,১৯
চৈত্র ১৩৩৮	২০,২১,২৪
বৈশাখ ১৩৩৯	২৩
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯	১৫,২৬,৩১
শ্রাবণ ১৩৩৯	৩২,৪৫

প্রবাসী—

ভাদ্র ১৩৩৯ ৩৫,৫২,৫৩,৫৫

আশ্বিন ১৩৩৯ ২৯,৩০

কার্তিক ১৩৩৯ ৫৬,৫৮

অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ ৫৯,৬২,৬৩

পৌষ ১৩৩৯ ৭৭,৭৮

মাঘ ১৩৩৯ ৮৭,৮৮,৮৯

ফাল্গুন ১৩৩৯ ৯১,৯৮,৯৯

চৈত্র ১৩৩৯ ১০১,১০৪,১০৫,১০৬

বৈশাখ ১৩৪০ ৯৬,১০৭,১০৮

উত্তরা—

আশ্বিন ১৩৪৮ ১৬৫,১৯৫,২৫৮

অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ৮৪,১২৭,১৩৮,১৬৯,২১১,২২৩,২৩৬,
২৪১,২৪৬

গীতবিতান বার্ষিকী—

মাঘ ১৩৫০ পত্রাংশ : ১৮১,১৮৯,২০২

গীতবিতান পত্রিকা : রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা—
১৬৪,১৭২,২০১,২২৯

পূর্বাচল—

আশ্বিন ১৩৫৫ ১৯৩,২১০

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫৫ ২০২

বৈশাখ ১৩৫৬ ২৪৮

লোকসেবক—

৮ মে ১৯৫০ হস্তাক্ষরের প্রতিরূপ : ১৮৪

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্যসম্মেলন স্মারকপুস্তিকা—

১৩৬০	৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা*—

মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১	২২,৫৭,৬৯,১১০,১১৮,১২৬,১৩২ ১৩৩
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০	২৭,২৮ (অংশ), ৩৪,৪৪,৫৪,৬৪ ১১৩,১২১,১২৩,১২৫
বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮১	১৪১,১৪৩

শৃজনী : শতবার্ষিক উৎসবে রচনাসংগ্রহ—

১৩৬৮	হস্তাক্ষরের প্রতিরূপ : ১৮,১৯

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লিখিত

সাহিত্য পত্র—

মাঘ-চৈত্র ১৩৬০	২,৪,৫,১০,১১

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্যসম্মেলন স্মারকপুস্তিকা—

১৩৬০	৬

শ্রীবাসন্তী দেবীকে লিখিত

উত্তরা—

আশ্বিন ১৩৪৮	৩,১৫,১৬,১৭,১৮,২০,২১,২২,২৫
অগ্রহায়ণ ১৩৪৮	১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১৪,১৯,২৪,২৬,২৭ ২৮,২৯,৩০,৩১,৩২

প্রবাসী—

শ্রাবণ ১৩৩৮	৩ (অংশ)

গীতবিতান বার্ষিকী—

মাঘ ১৩৫০	১,২০

পরিক্রমা—

শরৎ ১৩৫৩ ২৬

শ্রীকিশোরকান্তি বাগচীকে লিখিত

শনিবারের চিঠি—

অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ আশীর্বাদ ও পত্রোত্তর[৪]

১ প্রবাসীতে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রই কবি-কর্তৃক অল্পাধিক পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত। বর্তমান গ্রন্থে মূলানুযায়ী মুদ্রিত।

২ 'আত্মীয়-বিরোধ' শিরোনামে, ৩৯-সংখ্যক পত্রের রূপান্তর। দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ১

৩ শকাব্দ ১৮৮০-৮১ বুঝিতে হইবে।

৪ 'নাচনচন্দ্র' কিশোরকান্তের পত্র এবং কবির 'মন্তব্য' -সহ একত্র সংকলিত। ৪৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞপ্তি

নবম-খণ্ড চিঠিপত্রের প্রথম প্রকাশ-কালে যা-কিছু বলা হয় 'বিজ্ঞপ্তি'তে (পৃ. ৫১৭-১৮) অনুসন্ধিৎসু পাঠক স্বয়ং দেখিয়া লইবেন। এ স্থলে সংক্ষেপে বলা চলে— চিঠি যাঁহারা পান তাঁহাদের সর্বপ্রকার আনুকূল্যে আর অনেকের সহযোগিতায় রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তির প্রাক্‌কালে গ্রন্থ সংকলন করেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন, মুদ্রণকালীন তত্ত্বাবধানের ও আংশিক সম্পাদনার ভার লন শ্রীকানাই সামন্ত। মুদ্রণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মূল চিঠি-গুলি বার বার মিলাইয়া দেখিবার অবাধ সুযোগ দেন শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী।

গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে বিশেষ সংযোজন শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীকে লেখা যে আটখানি চিঠি, পত্র লেখার সমকালীন প্রতিলিপি আছে শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে।

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা অধিকাংশ চিঠি ছিল তাঁহার পুত্র বিমলা-কান্তের নিকট। বর্তমানে সেগুলি সবই (?) স্থান পাইয়া থাকিবে কলিকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে।

চিঠিপত্র নবম খণ্ডের পুরোগামী বিজ্ঞপ্তি (বৈশাখ ১৩৭১) -অনুযায়ী শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী -কর্তৃক বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনে উপহৃত রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠি—

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা : সংখ্যা ৮৪, ১২৭, ১৩৫, ১৩৮, ১৬৫, ১৬৯, ১৯৫, ২১১, ২২৩, ২৩৬, ২৪১, ২৪৬, ২৫৮।

বাসন্তী দেবীকে লেখা : সংখ্যা ১, ২, ৪-১৪, ১৬, ১৭, ১৯-৩২।

ডাক্তার নিখিল বাগচীকে লেখা একখানি চিঠি।

নবম-খণ্ড চিঠিপত্রের নূতন সংস্করণের সম্পাদনা করেন শ্রীকানাই সামন্ত ও শ্রীসনৎকুমার বাগচী। সহযোগিতা করেন শ্রীতুষারকান্তি সিংহ ও শ্রীদিলীপ হাজরা। মুদ্রণকালীন তত্ত্বাবধান : শ্রীসুবিমল লাহিড়ী।

চিঠির সংখ্যা এবং চিঠির শীর্ষদেশে বাম দিকে ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ইংরেজি তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা পত্রের অংশ নহে ; ইংরেজি তারিখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিঠির বাংলা তারিখ -অনুযায়ী নির্ধারিত। কতক ক্ষেত্রে পোস্ট্‌মার্ক্‌ হইতে ঐ তারিখ লওয়া হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে তারিখটি তারকাচিহ্নিত। তারকাচিহ্ন যে স্থলে তারিখের পরে আছে, সে ক্ষেত্রে চিঠি বিলির তারিখ বুঝিতে হইবে ; যে ডাকঘর হইতে বিলি হইয়াছে তাহার নামও উল্লিখিত। তারিখের পূর্বে তারকাচিহ্ন থাকিলে চিঠি ডাকে দিবার তারিখ বুঝিতে হইবে ; ডাকঘরের নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে।

ক-চিহ্নিত তারিখও পোস্ট্‌মার্ক হইতে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূল পোস্ট্‌মার্কের তারিখ কেহ লিখিয়া রাখেন, তাহার উপর নির্ভর করা হইয়াছে— খামগুলি দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

ডাকঘরের ছাপের পাঠোদ্ধার না হইয়া থাকিলে বা ক-চিহ্নিত তারিখের সহিত উহার উল্লেখ পূর্বাবধি না থাকিলে, কেবল তারিখই সংকলিত হইয়াছে।

তৃতীয়-বন্ধনী-বেষ্টিত ক্ষুদ্রাক্ষর তারিখ অনুমানপ্রসূত। অনুমান সংশয়াতীত না হইলে জিজ্ঞাসাচিহ্ন-যুক্ত।

পত্রমধ্যে মুদ্রিত তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত শব্দ বা শব্দাবলী, জীর্ণতাহেতু পত্রের যে অংশ দুষ্পাঠ্য, তাহা হইতে অনুমিত মাত্র। যে-সকল ক্ষেত্রে পত্র অচ্ছিন্ন এবং স্পষ্ট, অথচ অর্থবোধের জন্য কোনো শব্দের প্রয়োজন, বিবেচনামত উপযোগী শব্দ তৃতীয় বন্ধনী -মধ্যে, অধিকন্তু উদ্ধৃতিচিহ্ন-যোগে, মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা	
১৪৯	৮৬-সংখ্যক পত্রে ১০ জুন শান্তিনিকেতনের ছাপ থাকায়, উহা ২৮ জ্যৈষ্ঠ (১১ জুন) তারিখে লেখা বলিয়া মনে হয় না।
১৭১	৯৯-সংখ্যক পত্র সম্ভবত ৮ অক্টোবর বা ২২ আশ্বিন তারিখে লেখা। পৃ ৪৮৪ দ্রষ্টব্য।
৩৩৫	২১৬-সংখ্যক পত্র ৪ শ্রাবণ তারিখ -অনুযায়ী ২০ জুলাইয়ের হইতে পারে, সেদিনই মঙ্গলবার। 'কাল মঙ্গলবার ··· যাত্রা করচি' ঠিক হইলে, এ চিঠি সম্ভবত ১৯ জুলাই বা ৩ শ্রাবণ তারিখে লেখা।
৩৭২	২৬৪-সংখ্যক শেষ পত্রখানি, রবীন্দ্রনাথের উক্তির শ্রুতিলিখন, তাঁহার স্বাক্ষর -সংযুক্ত।

চিঠিপত্রের বর্তমান খণ্ডে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় তাঁহাদের উল্লেখের প্রসঙ্গক্রমেই সহজে বুঝা যায়, এজন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখযোগ্য তবু—

'কচি' শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর একমাত্র পুত্রের ডাক নাম এবং 'নাচনচন্দ্র' তাঁহার দৌহিত্রের শৈশবোচিত আদরের নাম।

৪০৪ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে 'সুধা' বলিতে, স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের পত্নীর উল্লেখ বুঝিতে হইবে।

মূল্য ১২০.০০ টাকা

ISBN-81-7522-065-1 (V.9)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)